এ নগরীর নারী কথা

কৃষ্ণকলি বিশ্বাস



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * ১৯৯১

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৯১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশঙ্কর প্রসাদ নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রয়াত বাবা

৺চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

ও

প্রয়াতা মা

৺শান্তিলতা বিশ্বাস

আমার কথা

প্রেরণাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই তো কল্লোলিনী তিলোত্তমা এ-নগরীর তিনশো বছর বয়সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারিনি, ধরতে হয়েছে লেখনী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে এ নগরী। অথচ এ-নগরীর শরীরে বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা কিন্তু স্পর্শ করেনি এতটুকুও। বরং যে চারাগাছ অতীতে ছিল অরক্ষণীয়া, আজ তা ফুলে, ফলে হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। এর শাখা-প্রশাখার বিস্তার আমাদের শীতল ছায়াদানে হয়েছে সক্ষম। এ-নগরী, কল্লোলিনী এ-কলকাতা শহরের বুকে আজ অসংখ্য মানুষজনের পদস্পন্দন ভরিয়ে দিয়েছে এ-নগরীর আকাশ-বাতাস, মুখরিত করেছে তাকে। নগরীর ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফসল আজ নগরীর প্রতিটি নারী-পুরুষ। আজ তৃতীয় বিশ্বের দুনিয়ায় বিংশ শতাব্দীর নারী-পুরুষ পাশাপাশি হাতে-হাত, কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলছে। তাই তো আমার লেখনী চুপ করে বসে না থেকে সরব হয়েছে। আমি এ-নগরীর নারী কথা লিখেছি।

সময়ের সাথে সাথে নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতে যে নারী ছিল অবহেলিতা, শোষিত সমাজের শোষণের একমাত্র বস্তু। সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এ-সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত করে রাখা হোতো যে নারীকে, সেই নারীই আজ শৃঙ্খলের বন্ধন চূর্ণ করে বেরিয়ে এসেছে। বুঝে নিয়েছে তার নিজের অধিকার।

মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সময় থেকেই নারীজাগরণের সূচনা। আজ বিংশ-শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে এ-নগরীর নারীরা হয়েছেন স্বমহিমায় মহিমান্বিত। যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে একদিন বেরিয়ে এসেছিল,

'নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।'……

সেই লেখনীই আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে, বিধাতার তথাস্তুর জোরে নয়, এ-নগরীর সমাজ-সংস্কারক মানুষজনের সঙ্গে নগরীর নারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু স্বল্পপরিসরের কশাঘাত সর্বদাই সচেতন করিয়ে দেয়, আর বেশী এগিয়ো না। তাই সব বলা সম্ভব হয়নি।

জানিনা পাঠককুল এজন্য আমায় ক্ষমা করবেন কিনা। তাঁদের অভিযোগ-বাণী হয়ত আমার কানে একদিন প্রবেশ করবে,—এত কম কেন, আরো তো অনেক বলার ছিল।

কিন্তু পারিনি। তাই পাঠককুলের কাছে অনুরোধ রাখছি, আমার এ-ছোট্ট নগরী-নারী কথার মালাটি আপনারা প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করুন। ভবিষ্যৎ জীবনে ঘাটতি পূরণের চেষ্টায় রইলাম।

এ কাজ করতে গিয়ে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হলেন, জাতীয় গ্রন্থাগার, মুজফ্ফর আহমেদ পাঠাগার, বাগবাজার-রিডিং লাইব্রেরী, বিধানসভা গ্রন্থাগার, নন্দন চলচ্চিত্র সেন্টারের গ্রন্থাগার, বার এ্যাসোসিয়েশনের গ্রন্থাগার-এর কর্মীবৃন্দ। এছাড়া আছেন আরো বিশিষ্ট মানুষজন যাঁরা আমাকে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন—যাঁদের অবস্থান খেলার জগতে, রাজনীতির জগতে, চলচ্চিত্রের জগতে, নাটক এবং সঙ্গীতের জগতে, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। এঁরা আমাকে কেউবা লিখিত তথ্য, কেউবা তাঁদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে সাহায্য করেছেন, সাধ্যমত পূর্ণ করে দিয়েছেন আমার জানার থলিটি। এঁদের নামোল্লেখ করে লাইনের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাবার অবকাশ এখানে নেই। তাই তাঁদের প্রতি রইল আমার একরাশ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কৃষ্ণকলি বিশ্বাস
১৯৯১

সূচীপত্র

প্রথম কথা

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট। পরাধীন ভারতের তথা কলকাতার মাটিতে পা দিলেন জব চার্ণক। পুরোনো তথ্য বলে, এ নিয়ে তিনবার জব চার্ণক অর্থাৎ এবার তৃতীয়বার তিনি কলকাতায় এলেন। অবশ্য এটাই ছিল তাঁর শেষ বারের মত আসা। তিনবছরের মধ্যে এখানেই তার দেহান্ত হয়।

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে পা দিয়েছে কলকাতা শহর অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী এ বছরের ২৪ আগষ্ট কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠার ৩০০ বছর পূর্তি। এ ব্যাপারে ৩০০ বছর পূর্তির উৎসব পালন করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়ে গিয়েছে শহরবাসীর সঙ্গে রাজ্যসরকারের। তাই এখন জোর কদমে চলছে কলকাতাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করবার প্রয়াস।

এতো গেল প্রাথমিক কথা, এবার আসা যাক্ মূল কথায়। কি করে কলকাতার প্রতিষ্ঠা হল। তিনশো বছর আগেই বা কলকাতা কি নামে পরিচিত ছিল সেই কথায়। সেদিনের কলকাতা প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক অ্যাটকিনসনের কবিতা মনে পড়ে।

'হে কলিকাতে। তোমার অবস্থা তখন কি ছিল? তোমাকে তখন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অতি কষ্টেসৃষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত; তখন তোমার অঙ্গ নিবিড় জঙ্গলে ও অনিষ্টকর জলায় সমাচ্ছন্ন ছিল; তাহাতে অনেক সাহসী উচ্চাভিলাষী লোককেও প্রাণ দিতে হইয়াছে; চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূহ আলোক রুদ্ধ করিয়া ইউপাস তরুর ন্যায় বিষাক্ত বাষ্প উদ্‌গীর্ণ করিত; দিনমান প্রগাঢ় উত্তাপে জ্বলিতে থাকিত এবং তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও জ্বরসঙ্কুল শয্যা আনয়ন করিত; সায়ং কালে যে সকল পর্যটক সজীব ছিল, প্রভাতে তাহারা জীবন শূন্য হইত।'

এই ছিল কলকাতা অর্থাৎ জঙ্গলভরা। জব চার্ণক ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করলেন। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হবার ফলে হুগলী ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নদীপথে সুতানুটিতে উপস্থিত হন। সুতানুটির সমৃদ্ধি তাঁকে আকৃষ্ট করে। কিছুকাল মাদ্রাজে কাটাবার পর নবাবের আহ্বানে ইংরেজরা পুনরায় জব চার্ণকের নেতৃত্বে সুতানুটিতে ফিরে এল। এই ভাবেই ভবিষ্যতের কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হল। নানান কারণে ইংরেজরা এই অঞ্চলকে কুঠি স্থাপনের সঠিক স্থান বলে নির্বাচন করলেন। কারণ, হুগলী নদীকে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্য পথ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে এবং সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামই সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে

উপযুক্ত নাব্য নদীখাতের উপরে অবস্থিত এবং তদুপরি এই অঞ্চল স্বদেশীবণিক ও শিল্পী সমবায়ে ইতিমধ্যে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। সর্বোপরি নিরাপত্তার দিক দিয়েও এই অঞ্চলের অবস্থান হোলো আদর্শ বাণিজ্যকেন্দ্রের উপযোগী। এই অঞ্চল উত্তরে চিৎপুরের খাঁড়ি, দক্ষিণে আদি গঙ্গা, পূর্বে লবণ হ্রদ ও পশ্চিমে হুগলী নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর এই জন্যই জব চার্ণক এ জায়গাটিকেই বেছে নিলেন।

প্রাক্‌চার্ণক কলকাতা

এভাবেই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ আগষ্ট কলকাতার নিকটবর্তী সুতানুটি গ্রামে জব চার্ণক তাঁর বাণিজ্যতরী নোঙ্গর করার মধ্য দিয়েই জন্ম হল কলকাতার। কিন্তু জব চার্ণক আসার আগে কি কলকাতা ছিল না, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, —১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বাংলার বিখ্যাত লোকসাহিত্য বিপ্রদাস পিপ্‌লাই এর 'মনসা মঙ্গল' থেকে জানা যায়, তখনও কলকাতা বর্তমান ছিল।

"ডাইনে কোতরং বাহে, কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশি বাহে চিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথ॥

কালীঘাটের মাহাত্ম্য তো বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত। কবি-কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও কলকাতার নাম উল্লিখিত ছিল। তা সত্ত্বেও কলকাতা সৃষ্টির দায়িত্বটা কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি জব চার্ণকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার চেহারাটা কি রকম ছিল তা একটু আলোচনা করা যাক্। তিনটি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের সমষ্টি ছিল তখনকার কলকাতা। এর উত্তর ও দক্ষিণে ছিল দু'টো তীর্থক্ষেত্র—চীৎপুর ও কালীঘাট। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হুগলী নদীর নিম্ন অববাহিকার এই অঞ্চলে পর্তুগীজ নাবিকদের আনাগোনা শুরু হয়। তখন বাংলার বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম; কলকাতার বেশ কিছু উত্তরে সরস্বতী নদীর তীরে ছিল সপ্তগ্রাম। সরস্বতী নদী বেতড় এর কাছে হুগলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর অগভীরতার জন্য পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা গার্ডেনরীচে জাহাজ নোঙর করে ছোট ছোট নৌকায় করে সপ্তগ্রামে মাল পাঠাত। এইভাবে কলকাতার বিপরীত দিকে হুগলীনদীর অপর পাড়ে বেতড়ে গড়ে উঠল এক অস্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু সরস্বতী নদী যখন মজে যেতে লাগল তখন সপ্তগ্রামের বসাক ও শেঠ উপাধিধারী চারটি সমৃদ্ধশালী তন্তুবায় পরিবার আরো বেশ কয়েকটি তন্তুবায় পরিবারকে নিয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে এল।

কলকাতা অঞ্চলের তিনটি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার গোবিন্দপুরে তারা স্থাপন করল নতুন

উপনিবেশ। গার্ডেনরীচ গোবিন্দপুরের কাছাকাছি হবার জন্য পর্তুগীজদের সাথে ওখানকার বাণিজ্যগত সুবিধাটুকুও থেকে গেল। এই সময়ে গ্রাম তিনটির মালিক ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্তর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বসাক ও শেঠদের উদ্যোগে কলকাতার উত্তরে অবস্থিত সুতানুটি গ্রাম হয়ে উঠল প্রখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

ততদিনে ইংরেজরা ভারতবর্ষে চলে এসেছে। উড়িষ্যার বালেশ্বরে তাদের কুঠিও স্থাপিত হয়েছে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণকের নেতৃত্বে হুগলীতে তাদের কুঠি স্থাপিত হল। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের পর জব চার্ণক হুগলী ত্যাগ করে সুতানুটিতে আশ্রয় নেন এবং সুতানুটির বাণিজ্যকেন্দ্র যে তাঁকে আকৃষ্ট করে এর উল্লেখ পূর্বেই হয়েছে। এরপর আবার ১৬৯০-তে এসে কলকাতা প্রতিষ্ঠা-এর উল্লেখও হয়েছে। এর থেকে একথা কি বলা যায় যে জব চার্ণকই কলকাতার স্রষ্টা। ইংরেজ না এলেও যে কলকাতা তৈরী হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সময়কার সুতানুটির হাটে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের আনাগোনা দেখে। তবে একথা বলা যায় যে ইংরেজরা আসবার ফলে কলকাতার প্রসার দ্রুততর হয়েছে। ইংরেজরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবার পর কলকাতার হাটে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের লেনদেনের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

জব চার্ণকের কথা

জব চার্ণক ছিলেন বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর এক প্রতিনিধি। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ। মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষ থেকে শুরু করে শেষভাগের মধ্যবর্তী সময়েই তিনি ভারতবর্ষে এসে কলকাতার নামের সঙ্গে পরিচিত হন। যদিও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পছন্দ করেছিলেন কলকাতাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে কলকাতাকে ভালবাসতে শুরু করেছিলেন। তাই থেকেই গেলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। সতীদাহের অগ্নিকুণ্ড থেকে এক হিন্দু রমণীকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকেই বিবাহ করলেন। এই রমণীর প্রভাবে চার্ণকের মনে হিন্দুভাব জেগে উঠেছিল। এই হিন্দু রমণী ছিলেন ব্রাহ্মণ কন্যা। এঁর সঙ্গে চার্ণকের বিবাহ হয়েছিল সম্ভবত ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বা পরে। এই হিন্দু স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কুড়ি বছর দাম্পত্য জীবন কাটান। এই হিন্দু রমণীর গর্ভে চার্ণকের মেরী নামে একটি কন্যা জন্ম নেয়। চার্ণক মেরীর সঙ্গে আয়ার নামে এক যুবকের বিবাহ দেন। কিন্তু ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মেরীর মৃত্যু হয়।

মেরী ছাড়া চার্ণকের আর দু'টি কন্যা ছিল। এদের নাম ক্যাথারিন ও এলিজাবেথ। তৃতীয় কন্যা এলিজাবেথের উইলিয়াম বৌরিজ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হয়। এলিজাবেথের ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

জব চার্ণক কলকাতা স্থাপনের পর বেশিদিন আর কলকাতার মাটিতে থাকতে পারেননি। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ভারতবর্ষে আসবার পর বিশেষ করে কলকাতার মাটিতে পা দেবার পর তাঁর কর্মধারার মধ্যে যে বিষয় উল্লেখ্য তা হোলো, কলকাতার অগ্রগতি অর্থাৎ বনজঙ্গলে ভরা কলকাতাকে শহর করে তোলবার প্রচেষ্টা এবং একই সঙ্গে সতীদাহর মতো ঘৃণ্য হিন্দুপ্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা। কারণ, মাঝে মাঝে সতীকে পুড়িয়ে মারবার ব্যাপারে তাঁর বাধা দানের ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণই তো হোলো তিনি একজন সতীকেই অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বিবাহ করেছিলেন।

কলকাতার কথা

এবার আসা যাক্ কলকাতার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পরের কথায়। তিনশো বছর আগে ১৬৯০ সালে এই দিনটি অর্থাৎ ২৪শে আগষ্ট ছিল রবিবার। বাংলা ২৩শে ভাদ্র, ১০৯৭ বঙ্গাব্দ। হিজরি ২৯ জেল্কদ, ১১০১। তিথি ছিল সকালে আষাঢ়, অমাবস্যা। তার পরে শ্রাবণ শুক্লা প্রতিপদ। সে দিন ছিল সূর্যগ্রহণ। তবে ভারতে অদৃশ্য। নক্ষত্র ছিল পূর্বফাল্গুনী। রবি ছিল সিংহে, চন্দ্রও সিংহে। মঙ্গল ছিল কন্যায়। বুধ সিংহে। বৃহঃ মীনে বক্রী। শুক্র কন্যায়। শনি তুলায় ও রাহু কুম্ভে। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার মতে এই হোলো সেদিনের কলকাতার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা দিবসের ঠিকুজি।

এই তো গেল ঠিকুজির কথা, এবার সময় করে কলকাতার ভৌগলিক অবস্থান এবং সীমানার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক্। ২২°৩৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৪´ পূর্বে দ্রাঘিমায়, সমুদ্র থেকে ১৩৮ কিলোমিটার দূরে হুগলী নদীর বামতীরে কলকাতার অবস্থান। সমুদ্রতল থেকে মাত্র ১৩-১৫ সেণ্টিমিটার বা ৫-৬ ইঞ্চি উপরে অবস্থিত। কলকাতা হুগলী নদীর বামতীরে উত্তর-দক্ষিণে ১১ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং লবণ হ্রদ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

ঠিকুজি পর্বের সঙ্গে সীমানা পর্ব শেষ করে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে কলকাতাকে নিয়ে সামনের দশকের দিকে। আজ কলকাতা তার বয়সকে তিন শতাব্দীতে এনে দাঁড় করিয়েছে। পরিবর্তনও হয়েছে কলকাতার। আজ অনেকের চোখে কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা। তাই ক্রমপর্যায়ের আলোচনাতে ফিরে গিয়ে তিলোত্তমা রূপকে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করতে চাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যে কলকাতার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং জব চার্ণক ছিলেন যার উদ্যোক্তা সেই কলকাতা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার শোভা সিং এর প্রচণ্ড আক্রমণে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল। ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র সুরক্ষিত করার জন্য দুর্গ করতে চাইল। আর্জি পেশ করা হল নবাবের কাছে, অনুমতি মিলল ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল জমি কেনা, জমি মানে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম। ১৩০০ টাকায় সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে এই জমি কিনে দুর্গ তৈরী শুরু করল ইংরেজরা। শেষ হল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে। আজকের ফেয়ারলি প্লেস থেকে শুরু করে কয়লাঘাট পর্যন্ত আর বি-বা-দী-বাগ থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত ছিল এই দুর্গের বিস্তৃতি।

এই দুর্গ তৈরীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে কলকাতার জীবনে। কারণ, এই দুর্গ

তৈরীর পাশাপাশি তৈরী হ'ল জেটি, ব্যারাক, হাসপাতাল, আর গীর্জা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে পদার্পণের অনেক আগে থেকে যেমন কলকাতার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, আবার এটাও ঠিক যে ইংরেজসাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকে বেছে না নিলে কলকাতা মহানগরীর এত দ্রুতপ্রসার ঘটত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রথম জরীপ হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন এর বেঙ্গল কনসাল্টেশনের বিবরণ থেকে এই জরীপ কার্যের ফলাফল জানা যায়। কলকাতাকে এই জরীপ অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) উত্তরে সুতানুটি গ্রাম (বর্তমান শোভাবাজার, শ্যামবাজার অঞ্চল)
(২) বাজার কলকাতা (বর্তমান বড়বাজার, চিৎপুর অঞ্চল)
(৩) টাউন কলকাতা (বর্তমান বউবাজার ধর্মতলা অঞ্চল)
(৪) গোবিন্দপুর (বর্তমান ফোর্টউইলিয়ম অঞ্চল)

বিস্তারিত চেহারা ছিল এই রকম—

অঞ্চলওয়ারী বিভাগ	সুতানুটি	বাজার কলকাতা	টাউন কলকাতা	গোবিন্দপুর
১	২	৩	৪	৫
বসতি	১৩৪ বিঘা ৪ কাঠা	৪০১ বিঘা ১১ কাঠা	২৪৮ বিঘা ৬ কাঠা	৫৭ বিঘা ৯ কাঠা
ধানক্ষেত	৫১৫ বিঘা ৬ কাঠা	×	৪৮৪ বিঘা ১৭ কাঠা	৫১০ বিঘা ১১ কাঠা
সব্জি	৩২ বিঘা ১৯ কাঠা	×	৭৭ বিঘা ১৮ কাঠা	৩৫ বিঘা ১৪ কাঠা
তামাক	৮ বিঘা ৬ কাঠা	×	৩৮ বিঘা ৭ কাঠা	১৩৯ বিঘা ১৬ কাঠা
তুলা	১৪ বিঘা ৭ কাঠা	×	১৯ বিঘা ১৫ কাঠা	×
কলাবাগান	৬০ বিঘা ৭ কাঠা	৭ বিঘা ৪ কাঠা	১৬৯ বিঘা ১৮ কাঠা	১২ বিঘা ৩ কাঠা
বাঁশবন	×	×	১ বিঘা ১৬ কাঠা	৪ বিঘা ১০ কাঠা
জঙ্গল	৪৮৭ বিঘা ১ কাঠা	×	৩৬৩ বিঘা ১৫ কাঠা	৮৩ বিঘা ১৪ কাঠা
পতিত জমি	×	×	২৭ বিঘা ৩ কাঠা	১৬৯ বিঘা ১২ কাঠা
বাগান	১৫২ বিঘা ৪ কাঠা	৪৫ বিঘা ১১ কাঠা	×	×
মোট	১৪০৪ বিঘা ৪ কাঠা	৪৫৪ বিঘা ৬ কাঠা	১৪৩১ বিঘা ১৫ কাঠা	১০১৩ বিঘা ৯ কাঠা

উক্ত তথ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে কলকাতার তখন আয়তন ছিল মোট ৪৩০৪ বিঘা ৪ কাঠা অর্থাৎ ১৪৩৫ একর জমি ছিল কলকাতার ভূখণ্ড। এরমধ্যে জঙ্গলই ছিল ৩১২ একর; ধানের জমি ছিল ৫০৩ একর; বিভিন্ন

শষ্য ক্ষেত্র ছিল ১২২ একর। পরবর্তী আর একটি হিসেব অনুযায়ী ঐ সময় কলকাতার পতিত জমি ছিল ৩৮১ একর। কলকাতার বসতি অঞ্চল ছিল এ সময়ে মাত্র ২৮০ একর জমিতে। যারমধ্যে বাসগৃহ, দোকানপাট, বাজার, রাস্তা সবকিছুই হিসাব করা হয়েছে। কলকাতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসময় বসবাস শুরু করে দিয়েছেন। টাউন কলকাতা চলে গেছে ইংরেজদের দখলে, সুতানুটির মূল বাসিন্দারা হলেন দেশীয় বণিক সম্প্রদায়, বাজার কলকাতা হল বাণিজ্যকেন্দ্র আর গোবিন্দপুরে বাস হোলো খুবই সাধারণ মানুষজনের।

এসময় শহরের সমস্ত উপকরণই ছিল কলকাতায় অনুপস্থিত, যানবাহন বলতে পাল্‌কী অথবা ডুলি। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত মূলত জলপথে। সেই কারণেই শহরের অন্য অঞ্চলগুলির উন্নতি অথবা প্রয়াসের কোন প্রচেষ্টাই তখন ছিল না। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী হিসাবে ঘোষণা করল। এই বছরই কলকাতার প্রথম জরীপ কার্যের তথ্য প্রকাশিত হয়, এর উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, শহর সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রচেষ্টা ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথম হল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম গীর্জা সেণ্ট জন্‌স্ চার্চ নির্মিত হল। ১৭১৭ খ্রীণ্টাব্দে কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮টি গ্রামের ইজারা পেল ইংরেজ ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বছরে আট হাজার একশ একুশ টাকা আট আনা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে। তারা বাদশাহ ফারুক শিয়ার কাছ থেকে এই ইজারা গ্রহণ করল। এই ৩৮টি গ্রাম আজকের কলকাতাবাসীর অত্যন্ত পরিচিত। এগুলির অবস্থান বর্তমানে মেট্রোপলিটন কলকাতার মধ্যে—সালকিয়া, হওড়া (ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকা), কাশুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, বেতড়, বেলগাছিয়া, দক্ষিণ পাইকপাড়া, দক্ষিণদ্বারী, উল্টোডাঙ্গা, শিমলা, কাঁকুড় গাছি, বাগমারী, মির্জাপুর, শিয়ালদহ, বেলেঘাটা, ট্যাংরা, তিলজলা, গোবরা, চৌরঙ্গী, ইণ্টালী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল কলকাতার আয়তন। আয়তনের প্রসার ঘটলে কি হবে, কলকাতা নগরজীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল না কিন্তু। ইংরেজরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু রাস্তা তৈরী করল। ব্যস ঐ পর্যন্তই। যা কিছু উন্নতি তা হল টাউন কলকাতাকে ঘিরে।

১৭২৫ খ্রীণ্টাব্দেই প্রথম চিৎপুরে গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির তৈরী হল কলকাতায় অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটাবার জন্য এর সূচনা এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বেশ কিছু ছোট বড় মন্দির তৈরী হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, যেমন, ফিরিঙ্গী কালীবাড়ী, কালীঘাটের কালীমন্দির, ঠন্‌ঠনিয়া কালীমন্দির ইত্যাদি।

১৭২৬ খ্রীণ্টাব্দে দ্বিতীয়বার জরীপ করা হল কলকাতার অর্থাৎ সুতানুটি, টাউন ও বাজার কলকাতা এবং গোবিন্দপুরের। এতে দেখা গেল স্ট্রীট হয়েছে ৪টি আর

লেন এর সংখ্যা ৮টি। এই জরীপ কার্যের পরের বছরই কলকাতার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় নয়জন অল্ডারম্যান ও একজন মেয়র নিয়ে গঠিত এক নগর সমিতির উপর। কলকাতার উন্নয়নের জন্য ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত এই নগর সমিতি কলকাতার পথ ঘাটের কিছুটা উন্নতি সাধন করেছিল।

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; বিদ্যালয়টির নাম বেলামিস চ্যারিটি স্কুল অর্থাৎ এইসময় থেকেই কলকাতায় শিক্ষাপ্রসারের প্রথম সূচনা হয় এবং ক্রমশঃ এর প্রসার ঘটে। তবে কলকাতায় নারীশিক্ষার ব্যাপারে সময় কাল আরও পরে, এ বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার তৃতীয় জরীপ সম্পূর্ণ হল। কলকাতার নগর-জীবনে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে, ঐ বছরেই মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য ইংরেজরা 'মারাঠা ডিচ' খনন করে। মারাঠা ডিচের অবস্থান থেকেই বোঝা যায় ইংরেজরা তখন কলকাতা বলতে কাকে বুঝত। এই খালের (ডিচের) অবস্থিতি ছিল বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড অর্থাৎ সাবেক আমলের সার্কুলার রোড চত্বরে। এছাড়া কলকাতায় তখন আরও একটি খাল ছিল,—সেটি হল ডিঙ্গিভাঙ্গার খাল। এই খাল গঙ্গা এবং লবণ হ্রদের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করত; বর্তমানে ক্রীকরো এবং সুবোধমল্লিক স্কোয়ার বরাবর পূর্বে-পশ্চিমে এই খালের বিস্তৃতি ছিল।

পুরানো কলকাতার প্রথম নকৃশা প্রস্তুত করা হয় ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। নকৃশাটি প্রস্তুত করেছিলেন লেফটেন্যান্ট ওয়েলস নামে জনৈক সৈনিক। তিনি তাঁর অঙ্কিত নকশার নামকরণ করেছিলেন—প্ল্যান অব ফোর্ট উইলিয়াম অ্যাণ্ড পার্ট অব দ্য সিটি অব কলকাতা। এই নক্শাটিতে শুধুমাত্র পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলটুকুর নক্শা আঁকা ছিল। এই নক্শা আঁকার বত্রিশ বছর পর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মার্ক উড নামে জনৈক সার্ভেয়ার নতুন করে কলকাতার নকৃশা করেন কিন্তু ১৭৮৫ সালে আঁকা হলেও এটি প্রকাশ হয়েছিল ১৭৯২ সালে।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার জরীপ করা হল। এই হিসাবে দেখা যায় যে কলকাতার রাস্তা, লেন ও বাইলেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ কলকাতার জীবনে আর একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে ঐ বছরই কলকাতার শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ ইংরেজবণিক সম্প্রদায় বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার আক্রমণে কলকাতা পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী ফলতায় আশ্রয় নেন। কিন্তু পরের বছরই পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লা পরাস্ত হলে এবং ইংরেজদের

মদতে মীরজাফর নবাব হওয়ার পর ইংরেজরা শুধু কলকাতাই নয়, পার্শ্ববর্তী চব্বিশ পরগনা, সঙ্গে প্রচুর অর্থও পেয়ে গেলেন।

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার উন্নতির ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবার ফলস্বরূপই কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ডাক চলাচল ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে কলকাতার জন্য প্রথম পথ সমীক্ষক (রোড সার্ভেয়ার) নিযুক্ত হন, কিন্তু এ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও তিনি কলকাতার কিছুই উন্নতি করতে পারেননি।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন কলকাতার গোবিন্দপুরে নির্মিত হ'ল এখনকার ফোর্ট উইলিয়াম। কালক্রমে এই ইংরেজ বসতি যে নিরাপত্তা ও ব্যবসায়ের সুযোগ স্থাপন করল তার আকর্ষণে নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহের ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণী এখানে এসে বসবাস শুরু করে। সম্ভবতঃ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, কাংস্যকার, যোগী বা নাথ সম্প্রদায় ও গো-পালক আহিরগণ এক এক পল্লীতে ঘন বসতি করে। ফলে কলকাতার বিভিন্নপল্লীর নামের মধ্যে বেনেটোলা, কাঁসারিপাড়া, যুগিপাড়া, আহিরিটোলা, দর্জিপাড়া, নাথেরবাগান, প্রভৃতি জাতিসূচক বহু নামের প্রচলন দেখা দেয়।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বুকে সাহিত্য-সংস্কৃতির সূচনা সরূপ প্রথম সংবাদ-পত্র সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয় ২৯শে নভেম্বর ; এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন জে. এ. হিকি।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সরকারী কাগজ 'কলকাতা গেজেট' প্রকাশিত হয়। এই বছরই সেণ্ট জন গীর্জা তৈরীর জন্য লটারী করে টাকা তোলা হয়। টাকা তোলার এই কৌশল এতই জনপ্রিয় হল যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে টাকা তোলার পদ্ধতি হিসাবে 'লটারী'র স্বীকৃতি হয়ে গেল।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল প্রথম মাসিকপত্র ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন বা ক্যালকাটা অ্যামিউজমেণ্ট নামে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মের্সাস গর্ডন এণ্ড হে এটি প্রকাশ করেন।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে প্রথম হাসপাতাল তৈরী হয় নাম ক্যাম্পবেল হাসপাতাল ; বর্তমান নীলরতন। এরপর ধীরে ধীরে কলকাতার বুকে আরজিকর মেডিকেল হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশান্যাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এ-সমস্ত বড় বড় হাসপাতালের পাশাপাশি আরও বেশকিছু মাঝারি ধরনের হাসপাতাল তৈরী এবং ছোট ছোট হেলথ্ সেন্টারের ব্যবস্থা হয়েছে। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য যে হাসপাতালটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য তা হোলো

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, যেটি হাজরায় ক্যান্সার রির্সাচ সেন্টারের ঠিক পাশেই অবস্থিত। এ ছাড়াও আরোকিছু ছোট হাসপাতাল তৈরীর প্রচেষ্টাও কার্যকরী হয়েছে।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পরিচালনভার অর্পিত হয় জাষ্টিস্ অব্ পিস্‌দের উপরে। পুরানো নগর সমিতি ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। নগর সমিতির দ্বারা আর কলকাতার কোন উন্নতিই না হওয়ায় জাষ্টিস অব্ পিস'রা টাকা জোগাড় এর উদ্দেশ্যে লটারী শুরু করলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী কলকাতা থেকে বিলাতে প্রথম ডাক যায়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জাষ্টিস অব্ পিস্ এর লটারীর টাকায় গড়ে উঠল কলকাতার প্রথম বড় রাস্তা বা 'রোড' বর্তমানের আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড ও আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড। সুতরাং মারাঠা ডিচ্ অপসারিত হ'ল। বাড়ীঘর তৈরীর জন্য ডিঙ্গিভাঙ্গার খালও বুজিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে আফজল কৃত বেইলির মানচিত্রে কলকাতার জানবাজার থেকে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড পর্যন্ত অঞ্চলে ইংরেজদের ৮০টি বাড়ী দেখা যায়। এই বাড়ীগুলিই সম্ভবতঃ কলকাতার প্রথম পাকাবাড়ি। এইভাবে লটারীর টাকায় উন্নতির পথ ধরে কলকাতা মহানগরী ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে প্রবেশ করল।

ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের শতাব্দী। এই শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতার চেহারা ছিল কি রকম? এ প্রশ্নের উত্তর সরূপ লর্ড ভ্যালেন্সিয়ারের ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মন্তব্য স্মরণ যোগ্য। "কলকাতার সাহেব পাড়ার ভাল ভাল ঘরবাড়ী দেখে মনে হয় এই শহর এখন ভারতে বৃটিশ শাসনের উপযুক্ত কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। চৌরঙ্গী একটি গ্রাম, যার মধ্যে বড় বড় অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। এদেশী কৃষ্ণাঙ্গদের পাড়া কিন্তু অত্যন্ত কদর্য, যেমন তার সরু সরু নোংরা নোংরা রাস্তাঘাট, তেমনি ঘর বাড়ী। অধিকাংশ খড়ো ঘর.....।"

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই লর্ড ওয়েলেস্‌লী নিযুক্ত ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি হয়, সেই কমিটিতে যে কাজগুলি দেওয়া হয় তা হোলো—বাজার, কসাইখানা, কবরখানার স্থান নির্দিষ্ট করা, বাড়ীঘর ও রাস্তাঘাটের সংস্কার ও নির্মাণ করা এবং জলনিকাশী নর্দমা তৈরী করা। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এই কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে, সরকার সেই রিপোর্ট মঞ্জুর করা সত্বেও লর্ড ওয়েলেস্‌লীর এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণকাল অর্থাৎ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন কাজই হয়নি। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিন্টোর আমলে এই কমিটি বাতিল করে দিয়ে এক নতুন শহর উন্নয়ন কমিটি নিয়োগ করা হয়। আবার পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিটি তুলে দিয়ে নিয়োগ করা হয় সুবিখ্যাত "লটারী কমিটি।" আবার তিন বছর কাজ করার পর নতুন এক লটারী কমিটির হাতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে

কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই লটারী কমিটির কার্যকাল অব্যাহত ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতার পরিচালন কর্তৃপক্ষ বহুবার পরিবর্তিত হলেও কলকাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য অর্থ কিন্তু একমাত্র 'লটারী' করেই সংগৃহীত হত। পরিচালন কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী পরিচালকগণ কলকাতা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ও লটারী সংগৃহীত টাকা নতুনদের হাতে সবসময়ই তুলে দিতেন। লটারী সাধারণত বছরে একবার হত। তবে ১৮১৪ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরে মোট সাড়ে চার লক্ষ টাকা তোলা হয়, এই টাকা ১৭টি লটারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট মারফত লটারীর টাকায় শহর উন্নয়ন গর্হিত কাজ এ ধরণের জনমত সংগঠিত হওয়ায় 'লটারী কমিটি' কাজবন্ধ করতে বাধ্য হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার উন্নয়ন বলতে যা যা হয়েছিল তা হল, বেলেঘাটার খাল ও টাউন হল নির্মান। বেশ কিছু পুকুর ও জলাশয় খনন করা হয় ; নির্মিত হয় বেশ কয়েকটি রাস্তা। আর তৈরী হয় বেশ কিছু বাজার। এই সময়ের মধ্যে কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। এতদিনকার পাল্‌কীর পরিবর্তে ঘোড়ার গাড়ী চালু হল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার একমাত্র যান পাল্‌কীর বেহারারা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট চলাকালীন কলকাতার রাস্তায় সর্বপ্রথম ঘোড়ার গাড়ী চালু হল।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়িষার জমিদার সন্তোষ রায়ের অর্থে নির্মিত হল কালী-ঘাটের কালীমন্দির। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ হল 'হিন্দু কলেজ' পরবর্তী সময়ে এই কলেজই প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হ'ল সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ', এই সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন জেমস ক্ল্যার্ক মার্শম্যান।

এভাবেই কলকাতার পথঘাট-বাজারের উন্নতির পাশাপাশি সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রসার ঘটতে থাকে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য কলকাতার বেশ কিছু রাস্তা, পুকুর, বাজার ইত্যাদি স্থাপিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও কিছু কিছু পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও জলনিকাশী ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয় নি। এই সময়ও কলকাতার যাবতীয় ময়লা আবর্জনা গঙ্গাতেই ফেলা হত। কিন্তু এ-ব্যাপারে হিন্দুদের আপত্তি ছিল। এই আপত্তির ফলেই পরবর্তীকালে কলকাতার জল-নিকাশী ব্যবস্থায় গঙ্গার মত নদীর সুযোগ গ্রহণ করা যায় নি।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রেল ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ১০নং চৌরঙ্গী লেনে বোর্ণ এ্যাণ্ড শেফার্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রথম ফটোগ্রাফিক স্টুডিও

খোলা হয়। এই শহরে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টিপু-সুলতানের পুত্র নবাব জাদা গোলাম মহম্মদ, মসজিদটি নির্মিত হয় এসপ্ল্যানেডে।

কলকাতার বাণিজ্যিক সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং এখানে শিল্পস্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাকে রেলপথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। ঐ বছরই রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হয়; ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চলতে শুরু করে এবং ঐ বছরেই ২৯শে আগষ্ট হাওড়া থেকে পানডুয়া পর্যন্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে এই রেলপথেই রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল থেকেই আসত কলকাতার জন্য কয়লা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শেষদিকে কলকাতা এবং আশেপাশে বেশ কিছু চটকল নির্মিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার শোষণ যন্ত্রটিকে চাঙ্গা করার কাজ এই সময় থেকেই বেশ জাঁকিয়ে শুরু করে দেয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতা তথা ভারতের সমাজ জীবনে এক বিচিত্র ধরণের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় মেয়েদের জন্য কলকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় চালু হয়, যার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তৈরী করেছিলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন অর্থাৎ এসময় থেকেই পর্দানসীন এ-দেশীয় মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে এসে শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটল। এই বছরই ৫ নভেম্বর কলকাতায় টেলিগ্রাম লাইন চালু হয় ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত কেবলমাত্র সরকারী কাজের জন্য এবং পরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর থেকে হয় সর্বসাধারণের জন্য।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কর্মসূচীগুলি হ'ল—প্রথম স্বাধীনতা (সিপাহী অভ্যুত্থান), নীলকরদের অত্যাচার, শোষণ ও তার বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান, সাঁওতাল অভ্যুত্থান, ভারতীয় জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয় 'জাতীয় কংগ্রেস' এর প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইত্যাদি।

কলকাতার শিল্প স্থাপনের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল। লোকজন বাড়তে লাগল। সমস্যা হয়ে দাঁড়াল পানীয় জল, জলনিকাশী, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি। রাস্তাঘাট উন্নয়নের কথা ইংরেজরা ভাবছিল অনেকদিন থেকেই; কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালহলে শিল্প বাণিজ্যের সুবিধা অনেক। এ ব্যাপারে প্রধান বাধা ছিল রাস্তাঘাট এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত উপযুক্ত লোকাভাব। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ বাধা দূর হল, বর্তমানে এ'টি শিবপুর বি. ই. কলেজ। *এই কলেজ প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে, নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য যা যা করণীয় তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চালু করল কলকাতায়। এদিকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী অভ্যুত্থানের পর পরই দেশটার*

সাথে সাথে কলকাতার দায়িত্বভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে চলে গেল ইংরেজ সরকারের হাতে। কলকাতা হ'ল ভারতের রাজধানী।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গীতে প্রথম ফুটপাত তৈরী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার নতুন ভূমিকার পশ্চাতে শিল্প বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে তিনটি কারণ দেখা যায়, (১) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজখাল খননের ফলে পশ্চিমের সহিত বাণিজ্যপথ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। (২) কলকাতা থেকে ১৬০ কিমি. দূরবর্তী রানীগঞ্জে কয়লা আবিষ্কার, (৩) ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ। এর ফলে নতুন ভাবে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগ আরম্ভ হ'ল। পূর্বে চট ও থলি প্রস্তুত করবার জন্য ডাণ্ডিতে পাট চালান দেওয়া হত। কিন্তু এদেশে ঐ পাটজাত দ্রব্যগুলির উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হওয়ায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কলকাতা ও হুগলী নদীর তীরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলসমূহে অনেকগুলি চটকল গড়ে ওঠে।

রেলপথের সুযোগ সুবিধা লক্ষ্য করে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা-রাণাঘাট রেলপথে সংযুক্ত হল। এরপর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা-ক্যানিং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা-ডায়মণ্ডহারবার এবং কলকাতা-বনগাঁ রেলপথে সংযুক্ত হয়। কলকাতার শিয়ালদহে এই কারণে একটি রেল ষ্টেশন চালু হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই আরও একটি মন্দির নির্মিত হয় কলকাতার বুকে, সেটি হ'ল পরেশনাথের মন্দির।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃতির প্রসার স্বরূপ তৈরী হ'ল প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—১১ই মে বাগবাজারে অ্যামেচার থিয়েটার 'শ্যামবাজারে নাট্য সমাজ' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ট্রাম চালু হয়ে গেল, এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতার ট্রাম লাইন বসান হয়। লাইন ছিল শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে শুরু করে বৌবাজার স্ট্রীট ধরে, বি-বা-দী-বাগ হয়ে স্ট্রাণ্ড রোডের উপর দিয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। এই লাইনে প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ী চলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পরিচালন কর্তৃপক্ষের চেহারাটা পুরোপুরি পাল্টে গেল। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, ৪৮ জন নির্বাচিত কমিশনার নিয়ে গঠিত কলকাতা পৌরসংস্থা তার কাজ শুরু করে দিল। পৌর সংস্থা আগেই গঠিত হয়; যদিও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাষ্টিস অব পিস্-দের নির্বাচন করার অধিকার করদাতারা পেয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচিত পৌরসংস্থা এই প্রথম। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বন্দর পরিচালনার জন্য একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা গঠিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে জল সরবরাহের জন্য পলতায় জল শোধনালয় স্থাপিত হয় উদ্যোক্তা 'কলকাতা নগর উন্নয়ন কমিটি' [Calcutta

Town Improvement Committee]। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের পলতা থেকে দৈনিক ছয়লক্ষ ত্রিশ হাজার মানুষের জন্য দু'শো সত্তর লক্ষ লিটার হিসাবে অর্থাৎ জন প্রতি রোজ একষট্টি লিটার করে বিশুদ্ধ জল কলকাতায় আসতে শুরু করল।

কলকাতায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে টেলিফোন চালু হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাঙালী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর হিসাবে নিযুক্ত হন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিল উইলিয়ম কলভিন্। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় দমকল বাহিনী প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৫-র ২৭শে নভেম্বর এ শহরে প্রকাশ্যে বাংলা নাটক অভিনীত হয়ে দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পথে প্রথম মোটর গাড়ী চলতে শুরু করে। কিন্তু মোটরগাড়ী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শক ছিলেন স্টিফেনসন্। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বলে। নবজাগরণের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে এভাবেই উনবিংশ শতাব্দী এ শতকের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থাৎ রাস্তা, জল, আলো, শিল্প, যানবাহন সুযোগ-সুবিধাই নয়, এরই সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। নিজেকেই এভাবেই স্বয়ং সম্পূর্ণ করে দিয়ে বিদায় নিল, উনবিংশ শতাব্দী, ঘোষণা করে দিয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর আগমন বার্তা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় সুষ্ঠ এবং সুন্দর ভাবে বসবাসের জন্য ইংরেজরা কলকাতায় ৪০ বর্গ কি. মি. এলাকায় জল নিকাশী নর্দমা আর পয়ঃ-প্রণালী নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা বাড়ানো তো হয়নি বরঞ্চ পুরানো ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণও করা হয়নি।

বিংশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দীকে বিদায় দিয়ে কলকাতার বুকে যখন পা রাখল বিংশ-শতাব্দী তখনই কলকাতা নিজেও অনেকটা সমৃদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জনসংখ্যা ৮৪৭৭৯৬। পরবর্তী ৫০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপায় প্রায় ১৭৬ শতাংশ হারে। কিন্তু ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই হার মাত্র ১৯ শতাংশ। পরবর্তী দশকগুলি এ-সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী ৩৩, ০৫, ০০৬ এর মধ্যে পুরুষ ১৯, ৩০, ৩২০ জন এবং নারী ১৩, ৭৪, ৬৮৬ জন। কলকাতার লোকবসতি ঘনত্ব সর্বত্র

সমান নয়। জনবসতির ঘনত্ব বড়বাজারে সর্বাধিক ; এটিই কলকাতার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে প্রতি একরে প্রায় ৯০০ জন লোক বাস করে। নারী পুরুষের অসম অনুপাত কলকাতার জনসমষ্টির আর একটি বৈশিষ্ট্য। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী, প্রতি ১০০০ জন পুরুষ অনুপাতে নারীর সংখ্যা ৬১০ জন, ১৯৮১-র জনগণনা এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭১২ জন। এই অনুপাত সব অঞ্চলে সমান নয় ; বড় বাজার ও খিদিরপুরে বহিরাগত কর্মীদের সংখ্যা সর্বাধিক বলে এখানে পুরুষের তুলনায় নারীর হার সর্বাপেক্ষা কম। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে দেখা যায় যে, কলকাতার প্রায় ৬৬.৯ শতাংশ লোকই বাইরে থেকে এসে এখানে বসবাস করে তার মধ্যে ১৭ শতাংশ পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু।

এবার আসা যাক বিংশ শতকের কলকাতা শহরের উন্নয়নের কথায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শহরে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম আসে, এই বছর ২৭ মার্চ খিদিরপুর রুটে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শহরে ট্যাক্সির প্রচলন হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শহরে ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তকরণ হয়। অবশ্য এর আগেই কলকাতায় শহরজীবনের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার যাবতীয় উন্নতি এতদিন পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মাফিক হচ্ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে এই উন্নতির পিছনে কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা ছিল না। কেবলমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক অগ্রগতি ঘটেছিল। পাশাপাশি হুগলীনদীর দু'ধারে প্রায় ৭২ কিলোমিটার অঞ্চল ধরে বহু শিল্প স্থাপিত হয়েছিল। চাপ বাড়ছিল কলকাতার উপর, কলকাতার অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য সেই যে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জন্য 'ক্যালকাটা বিল্ডিং কমিশন' নিযুক্ত হয়, সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় "ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট" (C. I. T.)। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। বর্ষার কলকাতার একমাত্র যান রিক্সা কলকাতায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাজির হলেও, কলকাতায় এই যাত্রীবাহী রিক্সার প্রসার হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মোটর বাস চালু হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙালী মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। কলকাতা কর্পোরেশনের ক্রমশঃ অগ্রগতি হতে থাকে। কলকাতার রাস্তা-ঘাটেরও উন্নতি হতে থাকে। এরই পাশাপাশি পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতার পথে নামে। মিনিবাস এসেছে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ; স্পেশাল বাস ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে বিদ্যুৎ কলকাতায় এসেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। বেতার এল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে এল আরও মানুষজন ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় যা এল তার নাম নগরজীবনের সমস্যা।

আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রান্তদেশে পৌঁছেছি, আর মাত্র দশবছর পার করেই তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাও পা রাখবে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারে। তাই কলকাতার উন্নতির এবং অগ্রগতির বিষয়ে এখনও শেষ কথা বলা যাবে না। কলকাতার উন্নতি, প্রসারলাভ ও অগ্রগতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যেটুকু ধারণা দৃঢ়ভাবে সৃষ্টি হয় তা হল কলকাতার উন্নতির জন্য শাসকশ্রেণী বিশেষ কিছুই করেনি। বরং একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে কলকাতা শাসকশ্রেণীর কাছে যেটুকু, যা কিছু পেয়েছে তার বিনিময়ে শাসকশ্রেণী সংগ্রহ করেছে প্রচুর মুনাফা। আর এই জন্যই কলকাতার উন্নতি হয়েছে প্রয়োজন ও সময় ভিত্তিক। এরফলে সুপরিকল্পিত প্রকল্পের মাধ্যমে কলকাতা কোনদিনই বেড়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হবার পর কলকাতায় সামান্য হলেও পরিকল্পনা মাফিক কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম, তাই আজ শহরের এই জরাজীর্ণ হাল।

কিছু কথা

কলকাতার জন্ম বৃত্তান্ত আপাতত শেষ। কার্যবৃত্তান্তও কিছু হয়েছে। এখন যে আলোচনাতে আসা একান্ত জরুরী তা হোলো কলকাতার নারী সমাজ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ নারী। আদমসুমারীর ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের হিসেব বলছে কলকাতায় প্রতি ১০০০ পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ৭১২ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের এক বড় অংশের সংখ্যা হ'ল নারী। তাই যখন অতি জাঁকজমকের মধ্যদিয়ে আমাদের সবার প্রিয় কলকাতা তিনশো বছরে পা দিয়েছে তখন কলকাতার নারী সমাজের বিষয়ে কিছু আলোচনা হওয়া বোধহয় একান্ত জরুরী। যদি অতীত ইতিহাসকে সামনে তুলে ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে, নারীদের স্থান সেখানে ছিল এক মর্যাদার আসনে। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। নারীকে বন্দী করে রাখা হয় অন্তঃপুরে। কণ্ঠরোধ করে নারীকে করে রাখা হয় সংসারের আর পাঁচটা আসবাবপত্রের সমতুল্য! অর্থাৎ সমাজে পুরুষ শাসিত ধারা বহাল তবিয়তেই নিজের জায়গা করে জাঁকিয়ে বসে। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করার মধ্যদিয়ে নারীকে তার সত্ত্বা বিকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বদলে অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়। নারী অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌছায়।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যাচারই শেষ কথা বলে না। তাই নারীকেও একদিন অন্ধকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হয়। অবশ্য তা একদিনে হয়নি। তাই আজও কিন্তু নারী অবহেলিত, অত্যাচারিত হচ্ছে নতুন নতুন কায়দায়।

মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই শতাব্দীরই কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় নারীজাগরণের আয়োজন চলতে থাকে। ক্রমশঃ অনেক বাধা দূর হতে থাকে। কিন্তু এর একটা ক্রমবিকাশের পদ্ধতি আছে যার সাহায্যেই এদেশের মেয়েরা বিশেষ করে কলকাতার মেয়েরা আজ কলকাতার তিনশো বছরে পা-দিয়েছে, গড়ে তুলছে নিজেদের সমৃদ্ধ করে। এরই বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা রাখছি কয়েকটি অধ্যায়ে।

নারী সমাজের আদি কথা

'হে অতীত কথা কও'—অতীত দেয় বর্তমানকে আনবার শঙ্খধ্বনি। তাই নারীসমাজের আদিকথা আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে চলে যেতে হবে সেই বৈদিক যুগের সময়ে। এই সময়ের নারী সমাজের বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে সাহায্য নিতে হবে চার হাজার বছর আগের বৈদিক সাহিত্যের। বৈদিক যুগের বিভাজন চারটি—

(১) ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব, সময় অর্থাৎ ঋক্‌বেদের সময়কাল।

(২) ১৫০০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময় অর্থাৎ সংহিতার ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের পরবর্তী সময়কাল।

(৩) খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ সময় অর্থাৎ সূত্র, মহাকাব্য সময় এবং স্মৃতির পূর্ব সময়কাল।

(৪) স্মৃতির পরবর্তী সময়কাল অর্থাৎ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ সময় পর্যন্ত বর্তমানে আমাদের একটা বিচক্ষণ মন্তব্যে আসবার জন্য বলা উচিত যে, উল্লিখিত শেষের দু'টি সময়কালে (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষ ঘটনা দ্বারা সূচিত যুগারম্ভ কালক্রমগুলি সঠিক কিন্তু উল্লিখিত প্রথম দু'টি সময়কাল (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০ এবং খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৫০০) বরং বলা যায় কিছুটা অস্পষ্ট এবং এ বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

বৈদিক যুগের নারী সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই সময়ে হিন্দুসমাজে মেয়েরা সভ্যতার স্বপ্ন দেখে এবং নারী স্বাধীনতাও কিছুটা জন্মে। সাধারণ ভাবেই বলা যায়, মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা কম স্বাধীনতা পেয়ে থাকে কিন্তু এটা উল্লেখ্য যে এই সময়ে পিতা-মাতা তাদের মেয়েকে শিক্ষিত এবং সক্ষম কন্যারূপে তৈরী করবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মেয়েরাও ছেলেদের মত শিক্ষা গ্রহণ করত এবং ব্রহ্মচর্য সময়কাল অতিবাহিতও করত, বৈদিক-স্তবগান রচয়িতা যেমন বহু রচনাকার আছে তেমনি ইন্দ্রাণী, উর্বশী, সারনা প্রভৃতি মহিলা রচনাকারের কথা জানা যায় যাঁরা বৈদিক স্তব-গানে কিছু অংশের রচয়িতা।

বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহ অথবা জোরপূর্বক বিবাহ দানের ব্যাপার সমর্থিত ছিল না। ১৬/১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা পিতা-মাতার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত—বেদ ও উপনিষদের বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ, গৃহকর্ম শিক্ষা গ্রহণ।

বৈদিক সাহিত্যে দেবীকে আরাধনা করবার জন্য কিছু প্রার্থনা অথবা

শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলি এমন কিছুই নয়, কিন্তু সাধারণভাবে নারীজাতিকে মহিমান্বিত করেছে। এই শ্লোকগুলিতে নারীজাতির মহত্বের বিষয় চিত্রিত করা আছে যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দেবীকে পৃথিবী রূপে এবং মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে : আবার দেবতাগণের মাতা দেবী অদিতিকে বহুশব্দসমন্বয়ে প্রার্থনা করা হয়েছে—তিনি শুধুমাত্র তাঁর সন্তানদের (বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি) উত্তমরূপে দেখাশুনাই করেন না, মায়ের মত তাদের রক্ষাও করেন। তিনি সমস্ত মানুষকে বিপদ থেকে মুক্ত করেন। বৈদিক সাহিত্যে দেবী উষার কথা বলা হয়েছে যিনি মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে তুলনাহীন। এই রূপবতী উষা তাঁর চিরাচরিত পোষাকে আরো সুন্দরী যার সৌন্দর্যে দেবতাগণ মুগ্ধ ও আনন্দিত, শুধু দেবতাগণই নয়, মর্ত্যের মানুষজনও। এছাড়া আছেন দেবী বাক্, তিনি হলেন মানবজাতির শক্তি উদ্যমের উৎস এবং বিশ্বের সবার রানী। প্রত্যেকে তাঁকে শ্রদ্ধাকরে ও সম্মান করে। অন্য শক্তিশালী দেবী হলেন ইন্দ্রাণী, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী। দেবরাজ ইন্দ্রও কখনও দেবী ইন্দ্রাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যান না। সবদেবতাই দেবরাজ ইন্দ্রের মত তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। এই সমস্ত দেবীরা সর্বশক্তিমান, কারণ তাঁরা জীবনের উচ্চ আদর্শ অনুসরণকারিণী।

এবার আসা যাক্ বৈদিক যুগের নারী গার্গীর কথায়, যিনি ছিলেন বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার অঙ্গনে বিশেষ কীর্ত্তিমতী। প্রসঙ্গত বলা যায়, গার্গী যখন জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যকে আহ্বান করেন তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত হয়ে বলতে হয়েছিল, "গার্গী আর আপনি আমাকে অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।"

বৈদিকযুগে এভাবেই নারীদের মর্যাদার আসনে রাখা হয়েছিল। বহু নারী ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করেছেন বেদ, বেদান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে। অথর্ববেদে তো উল্লেখই আছে যে একজন শিক্ষার্থী তার ছাত্র জীবন শেষ না করা পর্যন্ত বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।

ঋক্‌বেদের যুগ এবং ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ, এই যে ২৫০০ বছরেরও বেশী সময় কালএর মধ্যে হিন্দু সমাজে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নারীদেরও অবস্থার বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে যেসব বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তার প্রতি জোর দেবার জন্যই নারীদের পারিবারিক জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। বৈদিক স্তবগানের বিষয় বস্তুর মধ্য দিয়ে নারীদের মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে স্ত্রী হবেন স্বামীর সহধর্মিণী অর্থাৎ সর্বকাজে সহযোগী এবং সংসারে গৃহে তাঁর মর্যাদা থাকবে একজন গৃহকর্ত্রীর। বাল্য বিবাহ গ্রহণীয় হয়নি এবং বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করবার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হত। একজন সন্তানহীনা বিধবার দত্তক পুত্র নিতে পারাও স্বীকৃত ছিল।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে, বলতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই হিন্দুসমাজে প্রাচীনকে বিরোধীতা করবার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে বয়সের কথা বলতে পারি ; এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্য সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে সমতা বজায় না রেখেই বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়স কমানোর দিকে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখতে পাই বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল এবং প্রাপ্তবয়স্কা না হলে একটি মেয়ের বিবাহ দেওয়া যেতো না। কিন্তু এরপর থেকে ধীরে ধীরে এ অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখা গেল স্মৃতির রচনাকার এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজন খুব সহজ ও দৃঢ় ভাবে মহিলাদের এ-ধরনের স্বাধীনতা ভোগের অবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এ-ধরনের পরিবর্তন কিন্তু হঠাৎ কিম্বা অপ্রত্যাশিত ভাবে আসেনি, দীর্ঘ সময় নিয়েই এ-ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। একশ্রেণীর মানুষের নারীদের প্রতি এই যে বিমুখভাব দেখা যেতে থাকে তার মূলে আছে অথর্ব সংহিতা, ত্রুটি মূলতঃ গড়ে ওঠে যখন সমাজে একটি ছেলে সন্তানের পরিবর্তে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে (Aitariya Brahmana), যখন একটি সদ্যজাত পুত্র সন্তান পরিবারের আশা সঞ্চার করে তখন একটি কন্যাসন্তান পরিবারের বিড়ম্বনার উৎস হয়ে দেখা দেয়।

এরপর ধীরে ধীরে একটা প্রবণতা বেশ জোরদার হয়ে ওঠে যে মেয়েরা হচ্ছে ভোগবাসনা চরিতার্থ-করণ সংক্রান্ত আনন্দদায়ক একটি বস্তু। এর ফলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ফল কাজ করল। একদিকে, মেয়েদের দৈহিক সতীত্ব বজায় রাখার জন্য বাল্যবিবাহের ব্যাপারটা যেমন এসে পড়ে, অন্যদিকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে কঠোর তপস্যা এবং কঠোর নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদের দেখা মেলে, যাঁরাও এখন থেকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁদের নীতি পরায়ণ ও কঠোর সংযমের সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারী। এই কারণেই, এই সময় থেকেই নারীকে সমাজের সমস্ত রকম গ্লানির উৎসরূপে দেখা যেতে লাগল।

একটি বিষয় আমাদের নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে যে, এভাবে ধীরে ধীরে নারীদের মর্যাদার অবনতি ঘটান এবং বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার ভার তাঁদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু নারীর পক্ষে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু সুনাম কার্যকরী হয়েছে এবং নারীকে কোনো ভাবেই বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। যদিও সমাজ পরিত্যক্ত একজন ব্যক্তির পুত্রও সমাজ পরিত্যক্ত বলেই গণ্য হয়, কিন্তু একজন পতিতার মেয়ে কিন্তু পতিতা হয় না। এই সমাজেই কিন্তু নারীকে সামান্য দোষ করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, পুরুষের ক্ষেত্রে যার একদমই প্রয়োজন

হত না। এই সময় নারীদের এভাবে নানান দিক দিয়ে গৃহে বন্দী করবার প্রচেষ্টা চলতে লাগল, তবে পর্দা প্রথা তখনও পুরোপুরি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

ব্রাহ্মণ উপনিষদিক সময়কাল—

কৃষি শ্রমের অপেক্ষা গৃহ অথবা কুটীর শিল্পের কাজের মধ্যে মেয়েদের অংশ গ্রহণ এই সময়কালে বেশী হতে দেখা যায়। অর্থাৎ মেয়েদের অনুউৎপাদনশীল অথবা স্বল্প উৎপাদনশীল কাজ করিয়ে তাদের মর্যাদাকে পরোক্ষভাবে হানি করবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং সমাজে তাদের ছোট বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাও হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সময়কালেই তাদের অল্পবিস্তর দূরে সরিয়ে দেবার প্রবণতা অর্থাৎ পূজো-অর্চনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মুখ্য অংশ গ্রহণের অধিকার গুলিকে খর্ব করা হতে থাকে। পূর্বে সাধারণত পিতাই ছিলেন সন্তানের শিক্ষক কিন্তু এ সময়ে আচার্য অর্থাৎ পেশাগত শিক্ষক সেই জায়গা নিল; আচার্যর পত্নীদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষা গ্রহণ করতেন, তাঁরা হলেন আচার্যানী। কারণ সমাজে শিক্ষাগ্রহণ করায় কোনো বাধা ছিল না। পর্দাপ্রথা তখনও আসেনি। কিন্তু এই সময়কালে কিছু কিছু নতুন ধরনের যুক্তিহীন মত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করা হতে থাকে যা মেয়েদের মর্যাদা হানি করতে সাহায্য করে। এই সময়ের বৈদিক সাহিত্যকে মাহাত্ম্যদান করা হয় এবং একে ঈশ্বরের কথা বলে ধরা হয় এবং সেই কারণেই প্রাচীনকালীন কায়দায় একে সংরক্ষিত করা হত। আর্য ও অনার্যের সর্বোৎকৃষ্ট মনোভাব এসময়ে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

স্মৃতিপূর্ব সময়কাল—

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সময় থেকেই মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স ক্রমশই কমিয়ে আনা হয় চৌদ্দ অথবা পনেরোতে। এবং তা আবার কমতেই থাকে। ২০০ খ্রীষ্টাব্দের স্মৃতি রচনাকার ১২ বছর বয়সকাল অর্থাৎ মেয়েদের রজোদর্শনারম্ভ সময়কেই বিবাহের বয়স বলে সমর্থন করে। আরো কমিয়ে আট বছর বয়স করা হয়। এসব তথ্য বাল্য বিবাহের পক্ষেই কথা বলে। ক্রমশঃ শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ থেকেই তারা বঞ্চিত হতে থাকে।

পরের কথা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে নারী বঞ্চনার কথা। বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয় নারীকে। নারী হয়ে দাঁড়ায় বস্তু, ধীরে ধীরে আসে সতীদাহর মত ঘৃণ্য প্রথা। যেখানে নারীকে পুড়িয়ে মারবার পথ বেরিয়ে আসে এবং অত্যন্ত সুকৌশলেই ধর্মের বন্ধনে নারীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার কাজ চলতে থাকে নির্বিবাদে।

এরই পাশাপাশি চলে নারীদের প্রতি অন্যায় অবিচারের পালা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দুসমাজে ভদ্রবংশীয় গৃহস্থ ঘরের বধূদের সতীত্ব সম্বন্ধেও যেপ্রকার অসাধারণ সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল তা স্ত্রী-জাতির প্রতি অবমাননাকর। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নায়ক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ধনপতি সওদাগর যখন দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে বাণিজ্যে যাত্রা করেন তখন তার স্ত্রী খুল্লনা গর্ভবতী ছিলেন। পাছে সন্তান হলে খুল্লনার কোন নিন্দা হয় এইজন্য ধনপতি যাত্রার প্রাক্কালে নিম্নলিখিত জয়পত্র লিখে গিয়েছিলেন—

অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী ॥
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি।
সন্দেহভঞ্জনপত্র করিল নির্মিত ॥
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥

এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু খুল্লনার প্রতি সন্দেহের অবসান হয়নি। তাকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল।

মধ্যযুগের কথা—

১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালকেই মধ্যযুগ ধরে নেব। তবে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী থেকেই নারীজাগরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে, তাই এ-বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এখন সংক্ষেপে এই সময়কালে নারীবঞ্চনার কথা কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এই সময়ে বাংলার মেয়েদের অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং এ-হাওয়া থেকে কলকাতার মেয়েরাও বাদ পড়েনি। বাল্যবিবাহ ছিল এ-সময়কালের প্রথা, এর প্রবর্তন করেন রঘুনন্দন, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়েছেন সে সময়কার মানুষজন, বাল্য বিবাহের বয়স হবে ৮ বছর। বাল্য বিবাহকে গৌরীদান আখ্যাও দেওয়া হয় এবং বলা হয় এটিই বিবাহের আদর্শ সময়। যদি আট বছরে কোনো পিতা-মাতা তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিতে না পারতেন তবে তাঁকে অবশ্যই দশ বছরের মধ্যে বিবাহ দিতে হোত—একে বলা হত কন্যাক। যদি দশ বছরের মধ্যে বিবাহ দিতে পারা কোন পিতা-মাতার অসম্ভব হতো এবং কন্যা বারো বছরে ঋতুমতী হতো তবে সেই কন্যা হয়ে যেত অশুচি। এ-অবস্থায় সেই পিতা-মাতাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করবার সিদ্ধান্ত হোত। এই কারণেই হিন্দুসমাজে বাল্য

বিবাহের প্রথা বেশ ভালভাবেই আঁকড়ে বসেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে এ-ধরণের বাল্য বিবাহের অত্যাচার। এরই পাশাপাশি চলে বিধবাদের উপর অত্যাচার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাল্য বিবাহের জোর কদমের তাড়নায় অনেক পিতা-মাতাকেই একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গেই দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয় বার ছোট মেয়েটিকে বিবাহ দিতে বাধ্য হতে হয়। যার ফলে আসে বহুবিবাহ এবং কুলীন সমাজে বহুবিবাহ বেশ জাঁকিয়েই বসেছিল। এই কারণেই বিধবার সংখ্যাও নেহাত কম হত না; যদিও এ-সময়ে সতীদাহ প্রথা ছিল। কিন্তু সতীদাহর বিষয়ে কিছু কিছু সংজ্ঞা ছিল, যেমন—যদি কোনো মেয়ের পুত্র সন্তান না হ'ত তবেই তাকে সতী করা হত। এর পিছনে আর একটি কারণ ছিল সেটি হল সম্পত্তি। বিষয়টা একটু ভাঙিয়ে বললেই পরিষ্কার হবে, সে সময়ে দেখা যেত স্বামী অনেক সম্পত্তির অধিকারী অথচ তার মৃত্যুর সময় স্ত্রীর কোনো পুত্রসন্তান নেই এই অবস্থায় ঐ স্ত্রীকে যদি সতী করা যায় তবে সম্পত্তির ভাগীদার থাকবে না। আর এই কারণেই সতী হতে হত মেয়েগুলিকে। যারা বিধবা হয়ে পড়ে থাকত তাদেরও রেহাই ছিল না—কঠোর সংযমের মধ্যে রাখা হত তাদের। চুলে তেল দিতে দেওয়া হত না, চুল ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হত, কোনো রকম সাজ পোষাক থেকে ছিল তারা বঞ্চিত। সাদা কাপড় পরতে দেওয়া হত, মেঝের উপর কুশের ঘাস দিয়ে বিছানা তৈরী করে সেখানে ঘুমাতে হত এইসব নিরীহ মেয়েগুলিকে। অর্থাৎ সমাজে একজন বিধবা মেয়েকে করে রাখা হত সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সতীদাহ, বাল্য বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হয় এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরের মেয়েরাও কিন্তু এভাবেই অত্যাচারিত হয়েছে। যদিও কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে কিন্তু হিন্দু সমাজের মেয়েরা ছিল পর্দানসীন এবং সামাজিক সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কলকাতার বয়স তিনশো বছর হলে কি হবে সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার মেয়েরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারেনি। তারা ছিল পর্দানসীন, স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ সময়ে বনেদী বাড়ীর পুরুষেরা বাঈজী নিয়েই বাইরে রাত কাটাত; আর মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে ছিল বহু বিবাহের প্রচলন। এরই মধ্যে ছিল সতীদাহ প্রথা, জব চার্ণকের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা তো বলা হয়েছেই যে তিনি একজন সতীকে জ্বলন্ত চিতা থেকে বাঁচিয়ে তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। এ সময়কালে কলকাতায় বড় বড় বনেদী পরিবারের মহিলাদের দেখা যেত ঠাকুরপূজো নিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে। মধ্যবিত্ত কিম্বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের সময়কাটান একটা সমস্যা নয়। কিন্তু বিত্তবান বনেদী পরিবারের

মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যাই। কারণ স্বামী নিসঙ্গতা। আর এই কারণেই দেব-দেবীর প্রতি তাদের আকর্ষণের মাত্রা ছিল বেশী।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মেয়েরা এ ভাবেই তাদের যন্ত্রণাকে বুকে চেপে রেখে কলকাতা নগরীর বুকে বাস করেছে। ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে চলেছে। এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দী, এরই সঙ্গে ধীরে ধীরে নারী নির্যাতনের অবসান ঘটতে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

রাজা ও রাজবাড়ীর মেয়েরা

এই কলকাতা শহরে একসময় ছিল বেশ কয়েকজন রাজা। কলকাতায় যিনি প্রথম রাজা, তাঁর নাম নবকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণর ছিল সাত মহলে সাতজন স্ত্রী। কিছুতেই সন্তানের আলোয় সংসার আলো হচ্ছে না দেখেই তিনি সাত সাতবার বিয়ে করেছেন। অর্থাৎ সেই সময় কলকাতায় বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। অবশ্য নিজের বড়ভাই রামসুন্দরের ছেলে গোপীমোহনকে দত্তক নেবার বেশ কিছুদিন পরে চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে প্রথম সন্তান জন্মায়, ছেলে রাজকৃষ্ণ। তিনজন মেয়ে রাজকৃষ্ণর পরে পরে। আর এক মেয়ে পান প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে।

রাজা বলতে কলকাতায় এক আধজন নয়, অগুনতি। সকলের কথা লিখতে গেলে সাতকাণ্ড মহাভারত হয়ে যাবে। তাই এবার যাঁর কথা বলছি তিনি হলেন রাজা রামমোহন। রামমোহনও তিনটি বিবাহ করেন, প্রথম স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সে। তারপর বর্ধমানের মেয়ে। তারপর ভবানীপুরের মেয়ে উমাদেবী। রামমোহন ছিলেন সমাজ সংস্কারক। প্রথমে আত্মীয়সভা পরে ব্রাহ্মসমাজ গড়লেন। সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাঙালী সমাজের যেখানে যত অন্যায়, রামমোহন সবেরই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। নিজের বৌদিকে তিনি পুড়ে মরতে দেখেছিলেন চোখের সামনে। সেইদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করলেন, একে বন্ধ করবোই। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যও উদ্যমের অন্ত ছিল না তাঁর। লর্ড বেণ্টিঙ্ক-এর আমলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে যায় আইন করে। উমাদেবী রামমোহনের সমস্ত আন্দোলনের পাশে ছিলেন। একজন আদর্শ স্ত্রী হিসাবে যখন সমাজের সবার কাছ থেকে রামমোহনকে বিদ্রূপ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখন তিনি তাঁর স্বামীকে ছেড়ে যাননি বরং তাঁকে মনোবল জুগিয়েছেন। তদানীন্তন্ সময়ের সামাজিক অবস্থায় একজন মহিলার পক্ষে এ-কি প্রশংসনীয় নয়?

কলকাতার জোড়াসাঁকোর জয়রাম ঠাকুরের চার ছেলে। আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম। এক মেয়ে সিদ্ধেশ্বরী। নীলমণি ঠাকুরের তিন ছেলে—রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ; আর এক মেয়ে কমলমণি। রামলোচনের স্ত্রী অলকা দেবী। রামমণির স্ত্রী মেনকা দেবী। মেনকাদেবীর ছেলে দ্বারকানাথ (জন্ম ১৭৯৪)। দ্বারকানাথের পাঁচ বছর বয়সে রামলোচন তাকে দত্তক নেন। সেই থেকেই রামলোচনের স্ত্রী অলকাসুন্দরীই তাঁর আপন মা। এই অলকাসুন্দরীর বিষয়ে 'ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বারকানাথ রাজকুমার। বেলগাছিয়ায় তাঁর বাগানবাড়িতে চলত নাচের, গানের, ভোজ সভার সমারোহ। সাহেব, মেম, রাজা মহারাজাদেরও আসা যাওয়া চলত। কিন্তু এটাই দ্বারকানাথের আসল পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক। বিধবা-বিবাহের পক্ষে, সতী দাহের বিরুদ্ধে। দ্বারকানাথের স্ত্রী ছিলেন দিগম্বরী দেবী—দুর্গা প্রতিমার মত মুখ। তখন ঠাকুরবাড়িতে ধুমধাম করে পূজো হত দুটো। শরতে দুর্গা, শীতে জগদ্ধাত্রী। প্রবাদ আছে, পূজোর জন্য জগদ্ধাত্রীর যে মূর্তি তৈরী হয় প্রত্যেক বছর, তাতে দেবীর মুখ আঁকা হত দিগম্বরী দেবীর আদলে। এমন সুরূপা, তবুও স্বামীর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় নি। কারণ দিগম্বরীর মধ্যে ছিল হিন্দু ধর্মের যাবতীয় সংস্কার, আর দ্বারকানাথ ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত। স্বামী ম্লেচ্ছদের সঙ্গে ওঠেন, বসেন, খানাপিনা করেন। সুতরাং ছোঁয়াছুঁয়িতে তাঁর আপত্তি—ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে তক্ষুনি স্নানকরে শুদ্ধ করে নিতেন নিজেকে। কিন্তু এইভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারে না। দ্বারকানাথও চাইলেন না তাঁর স্ত্রীর জীবনকে বিপন্ন করতে। তাই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বসবাসের জন্য বেছে নিলেন অন্দরমহলের বাইরে বৈঠকখানার ঘর। দিগম্বরী দেবী মারা যান তিন ছেলে রেখে। দ্বারকানাথ বিষয়ে ম্যাকস্‌মূলার-এর মুখের কথায় আঁকা আছে সেই সময়ের ছবি।

"দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বসবাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য সম্মিলনীর আয়োজন করেন। তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরী শাল দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন। তখন কাশ্মীরের শাল ফরাসী স্ত্রীলোকদের এক আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সুতরাং কল্পনা কর যে কী তাদের আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়াইয়া দিলেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরই ১৮৭২ খ্রী টাব্দে তিনি বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেও বেশীর ভাগ সময়ই বিদেশে কাটাতেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল ছিলেন নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র। মায়ের নাম হীরামণি। রাজেন্দ্রর ৩ বছর বয়সে নীলমণি মারা গেলেন, হীরামণি তখন রাজেন্দ্রকে বুকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে এলেন চোরবাগানে। চোরবাগানের জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ি নীলমণির নিজের হাতে গড়া; আশ্রয় নিলেন সেই ঠাকুরবাড়িতে। যেহেতু রাজেন্দ্র সম্পত্তির মালিক হয়েও নাবালক, তাই কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস-এর হাতে পৌঁছাল তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব।

কিন্তু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস প্রথমদিকে পারিবারিক দান ধ্যানের জন্য এক পয়সাও দিতে রাজি হয়নি। এতে হীরামণি দেবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, স্বামীর ইচ্ছা ব্রত তাহলে কি বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে। তিনি ঠিক করলেন, তা হয় না, নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি গয়না-গাটি যা আছে, সব বিক্রি করে, সেই টাকায় দরিদ্র সেবার কাজ চালাবেন। তাই-ই হল। নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, রান্নাশালে। দরিদ্র ভোজন না হলে অন্ন তোলেন না মুখে। মায়ের চরিত্র রাজেন্দ্রলালের চরিত্রে ছাপ ফেলেছিল—মায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন চরিত্রের সরলতা, সবলতা, স্নেহপরায়ণতা। রাজেন্দ্রলাল বিয়ে করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত রূপলাল মল্লিকের মেয়েকে।

কলকাতার জগৎ শেঠ ছিলেন লক্ষ্মীকান্তধর। তাঁর মেয়ে পার্বতীর বিবাহ হয় রঘুনাথ পালের সঙ্গে—এই পার্বতীর ছেলেই হলেন রাজা সুখময়। হেস্টিংস তাঁকে রাজা উপাধি দান করলে তিনি হলেন রাজা সুখময় রায় বাহাদুর। পার্বতী দেবীকে তখন মানুষজন ডাকতো মহারাজামাতা বলে, তাঁর ছিল দয়ার প্রাণ। মৃত্যুর পর তাঁর উইল খুলে দেখা গেল, ৪০ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রী ঘাট আর দমদম থেকে ঐ ঘাটে যাওয়ার রাস্তা তৈরীর জন্য। সুখময় ছিলেন খুব সৌখিন মানুষ। প্রত্যেক বছর তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় বসতো নাচ-গানের আসর, তিন দিন ধরে সেই আসরে সাহেবরাও ছুটে আসতেন মেমসাহেবদের বগলদাবা করে নাচ দেখতে, গান শুনত, খানা খেত।

রাজা সুবোধচন্দ্র ছিলেন মন্মোথ চন্দ্র বসু মল্লিকের ছেলে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বদিকে ছিল তাঁদের রাজপ্রাসাদ। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল প্রকাশিনী দেবী। প্রকাশিনী দেবী চারটি কন্যার জন্ম দিয়ে মারা যাবার পর সুবোধচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন কমলাপ্রভাকে। তিনি রাজা হয়েও হয়েছিলেন রাজদ্রোহী,—অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার তিনি ছিলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরে তিনি মারা গেলেন। এই সঙ্গেই রাজ কাহিনী বলতে গেলে ইতি। শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা আন্দোলন, ঐ আন্দোলনের জোয়ারে সামিল হল মহিলা পুরুষ উভয়েই। স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতার মহিলাদের ভূমিকা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা

বন-জঙ্গল, পর্বতগুহা থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর-শহর, মহানগর, এ-হল মানবসমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, মানবসভ্যতা ও মানবসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। মানুষের অগ্রগতির পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে গুহায়, গ্রামে, শহরে, নগরে, মহানগরে। গুহা আজ নির্বাসিত, গ্রাম আজ উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত, মধ্যযুগের প্রাকার বেষ্টিত নগর ধ্বংসোম্মুখ, বণিক যুগের শহর রুচিহীনতায় ম্লান, বণিকযুগের মহানগর নবযুগের বৈজ্ঞানিক অবদানে মহিমান্বিত হয়েছে। এ-ভাবেই এগিয়ে চলে যুগের গতিধারা। নতুন যুগের জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র নতুন মানসপ্রকৃতি, জীবনদর্শন, ভাবধারা, শিল্পকলা-সাহিত্য স্থাপত্য নীতির রুচিবোধ আচার-ব্যবহার নিয়ে নতুন সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করে। এই মহানগর থেকেই নতুনযুগের নবজাগরণের সূচনা। তাই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কলকাতার প্রাধান্য ও গুরুত্ব কোনো সমাজবিজ্ঞানীই অস্বীকার করেন না। কলকাতা মহানগরীই বাংলার নতুন জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র। তাই কলকাতাই বাংলার নতুন ভাব-ধারার, মানস প্রকৃতি ও নবজাগৃতির উৎস।

মহানগর যেন মহাসমুদ্র। মহানগরের রাজপথে, ইঁটপাথরে লোহায় যেমন মানুষের মহান আদর্শের, জীবনের মহান সত্যের পদধ্বনি শোনা যায়; তেমনি মহানগরীর কদর্যতা, তুচ্ছতা, ব্যস্ততাহীনতা, দীনতা, নীচতা সব যেন ইঁটপাথর, লোহার গায়ে একেবারে খোদাই করা থাকে, সহজে মিলিয়ে যায় না। জীবনের বিকাশ হতে কলকাতার প্রায় শতাব্দী কাল সময় লেগেছে। এই সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড, ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে। কবি কিপ্‌লিঙ্‌ও 'কলকাতা' সম্বন্ধে বলেছেন—

Thus from the midday halt of Charnack
grew a city,
As the fungus sprouts chaotic from its
bed
So it spread
Chance-directed, chance-erected, laid and
built
On the silt,
Palace, byre, hovel, poverty and bride
side by side.

কলকাতা সম্বন্ধে একথা বেশ খানিকটা সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। কলকাতা সম্বন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় আমরা পাই—

আজব সহর কল্‌কেতা
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথায় কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদপাতা।

একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হলেও অনেকটাই মিথ্যা। Chance directed নিশ্চয়ই নয়; কলকাতা শেওলা বা ব্যাঙের ছাতার মত কখনই গজিয়ে ওঠেনি। জব চার্ণক হঠাৎ যাযাবরের মতন ঘুরতে ঘুরতে একদিন বৈঠকখানায়, পিপুল গাছের তলায় মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে পড়েননি। 'আজব সহর' কলকাতা ঠিকই, কিন্তু তার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি মাত্রই 'বক-বিড়াল নন' অথবা তার চারদিকে কেবল বদমাইসির ফাঁদ পাতা থাকে না। কোনো সমাজবিজ্ঞানীর বা নগর-শিল্পীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে হয়ত 'কলকাতা' আধুনিক মহানগরের রূপ পায়নি। জৈবিক নিয়মেই কলকাতার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে, বিজ্ঞানীর স্থপতির কল্পনার স্পর্শ তার গঠন বিন্যাসে বিশেষ নেই। তবু কলকাতা হঠাৎ গড়ে ওঠা মহানগর নয়।

সমাজের মতো সামাজিক ইতিহাসের সমীক্ষাও গতিশীল। ইতিহাসও সমাজবিজ্ঞানের এই মিলনসীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তাই উনিশ শতকের বাংলার তথা কলকাতার নবজাগরণের গতিধারার বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে ঐতিহাসিকরা সাধারণত উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের বিচার করে থাকেন, ইতিহাসের দিক থেকে রেনেসাঁস কথায় 'typological' গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হয় যে, জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী আলফ্রেদফন্ মার্টিন তাঁর 'Sociology of the Renaissance' গ্রন্থে রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকগুরুত্ব নির্দেশ করে বলেছেন—

'The typological of the Renaissance is that it marks the first cultural and social breach between the Middle Ages and between Modern Times. It is a typical early stage of Modern Age.'

মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে এবং সেই দিক থেকে রেনেসাঁসকে আধুনিক যুগের প্রথম উদয় পর্ব বলা যায়। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে কখনও অতীত যুগের সম্পূর্ণ সামাজিক

সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটে না, বিচ্ছেদের শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে, সমাজের মূল-গঠন ও বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে বলেই। মূল অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে গঠিত সামাজিক সংস্থা অথবা সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণাগুলির স্থায়ী পরিবর্তন হয় না, বহিরাগতভাবে সংঘাতের ফলে একটা সঞ্চরণশীল পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এই দিক থেকে বিচার করলে typologically ঊনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোড়নের 'রেনেসাঁস' বললে ভুল হয় না, কিন্তু বৈদেশিক শাসনাধীনে সংঘটিত এই জারজ রেনেসাঁস-এর সঙ্গে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু তার বাস্তব পশ্চাদ্ ভূমি না থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত তার সামাজিক ফলাফলও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষময় হয়ে ওঠে। 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি বিচার করে দেখলে এর অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা বোঝা যাবে।

মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের বিচার করলে দেখা যাবে, মধ্যযুগের সমাজ ছিল একটা rigidly graduated system এবং সেই কঠোর প্রায়-অচল স্তর বিন্যস্ত সমাজের চেহারাটা ছিল পিরামিডের মতো অপরিবর্তনীয়—ধনতন্ত্রের উন্মেষ পর্বে, রেনেসাঁসের যুগে, এই পিরামিডে আঘাত এল। ফলে মধ্যযুগের সামাজিক পিরামিডে ভাঙ্গন ধরল, অচল স্তরিত সমাজের ভিতরে দেখা গেল নতুন এক সচল স্তরায়ণ শুরু হতে। সমাজে মানুষকে স্তরিত করবার শক্তি হ'ল অবাধ প্রতিযোগিতায় অর্জিত টাকার।

ইটালীর রেনেসাঁসের কালে সমাজের এ ধরনের গতিশীলতা পরিলক্ষিত হতে দেখে আক্ষেপ করে Acnes Sylvius বলেন—

'Italy has lost all stability......'

Lujo Brentano দুঃখ করে বলেন যে টাকার জোরে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অত্যধিক বাড়ছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কার্ল মার্কস 'Cash nexus' বলেছিলেন ; এর প্রায় চারশো বছর আগে ব্রেনতানো এবং আরও অনেকে সেই 'cash tie'-এর চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়েছেন।

বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ও টাকার সচলতার দিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশ আমলে বাংলা দেশে প্রধানত নতুন মহানগর কলকাতা কেন্দ্রে আঠারো শতক থেকে এ-ধরনের পরিবেশ রচিত হয়েছিল। কলকাতা শহরে যে নতুন নাগরিক অভিজাত ধনিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তার পরিবার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অধিকাংশেরই টাকার ধান্দায় নগরে আগমন ঘটে এবং যে কোনো গম্য-অগম্য, পথে-বিপথে-কুপথে টাকার সন্ধানে বেপরোয়া অভিযান আঠারো শতকের বিভিন্ন পর্বে আরম্ভ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বণিকদের মধ্যে অনেকেই কুলবৃত্তি

ও কুলমর্যাদা ত্যাগ করে, নতুন টাকার মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইটালীয় সমাজ প্রসঙ্গে সিলভিয়াসের কথায়,—

'Servants may easily become a king'.

প্রায় প্রতিধ্বনি করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববিলাসবাবু'গ্রন্থে'-ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, চটকার, মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজ্যের সাজের কঠোর খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামী ভাড়ামী রাস্তা বন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন…… অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলি যে কতখানি সত্য তা কলকাতার প্রাচীন ধনিক পরিবারগুলির আদিপুরুষদের কর্মজীবনের কাহিনী বিচার করলে বোঝা যায়। আঠারো শতকে কলকাতার বহিরাঙ্গিক বিন্যাস অনেকটা মধ্যযুগীয় নগর ও গণ্ডগ্রামের মতো ছিল—বিভিন্ন কুলবৃত্তিজীবিদের বাস ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। আঞ্চলিক পুরানো নামগুলি থেকে তা বোঝা যায়, যেমন কুমারটুলি। কলুটোলা, জেলিয়াটোলা, ডোমটুলি, গোয়ালটুলি, পটুয়াটোলা, শাঁখারীটোলা ইত্যাদি। এই মধ্যযুগীয় নাগরিক পরিবেশে শোভাবাজারের দেবপরিবার, সিমলের দে সরকার পরিবার, জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, মল্লিক পরিবার এবং আরো অনেক প্রাচীন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক পরিবার, সে সময় কলকাতার নতুন ধনিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক।

আঠারো শতকের মাত্র দশ বারো জন কলকাতার বিখ্যাত বাঙালী ধনিক পরিবারের বিচিত্র ভোগবিলাসের ব্যয়ের পরিমাণ যদি হিসেব করা যায়, তাহলে মোট অঙ্ক অন্তত কয়েককোটি টাকায় দাঁড়াবে। এরই পাশে নাগরিক সমাজে, যেমন কলকতা শহরে ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের বিশ্বাসভাজন আরো দু'টি শ্রেণী তৈরী করে—একটা নতুন নাগরিক ধনিকশ্রেণী, আর একটা নতুন নাগরিক মধ্য-শ্রেণী। কিন্তু শুধুমাত্র টাকার মাপকাঠিতেই রেনেসাঁস দাঁড়িয়ে থেকেছে, একথা বলা বোধ হয় সঠিক হবে না। কারণ আমরা জানি প্রকৃত রেনোসাঁস তা নয়। তাই এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

রামমোহন রায় কলকাতা এলেন ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে। কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ তাঁর ব্যক্তিত্ব-মুগ্ধ কয়েকজন সহগামীর সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নব্যধনিক জমিদার ও শহরের

নতুন রাজা মহারাজা। রামমোহন যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ প্রথা অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা নিয়ে তুমুল আন্দোলন। কলকাতায় এ-সময় রেনেসাঁস আন্দোলন। এ-আন্দোলনের পুরোধা রামমোহনই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধীকণ্ঠে সোচ্চার হন। ১৮১৪ সালে তিনি কলকাতার মাটিতে পা-রাখলেন আর ঠিক তারপরের বছরই সামাজিক সমস্ত রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্যে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই শুরু হ'ল সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা—

সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন এ বিষয়ে কিছু কথা বলি। ১৬৯০ সালের ৫ আগস্ট, তদানীন্তন সংবাদপত্রের—"এই কথা লিখবেন যে সর্বত্র সতীরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে থাকে।" শীর্ষক শিরোনামে সংবাদের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হোলো—

গত পক্ষকাল আগে একদিবস এই প্রতিবেদক সংবাদ সংগ্রহার্থে নৌকাযোগে রাজমহল থেকে কাশিমবাজার যাবার পথে নদী তীরস্থ একটি গ্রামে দ্বিপ্রাহারিক আহারাদির জন্য নৌকা থামান। সে সময়ে হঠাৎ গ্রামের মধ্যে ঢাক-ঢোল ও কাঁসরের শব্দ ভেসে আসে। প্রথমে প্রতিবেদক মনে করেন বোধহয় কোনও গ্রাম্য পূজাপার্বন বা উৎসবের বাদ্য। কিন্তু শব্দটি ক্রমশঃ এগিয়ে নদীতীরের দিকে আসতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায় শববাহক গ্রামবাসীগণ একটি সুসজ্জিত খাটে করে একটি মৃতদেহ বহন করে আনছেন। পিছনে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশজন গ্রামবাসী। তাদের অগ্রে সধবা যুবতী। যুবতীর বয়ঃক্রম কুড়ি একুশ হবে। অপূর্ব সুন্দরী। পরনে লাল পাড় শাড়ি। কপালে বিরাট সিন্দুরের টিপ। সিঁথিতেও সিন্দুর। যুবতীর এলোচুল। তার চক্ষু আচ্ছন্ন। মনে হয় সে যেন ইহজগতে নেই। দু'জন মহিলার কাঁধে ভর দিয়ে ওই যুবতী আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৌকার মাঝি বললেন, এখনই এখানে সতীদাহ হবে। ওই দেখুন সতীকে নিয়ে আসছে। এই প্রতিবেদক সতীদাহের কথা শুনেছেন। কখনও কখনও সাধ্বীপত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণ বরণ করেন, এ-সম্বাদ অবগত আছেন। কিন্তু সচক্ষে সতীদাহ কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। কারণ সতীদাহ বাংলায় বড় একটা হয় না, তাছাড়া মুঘল বাদশাহের হুকুম বলপূর্বক কাউকে সতী করা যাবে না। এ কারণে প্রত্যেক সতীদাহে বাদশাহের অনুমতি নিতে হয় ও ফৌজদারের একজন করে প্রতিনিধি সতীদাহ তদারক করে থাকেন। এক্ষেত্রেও একজন তকমাপরা ফৌজদারের সিপাহীকে দেখা গেল।

মাঝি অতঃপর এই প্রতিবেদককে বলে, হুজুর আসুন। আমরা এইস্থান ত্যাগ করি। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে আর একটি গঞ্জ আছে। সেখানেই আহারাদি সম্পন্ন করা যাবে। এই প্রতিবেদক স্বপাক আহার করেন। সুতরাং

রন্ধনাদির জন্য সময়ও দরকার। কিন্তু সতীদাহের মত এমন পুণ্য অথচ ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি এই সতীদাহের প্রত্যক্ষদর্শী হবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। এরপর যে ঘটনা ঘটে পাঠকদের উদ্দেশে তা হুবহু বর্ণনা করা গেল। ক্রমে শবযাত্রা গঙ্গাতীরের সমীপবর্তী হল। এই জায়গাটি শ্মশান বলে বোধ হয় না। কারণ অন্যত্র চিতার কোন চিহ্নই নাই।

শববাহকেরা তীরভূমির উপর খাটটি রেখে বিশ্রাম করতে লাগল। মৃতদেহ একটি বৃদ্ধের। তাঁর চক্ষু কোঠরাগত। দেহ শীর্ণ। বোধহয় বহুদিন রোগ-ভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের চোখ দুটি তুলসীপাতা দিয়ে ঢাকা। মৃতদেহের উপর প্রচুর ফুল ও ফুলের মালা।

মৃতের পত্নীকে এক্ষণে একটি খেজুর গাছের নীচে বসানো হয়েছে। একটু পরে এক মহিলা তাঁর হাতে একটি আম্রপল্লব এনে দিল। সতী সেই আম্রপল্লবটি ডান হাতে ধরল। তখন একজন প্রামাণিক এসে সতীর হাত পা আলতায় রাঙিয়ে দিল। এরপর দুজন মহিলা সতীকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে তাকে ধরে অবগাহন করাল। স্নান করার পর সতী ঘাটে উঠে কাপড় ছেড়ে একটি নববস্ত্র পরিধান করল। এই বস্ত্রটি একটি গরদের লালপাড় শাড়ি। এইবার একজন সধবা মহিলা সতীর মাথা মুছিয়ে দিয়ে তার মাথার চুল এলো করে চুল ছাড়িয়ে দেয়। তাকে আবার সিঁদুর পরানো হয়। এই সিঁদুর পরানো অনুষ্ঠান চলে অনেকক্ষণ। উপস্থিত সমস্ত মহিলাই সতীকে সিঁদুর পরায় এবং তার জন্য সধবা মহিলাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সিঁদুর পরানো শেষ হলে একজন পুরোহিত সতীকে মন্ত্র পড়াতে থাকেন। এই মন্ত্রোচ্চারণের সময় পুরোহিত মহাশয়ের কথাগুলি আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সতীর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম না। যদিও এসময় ঢাক ঢোল বাজানো বন্ধ ছিল।

আমাকে অপরিচিত দেখে একব্যক্তি এগিয়ে আসেন। ওই ব্যক্তি জোয়ান বয়স। খালি গা। গালে গালপাট্টা। তার পিছনে পিছনে আরও কিছু যুবক এসে আমায় ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করে, মহাশয় কে ? এখানে আগমনের হেতু কী ?

আমি বলি, আমি একজন আখবরনবিশ। কাশিমবাজারের কার্যব্যপদেশে যাচ্ছি। সতীদাহ কখনও দেখিনি। তাই সতীদাহ হচ্ছে দেখে দেখতে নামলাম। তখন ওই ব্যক্তি বলে, মহাশয়, আপনি যদি সতীদাহের নিন্দা করে আপনাদের পত্রিকায় কিছু লিখবেন বলে মনস্থ করে থাকেন তাহলে সে আশা ত্যাগ করে পত্রপাঠ প্রস্থান করুন।

আমি উত্তরে তাঁকে ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য বলি, আমি হিন্দু সন্তান। এই সনাতন পবিত্র প্রথায় বিরোধিতা করে কি আমি নরকে যাব ?

তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, আপনাদের সুতানুটিতে কি সতীদাহের মত পুণ্য কর্ম

হয় না ? আমি—না মহাশয়। এখনও না। তা এই পরলোকগত ব্যক্তি সতীর পরিচয় কি ? ওই ব্যক্তি বলেন পরলোকগত ব্যক্তি অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। ····· তাঁর সম্বন্ধে আপনাদের পত্রিকায় কিছু লিখলে বাধিত হবো। এর নাম রঘুনাথ তর্কতীর্থ। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল। মৃত্যুকালে তাঁর আটাষট্টি বৎসর বয়স হয়। একে অকালমৃত্যুই বলতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ—তাঁর কি একই পত্নী ?

উত্তরঃ হ্যাঁ মহাশয়। তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রথমা পত্নী দশ বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন। ইনি তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী। দশবৎসর আগে বিবাহ হয়। পত্নীর নাম তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরী দেবীর বয়স ত্রিশ। তাঁর আট বৎসরের শিশুপুত্র বর্তমান।

প্রশ্ন ঃ ওই শিশুপুত্র কোথায় ?

উত্তরঃ লোকটি আমাকে অদূরবর্তী একটি বালককে দেখান। এই বালকই কিছুক্ষণ আগে তারাসুন্দরীর জিনিষ পত্র যথা কাপড়, ফুল, আম্রপল্লব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওই ব্যক্তি অতঃপর বলেন, এইবার চিতায় অগ্নিসংযোগ হবে। আপনি যদি ভালভাবে দেখতে চান আরো কাছে আসুন।

ইতিমধ্যে দেখি সতীদাহের খবর পেয়ে অজস্র গ্রামবাসী এসে সমবেত হয়েছে। গ্রামের যুবকরা ভীড় নিয়ন্ত্রণ করছে। ফৌজদারের লোকও তরবারি হাতে তফাৎ যাও তফাৎ যাও বলছে।

আবার বিচিত্র বাজনা শুরু হল। দাহ্য পদার্থ দিয়ে চিতা তৈরী হল। পুরোহিত ততক্ষণ সতীর হাতে জল দিয়ে বললে ; মা এইবার তুমি আচমন করে মনে মনে স্বামীর কথা স্মরণ করে প্রার্থনা করো—চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বের সমান বা আমার মাথার যত চুল তত দিন যেন আমি স্বর্গে স্বামীর সুখ ভোগ করতে পারি। আমার এই পুণ্য কর্মের জন্য যেন আমার পিতামাতা ও স্বামীর পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে যায়।

সতী এই সঙ্কল্প করল। তারপর তার গা থেকে অলংকারগুলি খুলে আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। গহনা নেবার জন্য আত্মীয়দের মধ্যে সে কি কাড়াকাড়ি ! এইবার তার দুহাত বাঁধা হল লালসুতোয়। চুলে দেওয়া হল চিরুনী। কপালে আবার সিঁদুরের টিপ পরানো হল। কাপড়ের আঁচলে বেঁধে দেওয়া হল খই আর কড়ি।

ততক্ষণে শবদেহটি স্নান করিয়ে ঘৃতচর্চিত করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাকে নববস্ত্র পরানো হল। এইবার মৃতের শিশুপুত্রকে ডাকা হল। তাকে বলা হয় মন্ত্রউচ্চারণ করে মৃত পিতার মুখে এক মুঠো খই ছড়িয়ে দিতে। বালকটি তাই

করলো। এবার চিতায় শবদেহটি স্থাপন করা হল। এরপর সতী চিতাটি প্রদক্ষিণ করল। প্রদক্ষিণ করার সময় তার আঁচল খুলে খই ও কড়িগুলি দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। এই কড়ি ও খই বড় পবিত্র তাই দর্শকদের মধ্যে তা সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমি পার্শ্ববর্তী এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কড়ি কুড়োবার জন্য এত কাড়াকাড়ি কেন?

বৃদ্ধ বললেন, মায়ের এই কড়ি ছেলেদের গলায় বেঁধে দিলে সন্তানের আর অসুখ-বিসুখ হয় না।

অহো সতীর কি মহিমা!

এইবার সতীকে চিতায় বসানো হল। তার কোলে মৃত স্বামীর মস্তক। সতীর চারিদিকে কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। তার পাশে একটি বাক্সে আলতা টুকিটাকি জিনিষ রেখে দেওয়া হল। এইবার বালক তার বাবার মুখাগ্নি করল। চিতার বিভিন্ন অংশে অগ্নিসংযোগ করল। ধ্বনি উঠল—হরিবোল হরি। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান অগ্নিশিখার অন্তরালে সতী অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল সে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। কিন্তু প্রচণ্ড ঢাকঢোলের শব্দ ও সতীমায়ের জয় ধ্বনিতে সেই ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে সে কি পৈশাচিক উল্লাস। প্রায় ঘণ্টা দুই মৃতদেহ পোড়ার পর ভস্মাবশেষ গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হল। যে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার হয় সেই ব্যক্তি আমায় বলল, সতীর কি তেজ স্বচক্ষে তো দেখলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হলেন। এই কথাটি লিখবেন যে সর্বত্র সতীরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে থাকেন। বাদশাহের কাছে যে নালিশ যায় তা মিথ্যা।

উল্লিখিত রিপোর্টটি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পাঠকের মনে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই নাড়া দেয় যে, সতীদাহ প্রথা চালু থাকার সময় সতীরা হাসিমুখে মৃতস্বামীর চিতায় উঠে পড়তেন। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ ঠিক নয়। বিষয়টাকে একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সতীদাহ প্রথাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ফয়দা লোটা হত। খুব কম নারীই মৃত স্বামীর চিতায় সতী হতে চাইতেন স্ব-ইচ্ছায়।

দু'জন বৃটিশ মহিলার মতামত এ-বিষয়ে উপস্থাপিত হল। এলিজা-ফে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮০ সালের ২২-মে। তাঁর স্বামী ছিলেন কলকাতার একজন আইনজীবী। শ্রীমতী ফে'র এদেশের ধর্মযাজক সম্বন্ধে উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তিনি যতটুকু দেখেশুনে জানতেন ততটুকু ইংলণ্ডে তাঁর বোনের কাছে লিখে জানাতেন। 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্তে'র লেখক বিনয় ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে শ্রীমতী ফে'র পত্রাংশ উপস্থাপিত হ'ল।

কলকাতা ৫-ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮১। প্রথমে মৃত স্বামীর সঙ্গে বিধবা স্ত্রীর

সহমরণের বিভৎস প্রথার উল্লেখ করতে হয়, একে সতীদাহ প্রথা বলে।.........
......আমার বিশ্বাস হয় না যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর প্রেম থেকে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। প্রেম, ভালবাসা বা মায়া, মমতা অথবা পতিকে পরম গুরু বলে ভক্তি করায় প্রেরণার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তা যদি থাকত তাহলে সেই স্বামী স্ত্রীর সন্তানেরাও একই ভালবাসার টানে পিতামাতার জ্বলন্ত চিতার দিকে এগিয়ে যেত। পরিবারের ভালবাসাটা কেবল স্ত্রীর ক্ষেত্রে সত্য হল, আর সন্তানের ক্ষেত্রে সত্য হল না, একথা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভক্তি বা ভালবাসার সঙ্গে যদি এই কুৎসিত প্রথার কোনো সুদূর সম্পর্কও থাকত তাহলে বিধবা স্ত্রী বা যিনি গর্ভধারিণী মা তিনি অনাথ ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়েও জীবিত থাকার চেষ্টা করতেন। অনুসন্ধান করে আমি যা জানতে পেরেছি তাতে দাম্পত্য প্রেমের সঙ্গে সহমরণের সম্বন্ধই নেই, কারণ উভয়ের যখন বিবাহ হয় তখন তাদের মুখ দিয়ে কথাই ফোটে না, এবং দু'জনেই হয়ত হামাগুড়ি দিতে থাকে। শৈশবেই দু'জনের পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের বিবাহের জন্য বাক্‌দান করে থাকেন। সুতরাং প্রেম, ভালবাসা গোড়াতেও থাকে না, পরে বহু পুত্রকন্যা পরিবেষ্ঠিত পরিবারে জলবায়ুতে তা লতিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। আসলে প্রথাটা হল এদেশে স্ত্রীজাতির নিষ্ঠুর দাসত্ব প্রথার একটা বড় নিদর্শন। স্ত্রী হল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গহনা ও টাকাকড়ির প্রাণহীন পোঁটলা-পুটলির মতন। মরার পর সম্পত্তিটি তিনি রেখে যেতে চান না। সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। তার জন্যই সহমরণের প্রয়োজন এবং শাস্ত্রবচনের আধ্যাত্মিক আস্তরণ দিয়ে এই হীন উদ্দেশ্য চাপা দেওয়া দরকার। এই হ'ল পতিভক্তি প্রণোদিত সহমরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাই এদেশের লোকেরা যখন নারী চরিত্রের মহত্ব সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন তখন সত্যিই আমার হাসি পায়। কারণ একটা সামাজিক কু-প্রথার দাস হওয়ার মধ্যে বাহাদুরি নেই কিছু, মহত্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। সতীরা অবশ্য সমাজে বীরাঙ্গনা বলে কীর্তিত হন এবং পতিগতপ্রাণা বলে কিছু দিন সমাজের লোক তাঁদের স্মরণ করেন। ইংলণ্ডেও যদি বীরত্ব ও সতীত্বের এই সাময়িক গৌরবের সঙ্গে এরকম কোনো সমাজিক কুপ্রথার আচরণ জড়িত থাকত তাহলে ইংরেজ রমনীরাও হয়ত তা পালন করতে কুণ্ঠিত হত না। যেসব স্বামীর সঙ্গে জীবনে একদিনও হয়ত তারা শান্তিতে ঘর করতে পারেন নি,......।"

দ্বিতীয় মহিলা ফ্যানি পার্কস কলকাতা এসেছিলেন ১৮২২ সালের নভেম্বরে। তিনি বহুদেশ ভ্রমণের পর ভারতবর্ষে আসেন। কলকাতাতে বহুদিন ছিলেন। শ্রীমতী পার্কসের ভ্রমণ কাহিনী থেকে একটি প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরোধীতা করেন এবং যাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত

হয় তার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। মোঘল সম্রাট আকবর প্রথমে এ-প্রথা রহিত করবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ শাসন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে মিশনারীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। রামমোহন কলকাতায় আসবার অল্পদিন পর থেকেই সতীদাহর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে এ-প্রথা রহিতের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করেন। তাঁকে সাহায্য করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করে জানাবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যা লিখে পাঠান, তার মর্ম—"চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়, ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটাই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।"

সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে রামমোহন রায় তাঁর প্রচারিত একটি ইংরেজী পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এ-মত উদ্ধৃত করেন—

Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifices in India.—'The English Work of Raja Rammohan Roy', Pub. by Sadharan Brahma Samaj, (1934), pp. 73-74.

রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয় প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সহমরণ অবশ্য কর্তব্য নয় এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমণের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়ঃ—এই অভিমত মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের পূর্বেই প্রচার করেছিলেন। ১৮১৯ সালের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়ের অভিমতের সারাংশ ইংরাজীতে মুদ্রিত হয়েছে। তার কিছুঅংশ উপস্থাপিত হল—

"..He then states Manoo having directed the following formula to be addressed to the bride by priest at the time of marriage, "be thou perpetually the companion of the husband, in life and in death". Hareeta, a later writer, says that it is the inheritance of every woman belonging to the four castes, not being pregnant or not having a little child, to burn herself with her husband. The compiler afterwords quotes Vishnoo moonee as speaking thus, "Let the wife either embrace a

life of abstinence and chastity or mount the burning pile", but he forbids the latter to the unchaste. He then enumerates particularly the various rules laid down by him and others who have followed him on the same side of the question, relative to the time and circumtances in which a woman is permitted to burn herself, and in what cases she is even by them absolutely forbidden. These extracts show that binding the woman, and the other acts of additional cruelty which the aucher of this pamphlet justifies, are totally forbidden. The Soodheekoumoodee as quoted by the compiler says, "Let the mother enter the fire after the son has kindled it around his father's corpse ; but to the father's corpse and the mother let him not set fire ; it the son set fire to the living mother, he has on him the guilt of mardering both a woman and a mother. ...."
......To this effect he quotes the Vijayantee, "while Bramhacharya and burning are perfectly optional, burning may arise from concupiscence ; the Julwamala Vilas and others as declaring that the practice is merely the effect of cupidity and not the fruit of a virtuous and constant mind ; and the Mitakshura as declaring, that by embracing a life of abstinence the widow by means of divine grace may obtain beatitude ; and hence, that a woman's burning herself is improper ; adding, that in former ages nothing was heard of women's burning themselves ; it is found only in this corrupt age. ...." "No blame whatever is attached to those who prevent a woman's burning. In the Shastras it is said, that Kundurpa being consumed to ashes by the eye of Shiva, his wife Rutee, determined to burn herself ; and commanded her husband's friend Madhoo to prepare the funeral pile. Upon this the gods forbid her ; no blame is attached to them for this conduct. Thus also in the Sree-Bhaguvata : a woman, Kripee, had a son, a mighty hero,

from love to whom she forbore to burn herself with her husband ; yet she was deemed guilty of no sin therein. Now also we hear of sons and other relatives attempting to dissuade a woman from burning ; yet they are esteemed guilty of no crime. It is also evident that a woman in thus burning herself, dies merely from her own self-will, and from no regard to any would not induce to die. They merely reason thus, 'By the death of my husband I have sustained an irreperable loss ; it is better for me to die than to live" ; hence a woman determines to die ; and her relatives seeing this mind in her, provide the funeral pile, and say, "If you are determined to die, to die by falling from a precipice would be tedious, die in this manner : "thus a father who has a son determined to go to a distant country, finding all dissuasion vain, at length sends a guide with him who knows all the rivers and dangerous places. The various shastras therefore, describe this action as being merely that of one who having received an incurable wound, is determined to die whether by falling from a precipice, by fire, or by water."—['The Friend of India' (Monthly Series) for Oct. 1819 pp. 473-76].

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের এই প্রবন্ধ থেকে রামমোহন বেশ কিছু তথ্য পান যা সতীদাহপ্রথা রদকরবার পক্ষে কাজ করবে। তিনি হিন্দুশাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেন যে, বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে, এমন কোন নির্দেশ নেই। তাঁর আন্দোলনের সুফলও মেলে। ১৮২৯ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এ-প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। যদিও ইতিপূর্বে ১৭৯৫ এবং ১৮০৪ সালে সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে পরপর দু'টি আইন পাশ হয় কিন্তু কার্যতঃ তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৮২৯ এর নিষেধাজ্ঞা কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা সহজে মেনে নিতে পারেনি, এতে হিন্দুধর্ম লোপ পাবার ভীতি প্রচারের জন্য ১৮৩০ সালে ১৭-জানুয়ারী ধর্মসভা বলে একটি সভা করেন তাঁরা। কিন্তু আত্মীয় সভার পুরোধা রামমোহনের যুক্তির জোরের সামনে প্রতিবাদ টিকল না। সতীদাহ প্রথা নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পর আত্মীয় সভার সমাজ-সংস্কারকগণ এর গতি-ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কাজে নেমে পড়ল। এ'রা হলেন—দ্বারকানাথ ঠাকুর,

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বোস, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান মতিচাঁদ প্রমুখ। বহু বিবাহ, দ্বিবিবাহ, কুলীনপ্রথা, পণপ্রথা, মেয়েবিক্রয়, প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলবার কাজেও তাঁরা নেমে পড়েন।

এইসব সমাজসংস্কারকগণের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে ওঠে এই বাংলায়, মূলতঃ কলকাতাতেই কেন্দ্র করে—১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ, ১৮১৭ সালে দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮১৮ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, ১৮২০-তে বিশপ কলেজ, সংস্কৃতকলেজ (১৮২৪), এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), সাধারণ জনবায়িকাসভা (১৮৩৬), ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮২০) এবং লেডিস সোসাইটি ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার বুকে প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে দেখা যায় ডিরোজিওকে। হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও গঠিত এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা হলেন—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। এঁরা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা সমাজ পরিবর্তনের এবং নারীশিক্ষায় সচেষ্ট হলেন। তাঁরা সহজ বাংলায় 'মাসিকপত্র' প্রকাশ করে ঘরে ঘরে গৃহবধূদের কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েকে শিক্ষাই নয়, নারীদের সামাজিক অধিকার বিষয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনীসভা' সংগঠনটি একাজে নেমে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নারীশিক্ষার গুরুত্ব সমাজ-সংস্কারকেরা উপলব্ধি করে কাজে নেমে পড়েন। এঁদের সঙ্গে সরকারী সহযোগিতাও কাজ করেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মিশনারী এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম উদ্যোগী বলা যেতে পারে; ১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শুরু হয় সহশিক্ষা ব্যবস্থা। এর অনুসরণে কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও বৃটিশ মিশনই প্রথম ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে নারীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা রাখে। ১৮২১ সালে বৃটিশ এবং ফরেন স্কুল সোসাইটি নারীশিক্ষাপ্রসারে মহিলা শিক্ষাবিদ মিস্ কুককে এদেশে পাঠালেন। মিস্ কুক্ কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন এবং নিজের কর্তব্য করে চললেন। এছাড়া ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা কলকাতায় বসবাসকালীন নারীশিক্ষা প্রসারকল্পে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান। ঊনবিংশ শতকের নারীজাগরণে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এই সমাজের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়—বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় (পরে এটি বেথুনস্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়), ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ। ঊনবিংশ

শতাব্দীতে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা জুড়ে চলেছিল নারীপ্রগতির সমারোহ। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক অধিকার বৃদ্ধি—সর্বক্ষেত্রেই নারীপ্রগতির সূচনা হয় এ শতাব্দীতেই।

এ জাগরণের যুগে রামমোহনের পরবর্তী মহৎ সমাজ সংস্কারক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর সময় কাল ১৮২০ থেকে ১৮৯১ সাল। সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলে পরবর্তী যে সমস্যা এসে দাঁড়ায় তা হোলো বিধবাদের। ছোট ছোট মেয়েরা বিধবা হলে তাদের অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। সামাজিক ও ধার্মিক কু-আচার অনুষ্ঠানের কঠোর নিয়মে যথা—একবেলা নিরামিষ আহার, একাদশী পালন, আরো কিছু কঠোরতায় আবদ্ধ রেখে সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করে রাখা হ'ত তাদের। ঈশ্বরচন্দ্র তাই আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচলন আন্দোলনে সাহায্যকারী হিসাবে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামোল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। ১৮৫৫-র গোড়ার দিকে যখন বিধবা-বিবাহ আইন জারীর আয়োজন চলছিল এবং এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হয় তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষের যুক্ত একটি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করে। এ-সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন—বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ পক্ষে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিনসহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর হইয়াছে। যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন—১২মে, ১৮৫৬।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এইকারণে ১৮৫৫ সালে ৪ঠা অক্টোবর তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরিত একখানি আবেনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান। আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু ছিল বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসংগত। ১৮৫৫-র ১৭ নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হলে ভারতের সর্বত্র এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়। রাজা রাধাকান্ত-দেব ছিলেন কলকাতার ধনী ও রাজাদের মধ্যে গণ্যমান্য একজন। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রায়, ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক অবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট পাঠান। দাশরথি রায় লিখলেন—

বিধবার বিবাহ কথা কলির প্রধান কলিকাতা
নগরে উঠেছে এই রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখছি বলবান,
হবার কথা হয়ে উঠছে সব ॥

ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণ ধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্ত্তা বাঙালীর তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ॥
বিবাহ দিতে ত্বরায় হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায়নি সেটা।
... ...
... ...

অপর পক্ষে এর পক্ষেও আর কিছু আবেদন পত্র জমা পড়ে। অবশেষে ১৮৫৬-র ২৬-জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। এ-আইন প্রচারের উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যাঁরা বিধবা-বিবাহ করতে ইচ্ছুক হবেন, বিদ্যোৎসাহিনীসভা তাঁদের প্রত্যেককে একসহস্রমুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন [২২ নভেম্বর ১৮৫৬, সংবাদ প্রভাকর] বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ-রোধ আন্দোলন শুরু করেন ১৮৫০-এ। নারী শিক্ষা প্রসারের তাঁর দান স্মরণীয়। বেথুন স্কুলের দায়িত্বভার তাঁর উপর ছিল বেশকিছুদিন।

ব্রাহ্মসমাজের ঔরসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীও নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রচেষ্টা চালায়। ১৮৬৫ সালে 'বামাবোধিনী' মহিলাদের জন্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরা সমাজ সংস্কারের কাজে অংশ গ্রহণ শুরু করেন। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮২ সালে 'লেডিস অব্ থিওজোফিক্যাল সোসাইটি ইন ক্যালকাটা' এবং ১৮৮৬ সালে সখিসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণকুমারীদেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী নারীদের জন্য কিছু সংগঠন তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্য কন্যা হিরন্ময়ী দেবী মহিলা শিল্প সমিতি গঠন করেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোসের স্ত্রী লেডি অবলা বোস কলকাতায় একটি বিধবাদের জন্য হোম তৈরী করেন, নারী শিক্ষা সমিতি তিনিই গঠন করেন।

নারী জাগরণের আন্দোলনের প্রধান বিষয়গুলি ছিল, নারী শিক্ষার পক্ষে, বিধবা-বিবাহের পক্ষে। বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ এবং এধরনের অন্যান্য অকল্যাণকর কাজের বিরুদ্ধে বেশ কিছু জনমত গঠিত হয়েছে এ সময়। কিন্তু রেনেসাঁসের আলো সীমাবদ্ধ জায়গায় আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসনের অবশানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে জনমত গঠনের। এই আন্দোলনে মহিলারাও এগিয়ে আসেন তাঁদের আইনসঙ্গত অধিকারে সোচ্চার হয়ে। ক্রমে গড়ে ওঠে জাতীয় স্তরে নারী সংগঠন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে জাতীয়তাবোধে মানুষজন সোচ্চার হয়ে

উঠতে থাকে। এর একটা পূর্ণরূপ প্রদানের জন্য ১৮৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কলকাতায় তৈরী হয় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। সমাজের কয়েক-জন সচেতন শ্রেণীভুক্ত মহিলা প্রথম থেকেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই-এর কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে পাঁচজন মহিলা প্রতিনিধি যোগ দেন। এঁদের মধ্যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল এই কলকাতারই মেয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার নারী সমাজ এভাবেই ক্রমশঃ নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করবার কাজে মগ্ন ছিল। সমগ্র বাংলার সঙ্গে কলকাতার মেয়েরাও পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। মূলতঃ নারী জাগরণের সূচনা-কাল এ-শতাব্দীই। পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে আরো শাখাপ্রশাখায় বৃক্ষ হয়েছে সম্পূর্ণ। তাই বিংশশতাব্দীর কলকাতার নারীসমাজ বিষয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরী।

নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজ

এ-বাংলার তথা কলকাতার নারীজাগরণের সময়কাল মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দী। কিন্তু হিন্দু সমাজের নারীরা যে পর্দানসীন অবস্থা থেকে পর্দার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তার সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা। সেই কারণে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চাশ বছরের ভিতর চারটি দল হয়,

(১) কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ বা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

(২) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

(৩) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

(৪) নিরপেক্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ নামোল্লেখের দাবী রাখেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮০ সালের ২৬-জানুয়ারী ব্রাহ্মধর্মকে নববিধান বলে ঘোষণা করেন। ধর্মজগতের বিভিন্নমত পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভাব এনে দিয়েছিল। কেশবচন্দ্র বিধানের ভূমিতে তাদের পারস্পারিক বিরুদ্ধতা দূর করে ঘনিষ্ঠতার দ্বারা তাদেরকে মিলিত করলেন। নববিধান সব বিধানকে রূপান্তরিত করে সকলের জীবনরস নিজের ভিতর সংগ্রহ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ভার বিধাতার উপর সমর্পণ করে, নতুন নতুন রিয়ালাইজেশনলব্ধ যে সুন্দর জীবনলাভ হয় তাই নববিধান। নববিধান একটা আদর্শ, জীবন ও ধর্মমণ্ডলী। এই অভিনব স্বপ্রতিষ্ঠ আদর্শ দুইধাপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬ সাল, সময়কালে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মবিদ্যালয়' ও 'সংগত সভা'-র শিক্ষার সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের যুবকেরা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও শাস্ত্রের মোহ ছিন্ন করে বিবেকের চালনায় একেশ্বরবাদ সাধন করতে থাকেন। সামাজিক জীবনে 'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার', 'নাহি জাত-বিচার', আদর্শ তাঁরা অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁরা জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, পুরুষ ও নারীর অধিকার ভেদ ভাঙ্গলেন, স্বদেশের ও বিদেশের শিক্ষা, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের সব মানুষজনের সাধারণ সম্পদরূপে জীবনে স্থান দিলেন। ভক্তির সঞ্চারে ব্রহ্মোপাসনা প্রাণপ্রদ হ'ল। এটিই নববিধানের পথে প্রথম ধাপ। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান রক্ষণশীল নেতারা এ-সব পরিবর্তন সাধন করবার ক্ষেত্রে আপত্তি জানান। ১৮৬৬ সালে ১১-নভেম্বর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

করেন। বর্তমানে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম দিলেন আদি-ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসমাজের নারীহিতৈষী ব্রাহ্মদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুসমাজের মেয়েরা সত্যসত্যিই বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই বাংলার তথা কলকাতার নারীজাগরণের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুচরণ মহলানবীশের স্ত্রী রুক্মিনী এসেছিলেন হিন্দু সমাজ থেকে। গুরুচরণ মহলানবীশই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। রুক্মিনী ১৮৬২ সালে গ্রাম থেকে শহরে আসেন, বিয়ে হয় ১৮৬৪ সালে মার্চ মাসে। এজন্য গুরুচরণকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

হিন্দুসমাজের বিধবা বিবাহ কার্যকরী করবার জন্য যাঁরাই সে সময়ে হিন্দুমেয়েদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে আসতেন বা বিয়ে করতেন তাঁদের সকলকেই নানারকম বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি মোক্ষদায়িনীর মেয়ে বিনোদিনী বিধবা হয় ন'বছর বয়সে, বিয়ের মাত্র পনেরো দিন পরে। সেই মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তাঁকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল তা বলার নয়। মোক্ষদায়িনী ও তাঁর স্বামী শশিভূষণ কলকাতা ছেড়ে ভাগলপুরে চলে গেলেন তবু বিয়ের আগে বাধা দিলেন শশিভূষণের আত্মীয়েরা। ব্রাহ্মযুবকের সঙ্গে বিয়ে হবার পর বিনোদিনী শিক্ষালাভ করেন এবং সুশিক্ষিতা হন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বনপ্রসূন' 'বাঙালীবাবু' প্রভৃতি।

গুরুচরণের বাড়ীতে হিন্দু কুমারী ও বিধবারা অসুবিধায় পড়ে আশ্রয় নিতেন; হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে প্রায় ত্রিশজন এ-ধরনের মহিলাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। এঁদের অনেকের বিয়ে দিয়েছিলেন গুরুচরণ নিজেই। এ-প্রসঙ্গে শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি তাঁর বিধবাশ্রমের চল্লিশজন বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমা স্ত্রী রাজকুমারী মারা যাবার পর তিনি নিজেও বিধবা গিরিজাকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতীও হিন্দু বিধবাদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান এবং সফলতাও লাভ করেন। নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল, এবং এ-কাজে তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর স্বামী কৃষ্ণকুমার মিত্রের কাছ থেকে। একবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসে তাঁকে বললেন, "দেখ, বিধবা-বিবাহ অনেক দিয়েছি। কিন্তু এদেশের পুরুষগুলি এমন বদ যে, অনেকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে ও পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। আর ঐরূপ বিবাহ দিবনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। যে সকল বিধবা বিবাহ করিতে আসিবে, আমি তোর নিকট তাহাদিগকে রাখিব। তুই তাহাদিগকে তিন আইনমতে রেজেস্ট্রারী করিয়া বিবাহ দিস।"

বিদ্যাসাগরের একথা মেনে নিলেন লীলাবতী সানন্দেই। তিনি এমত কাজও করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র আটজন বিধবা পাঠান, লীলাবতী সবারই ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে ব্রাহ্মসমাজের নারী-পুরুষ এবং হিন্দু সমাজের তদানীন্তন প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বরা নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তের সতীনের ঘর করবেন না বলে শহরে পালিয়ে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নেন বিধুমুখী ; ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু তাঁকে সাদরে আশ্রয় দেয়। বিধুমুখীর অনেক আগে হিন্দুসমাজের কৌলিন্যকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে ছিলেন হরদেব চট্টোপাধ্যায় ; তাঁর দুই মেয়ের সঙ্গে পীরালী ব্রাহ্মমহর্ষি পরিবারের দুই ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হয়ে। তাঁর দুই মেয়ে প্রফুল্লময়ী ও নীপময়ী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর বধূ হয়ে এসেছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর কথা পরে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরাই প্রথম এগিয়ে আসে। মেমসাহেবরা কলকাতায় এসে স্কুল খোলে; ১৮০৭ সালে খৃষ্টান মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নিরাশ্রয় এ্যংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের বিদ্যালয় হয় ১৮১১ সালে এবং সাধারণ মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ও খোলা হয় ১৮১৯ সালে। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেইকারণেই নবযুগের সোনার কাঠির ছোঁয়া সবচেয়ে বেশী লেগেছিল জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। এ-বাড়ীর মেয়েরা নারীশিক্ষা প্রচলনের আগে থেকেই লেখপড়া শিখতেন বৈষ্ণবীর কাছে। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, "প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল জোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজিপুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রাবসনা গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরানী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূত হইতেন।"

স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে বৈষ্ণবীর কাছে লেখাপড়া শেখেননি। তাঁর দিদি সৌদামিনীর প্রথম শিক্ষা এক বৈষ্ণবীর কাছেই। তাঁর কাছে সৌদামিনী শিশুপাঠ ও রামায়ণ পড়া শেখেন এবং কলাপাতায় চিঠি লেখা অভ্যাস করেন। তারপর তিনি হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়েও গিয়েছিলেন। তবে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষ এগোয়নি। মহর্ষি নিজেও বোধহয় মেয়েদের স্কুলে পাঠানো পছন্দ করতেন না। এর কারণ, স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি। তাঁর মতে, পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন করলেই নারীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাই বৈষ্ণবী কিম্বা মিস গোমেস, কারোর শিক্ষাই তাঁর মনোমত হয়নি।

সে সময়ে অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করবার রেওয়াজ ছিল। কেশব পরিবারেও মিশনারী মহিলারা পড়াতেন। ঠাকুরবাড়ীতেও এ-রীতির শিক্ষা শুরু হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী বিধবাদের নানান

সমস্যা বিষয়ে একখানা বই-ও লিখেছিলেন। এঁর বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যাবে।

ব্রাহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যে উপাসনা করবার জন্য কোন কোন পরিবারের মেয়েরা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, এর পিছনে একটা কারণই কাজ করেছে, পর্দানসীন অবস্থার অবসান। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আসবার পর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন, দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ মেয়েদেরকে পর্দার বাইরে আনবার জন্য ক্রমশঃ সোচ্চার হতে থাকেন। এঁরা এবং ব্রাহ্মসমাজের আরো কয়েকজন জানালেন তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা পর্দার বাইরে বসতে চান। কেশবচন্দ্র নিজেও এ-ব্যাপারে অনুদার ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মমহিলাদের নিয়ে রেভারেণ্ড বরসনের বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠি উঠি করছিল; আবার এই ব্যাপার। তিনি মতামত দেবার আগেই দু'একজনের বাড়ীর মেয়েরা চিকের বাইরে এসে বসেছিলেন। তা দেখে কয়েকজন আবার মন্দিরের উপাসনা করাই ছেড়ে দেবেন ঠিক করলেন। এতদিন মেয়েরা প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতেন না। তাঁরা বসতেন চিকের আড়ালে। ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে এখানে ওখানে বেড়াতে যেতেন। এ-অবস্থা কিন্তু কলকাতা নগরীর মেয়েদেরও ছিল; তাঁরা ছিলেন অবরোধবাসিনী। তাঁদের অধিকাংশ সময় কাটত রান্নাঘরে কিম্বা ঠাকুর ঘরে। ধনীগৃহিনীরা রান্না ঘরেও যেতে পারতেন না। কারণ রান্নাবাড়ি ছিল একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল, সেখানে যেত ঝিয়েরা। গিন্নীরা অন্তঃপুরসংলগ্ন মিষ্টি ও সব্‌জির ভাঁড়ারের সামনে ছোট রান্নাঘর পেতে নিজের পছন্দমত বা স্বমীর পছন্দমত দু'একটি পদ রেঁধে নিতেন।

সে সময়ে ঘরে ঘরে ঠাকুর থাকত। আরাধ্য দেবতার পূজো হোতো প্রতিদিন। পুরুত এসে পূজো করতেন। মেয়েরা ফুল গুছিয়ে, মালা গেঁথে, চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখতেন, ঘর মুছতেন, প্রদীপের সলতে পাকাতেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ-কাজ পড়ত অল্পবয়সী মেয়ে বৌদের ভাগে। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ নিরাকারবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় পূজোর যোগাড় মেয়েদের করতে হ'ত না। তাঁরা শুধুমাত্র উপাসনায় অংশগ্রহণ করতেন চিকের আড়ালে বসে। এ-অবস্থার অবসান হ'ল এবং ব্রাহ্মসমাজের সে-সময়কার কয়েকজন ব্যক্তিত্বের ইচ্ছাক্রমেই এই পর্দা-প্রথাও ধীরে ধীরে তাঁদের সামনে থেকে চলে গেল। তবে পারিবারিক দায়িত্ব থেকে তাঁরা কিন্তু সহজেই মুক্ত হতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রজনীকান্ত গুহর মা বলতেন, "বাসী বিবাহের দিন মাথায় টোপর খুলিয়া পাকঘরে ঢুকিয়া-ছিলাম, সারাজীবন পাক ঘরেই আছি।"

মেয়েরা গাড়ি ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোতেন না বলেই ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করেছিল মেয়েদের পায়ে হেঁটে বাইরে বেরবার রেওয়াজ শুরু করার। কিন্তু

কলকাতার ভদ্রমহিলারা বহুদিন পায়ে হেঁটে বেরোননি। গৃহস্থ পরিবারের দাসীরা ছাড়া বেরোতেন খৃষ্টান মেয়েরা। ব্রাহ্মমহিলারাই প্রথম পর্দার বাইরে বেরোবার প্রচেষ্টা রাখে। কলকাতায় ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চালু হল ১৯০২ সালে। এ-সময় প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মপরিবারের মেয়ে পুণ্যলতারা তিন বোন শখ করে বাবার সঙ্গে ট্রামে চড়ে বেড়াতে যান। নতুন ট্রাম তখন দর্শনীয় বস্তু হলেও ভদ্রঘরের তিনজন সুবেশা তরুণীকে ট্রামে চাপতে দেখে লোকেরা ট্রাম ছেড়ে তাদেরই দেখতে শুরু করে দিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে শান্তার অভিজ্ঞতাও একই রকমের। তিনি কলকাতার প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষার ব্যাচ, ১৯১১ সাল। বেথুন কলেজ থেকে তাঁদের ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি বেশী দূর নয়, তবু গাড়ির জন্য বসে থাকতে হ'ত দু'টি ঘণ্টা। তাই সঙ্গিনীরা মিলে স্থির করলেন সবাই মিলে হেঁটে বাড়ি ফিরবেন, দলনেত্রী হলেন শান্তিময়ী দত্ত। কিন্তু পথে বিস্মিত দর্শকেরা দাঁড়িয়ে গেল, কেউ কেউ নাম ধরে তাদের ডাকতে লাগল। বাধ্য হয়েই হেঁটে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল বেথুন কলেজের ছাত্রীদের। হিন্দু মেয়েরা বোধহয় ১৯৩০ সালের আগে পায়ে হেঁটে পথে বেরোননি।

এবার আসা যাক্, বিবাহের প্রশ্নে। বর্তমানে যে মেয়ে দেখার চল্ প্রচলিত, এভাবে আগে ছিল না। কারণ বিয়ে হ'ত ছোট ছোট মেয়েদের; বেশীর ভাগই আট-ন' বছরের মধ্যে। তাই মেয়ে পছন্দের ব্যাপারে অত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হোতো না মেয়েদের। ধনী পরিবারের পুরানো দাসীরা আসত খেলনা নিয়ে। তাদের পছন্দ করা মেয়েই আসত বাড়ীর বৌ হয়ে। মেয়েরা তো বাড়ি থেকে বেরোতেন না, তাই দাসীরাই ছিল ভরসা।

ব্রাহ্মসমাজেই এ-ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে কাজ হ'ল প্রথম। ১৮৬৪ সালেই বলতে গেলে প্রথম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দিদি শরৎকুমারী দেবী তাঁদের সেজো বৌদি নীপময়ীর ছোট বোন প্রফুল্লময়ীর সঙ্গে দাদা বীরেন্দ্রর সম্বন্ধ করবার সময় মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্মসমাজ বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ রোধের সমবেত প্রচেষ্টা রাখে। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরাই মূলতঃ নারী মুক্তির দিশারী এবং এর জন্য ব্রাহ্মসমাজের পুরুষেরা ছিলেন সাহায্যকারী। ধীরে ধীরে এ-শহরে, ব্রাহ্মমহিলাদের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু রমণীরা সামাজিক নানান অত্যাচার-মুক্ত হতে, পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বিধবা-বিবাহ, বিধবাদের নিরাপদ আশ্রয়দান, নারীশিক্ষা—এ-সবের ব্যাপারে এদেশে তথা এ-নগরীর ব্রাহ্মসমাজের দান উল্লেখের দাবী রাখে। তবে ব্রাহ্মসমাজের কাজে একটা বড় অংশের অবস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর। এ-বাড়ীর পুরুষ-মহিলারা বেরিয়ে এসেছিলেন নারী জাগরণের কাজে। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

ঠাকুর বাড়ীর অন্দরমহলে

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে কলকাতার যে সমস্ত পরিবার অগ্রণী তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী অন্যতম বলা যেতে পারে। এ বাড়ির মহিলারাও তদানীন্তন সময়ে ছিলেন অগ্রণী। সেই কারণে তিনশ বছরের কলকাতার নারী সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের সম্বন্ধে যদি আলোচনা না হয়, তবে, বিষয়টি বেশ খানিকটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গোড়া থেকে শুরু করা যাক্। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকা নাথের পিতামহ নীলমণি ঠাকুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নীলমণির পিতামহ পঞ্চানন কুশারী ভাগ্যান্বেষণে প্রথম কলকাতা আসেন। তখনও পলাশীর যুদ্ধ হয়নি। তবে ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই করছে এবং তার কেন্দ্রস্থল হ'ল কলকাতা। এ-সময়ে গোবিন্দপুরে পঞ্চানন প্রথম তাঁর বসতি স্থাপন করেন। ভাগীরথীর তীরে অন্যান্য মৎসজীবী তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে একঘর ব্রাহ্মণ এসে বসবাস শুরু করলে সকলেই তাঁদের সম্মানের চোখে দেখতেন ও 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতেন। এভাবেই একদিন পঞ্চানন কুশারী ঠাকুর হয়ে গেলেন।

ইংরেজদের মুখে মুখেই এই ঠাকুর রূপান্তরিত হ'ল 'টেগার'-এ। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কোম্পানীর আমিনের কাজ করতেন। এই সূত্রেই তাঁদের অবস্থা দিনে দিনে ফিরে যেতে থাকে। জয়রাম ১৭৫৫ সালে মারা যান। তাঁর চার পুত্র আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। পিতার মৃত্যুর আগেই আনন্দীরাম মারা যান। চতুর্থ পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৭১ সালে মারা যান। অপর দুইপুত্র ফোর্ট উইলিয়ম অঞ্চলের পিতৃ বাসস্থান ত্যাগ করে পাথুরিয়াঘাটায় নতুন বসতি স্থাপন করেন। কারণ, কলকাতার ঠাকুর পরিবারের পত্তনের সময় থেকেই এ-পরিবারের ভাগ্য ভারতে বৃটিশ শক্তির উত্থান-পত্তনের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। তাই সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় অর্থাৎ ১৭৫৬ সালে কোম্পানীর লোকদের যখন পালাতে হয়েছিল, ফলতার দিকে, তখন ঠাকুর পরিবারের ভাগ্যেরও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মীরজাফর নবাব হয়ে কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজদের যে টাকা পয়সা দেন, নীলমণি তার থেকে আঠার হাজার টাকা ভাগ পান। আবার যখন ফোর্ট-এর শক্তপোক্ত ব্যবস্থার জন্য গোবিন্দপুরের জমি দখল নিল কোম্পানী, তখন ১৭৬৫ সালে এদেরও পুরনো বসতবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হল পাথুরিয়াঘাটায়। কিন্তু

এখানেও নীলমণি মহাশয়ের বেশীদিন থাকা সম্ভব হল না। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে কিছু বিরোধ দেখা দিলে নীলমণি পাথুরিয়াঘাটা ত্যাগ করে চলে আসেন ভিন্ন বাসস্থানের সন্ধানে।

এই সময় জোড়াবাগান অঞ্চলের বিখ্যাত গঙ্গাজলের ব্যবসায়ী বৈষ্ণব চরণ শেঠ মেছুয়া বাজার অঞ্চলে একবিঘা জমি নীলমণিকে দান করতে চান। শূদ্রের দান গ্রহণে প্রথমে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি 'লক্ষ্মীজনার্দন শীলার' নামে ঐ জমি দান করেন। এই জমিতেই ১৭৮৪ সালের জুন মাস থেকে ঠাকুর পরিবার বসবাস শুরু করে।

জোড়াসাঁকোর এই দেবত্তর সম্পত্তির ওপর নীলমণি প্রথমে একটি আটচালা ঘর তৈরী করেন, পরে গড়ে তোলেন কোঠাবাড়ি। ১৭৯১ সালে চার সন্তান রেখে নীলমণি এই বাড়িতেই মারা যান। তাঁর তিন পুত্রের নাম রামলোচন, রামবল্লভ ও রামমণি আর কন্যার নাম কমলমণি। কমলমণির বিয়ে হয় বেহালার হরিশ্চন্দ্র হালদারের সঙ্গে, রামলোচন ও রামমণি বিয়ে করেন যশোরের রামচন্দ্র রায়ের দুই কন্যা অলোকা ও মেনকাকে। রামমণি অবশ্য দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন, তাঁর নাম দুর্গামণি। দুর্গামণির পুত্রের নাম রমানাথ ও কন্যা দ্রবময়ী। মেনকার দুই পুত্র রাধানাথ ও দ্বারকানাথ। রামলোচন ও অলকাসুন্দরীর একমাত্র শিশুকন্যা শিবসুন্দরী মারা যাবার পর তাঁদের আর কোনো সন্তান না হওয়ায় দ্বারকানাথকে তাঁরা দত্তক পুত্র হিসাবে নিলেন। দ্বারকানাথের একবছর বয়সে তাঁর গর্ভধারিণী মারা যান, ফলে দত্তক নেবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি।

দ্বারকানাথের দত্তক পিতা রামলোচন কলকাতায় তদানীন্তন সময়ে একজন বিশিষ্ট্য ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই ঠাকুর পরিবারে শৌখীন আভিজাত্যের আমদানি করেন। ১৮০৭ সালে ১২-ডিসেম্বর রামলোচন মারা যান। এরপর থেকে তাঁর বিধবা স্ত্রী অলকাসুন্দরী দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথের সহায়তায় দ্বারকানাথের জমিদারি ও বিষয়সম্পত্তি যেমন দেখাশুনা করেন, তেমনি দ্বারকানাথের শিক্ষাসহ সার্বিক বিকাশেও ছিল তাঁর সতত প্রচেষ্টা। নীলমণি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম স্থপতি হ'লেও ধন-ঐশ্বর্যে, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে এ বাড়িতে নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেন দ্বারকানাথ। সতেরো বছর বয়সে যশোরের রামতনু রায় চৌধুরীর কন্যা দিগম্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পরমাসুন্দরী এই দিগম্বরী দেবী ছিলেন খুব গোঁড়া প্রকৃতির। পরবর্তী জীবনে দ্বারকানাথ যখন ধর্মীয় আচার আচরণে শিথিলতা প্রদর্শন করতে থাকেন, তখন থেকেই দিগম্বরী দেবী স্বামীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন এবং দ্বারকানাথও তারপর থেকে বৈঠকখানা বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। এছাড়া, প্রমোদ আয়োজনের জন্য বেলগাছিয়ায় একটি বাগান বাড়ি ক্রয় করেন। এ-বাড়ীতে তদানীন্তন গর্ভনর

জেনারেল অক্‌ল্যাণ্ডের ভগ্নী এমিলি ইডেন অনেকবার দ্বারকানাথের ভোজসভায় যোগ দেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুকালে তাঁর তিনপুত্র জীবিত ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশনাথ, নগেন্দ্রনাথ। তিন ভায়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যায়, বিষয়-বুদ্ধিতে ও দর্শন চিন্তায় ঋদ্ধপুরুষ। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁকে। জীবনের প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেনও তেমনি। কিন্তু পিতামহী অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে নতুন জিজ্ঞাসা উদিত হয়। আর এরফলে জীবনাদর্শেরও শুরু হয় দিক পরিবর্তন, যা তাঁকে বাংলার ধর্ম ও চিন্তা জগতে মহর্ষির সম্ভাষণে ভূষিত করে। সেই অনুসারেই ঠাকুরবাড়ির প্রধান-ভবন 'মহর্ষিভবন' নামে পরিচিত।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যাঁর কথা সর্বপ্রথমে মনে হয় তিনি হলেন, স্ত্রী সারদা দেবী। অতি অল্প বয়সেই তিনি এ-পরিবারের বধূ হয়ে আসেন। বহু সন্তানের জননী ছিলেন তিনি, কাজেই সন্তানদের নিজে দেখাশুনা করবার ক্ষমতা তাঁর বড় একটা ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। বেতনভোগী চাকর বা দাসী তাদের দেখাশোনা করত। তাঁর প্রিয়পাত্রী ছিলেন তাঁর এক খুড়ীমা। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে তিনি তাঁর ভাসুর পুত্রীর বাড়ীতে চলে আসেন এবং নিজগুণে মহর্ষির পুত্রকন্যাদের হৃদয় জয় করে নেন। তিনি মহর্ষির সন্তানদের আদরের দিদিমা ছিলেন। সারদা দেবীর চরিত্রে যে গুণটি সব থেকে পরিস্ফুট, তা হ'ল স্বামীর প্রতি ঐকান্তির ভক্তি। তিনি দেবেন্দ্রনাথের ছায়ার মতই অনুগামিনী ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি স্বামীর সান্নিধ্যলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীর লেখা হতে কিছু অংশ 'উল্লেখ করা যেতে পারে।— "পূজার সময় কোনমতেই পিতা বাড়ীতে থাকিতেন না—এই জন্য পূজার উৎসবে যাত্রাগান আমোদ-যতকিছু হইত, তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন, কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্যসাধনা করিতেন। তিনি বাহির হইতেন।"

পরবর্তী জীবনে মহর্ষির বাড়ীর বাইরে থাকার অভ্যাস আরো বেড়ে যাওয়ায়, দীর্ঘকাল এমনকি বৎসরাধিককাল ধরেও, সারদাদেবীকে একা সন্তানদের নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দিন কাটাতে হত। তখন এই পতিগতপ্রাণা মহিলার, প্রবাসী স্বামীর বিষয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে, কিভাবে দিন কাটাতেন, তার কিছু পরিচয় তাঁর পরিবারের বিভিন্ন মানুষের কাছ হতে পাওয়া যায়। স্বামীর বিষয় দুশ্চিন্তা এবং স্বামীর মঙ্গলকামনাই তখন তাঁর একমাত্র উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়াত। এই সূত্রে তাঁর প্রবাসী স্বামীর মঙ্গল কামনা করে গ্রহাচার্যদের বাড়িতে ডাকতেন

এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা হত, তার জন্য তাঁরা তাঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। তাঁর বয়স্ক পুত্রসন্তানগণ এই ব্যাপারটি খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। এমনকি বাধা দিতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর কল্যাণ কামনা ক'রে আয়োজিত কর্ম এরূপভাবে ব্যবহৃত হতে দেখে মাতার নয়নে এমন অশ্রুধারা প্রবাহিত হত যে মায়ের মুখ চেয়ে তাদের নিরস্ত হতে হত, 'এ সম্পর্কে সৌদামিনী দেবীর উক্তি হতেও তার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।—

'... ..... বৈকালে ভিতরের মহলের তিন তলার ছাদে মা বসতেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বাড়ীর মেয়েদের সভা বসত।.........'

সরদা দেবী যখন বুঝতে পারেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তখন তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর পূর্বে যেন স্বামীর সহিত শেষবারের মত একবার দেখা হয়। এই সতী স্বাধ্বী নারীর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। তিনি জীবিত থাকতেই মহর্ষি বাড়ী এসেছিলেন এবং রোগশয্যার পাশে উপস্থিত হলে, তিনি ভক্তিভরে স্বামীকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। তার অনতিবিলম্বেই মহিলার মৃত্যু ঘটে। এই মহীয়সী মহিলাকে রত্নগর্ভা বললে অত্যুক্তি হয় না।

মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্র নাথের সঙ্গে বিবাহ হয় সর্বসুন্দরীদেবীর। এই মহিলা অল্পবয়সেই মারা যান। মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের যেটি সব থেকে বড় কীর্তি। তা হ'ল আমাদের তদানীন্তন সমাজে নারীদের শোচনীয় পরাধীন অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সেকালে অতি অল্পবয়সেই, বলতে গেলে বালিকা বয়সেই মেয়েদের বিবাহিত হয়ে স্বামীগৃহে আসতে হোতো। তাদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ভদ্রঘরের মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোবার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। অন্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্যা বন্দিনীভাবেই সমগ্রজীবন যাপন করতে হত। কর্মে, বচনে, চিন্তায় কোন স্বাধীনতা ছিল না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাল্যে কন্যা হিসাবে পিতার অধীনে থাকতে হত, বয়স হলে স্বামীর অধীনে, বার্ধক্যে বিধবা অবস্থায় পুত্রের আশ্রিত হয়ে বাস করতে হোতো।

মেয়েদের এই পঙ্গু বদ্ধ জীবন, তাঁর সববেদনাশীল মনকে নাড়া দিত, পীড়িত করে তুলত মনকে। বাল্যকাল হতেই নারীজাতির প্রতি এই অবিচার সত্যেন্দ্রনাথের মনে গভীর সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। তাই দেখা যায়, বাল্যকাল হতেই মেয়েদের এই ধর্মজীবনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এমনকি যখন পরিবারের নিতান্ত একজন বালকমাত্র ছিলেন, তখনও এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে যে তিনি তর্ক করতেন তাঁর বাল্যস্মৃতিতে তার উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক

সময় ধমকাইতেন 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি না কি ?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান নীতির অনুকরণ।"

পরবর্তী সময়ে জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। নিজ পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হয়ে প্রয়োজন হলে, মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও তিনি পশ্চাৎপদ হননি। তিনি যেন এই পরিবারে নারীজাতির স্বাধীনতা স্থাপনকেই জীবনের অন্যতম ব্রত বলে ঘোষণা করেছিলেন। একটি পারিবারিক ঘটনার মধ্যে তাঁর এ-বিষয়ে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পিতা ছিলেন যশোহরের মানুষ, কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী ছিল না। একবার কি উপলক্ষ্যে তার পিতামাতা কলকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে কয়েকদিন বাস করছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর মা মেয়েকে ভাড়া বাড়ীতে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে কিছুকাল রাখতে চেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মা কিন্তু সে ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেননি। তাঁর আপত্তির কারণ ছিল, শ্বশুর বাড়ীর আভিজাত্য সম্বন্ধে তাঁর অতিসচেতনতা। তাঁর যুক্তি হল আভিজাত্যপূর্ণ ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূ আত্মীয়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলে, শ্বশুর পরিবারের সম্মানের হানি হয়। এই বিধি এমন কি পিতামাতা সম্পর্কে'ও প্রয়োগ করা উচিত।

মায়ের এই অনুজ্ঞার খবর যখন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছাল। তিনি মনে করলেন এর প্রতিবিধান করা উচিত। কারণ, তিনি বুঝলেন মায়ের আদেশ হলেও, তা অত্যাচারের সমস্থানীয় হয়ে তাঁর পত্নী এবং কুটুম্বদের গভীর বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি তখন পিতার কাছে গিয়ে তাঁকে বিবরণ জানালেন। মায়ের যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, উদার হৃদয় পিতা তা সহজেই বুঝে ফেললেন। তিনি তখন সারদাদেবীর কাছে গিয়ে যা বললেন তা আমরা শুনব স্বয়ং সত্যেন্দ্র-নাথের পত্নীর মুখ থেকে—

"এসে মাকে বললেন—সত্যেন্দ্রের বউ-এর মা তাকে নিতে পাল্কী পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়াবাড়ী বলে তাকে যেতে দাওনি ? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে এখনি পাঠিয়ে দাও।"

যে ইচ্ছা ছেলেবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের মনে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল তা' প্রবাসবাসের ফলে আরো বল সঞ্চয় করেছিল। বিলাতে তিনি এমন একটি সমাজের মধ্যে ছিলেন যেখানে ছিল অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা। আহারে বিহারে সামাজিক অধিকারে সেখানে নারী-পুরুষের সমস্থানীয়। এমন সমাজেরই মানুষ তখন শৌর্যেবীর্যে আধিপত্যে পৃথিবীর অগ্রণীর স্থান অধিকার করেছে। তাই তাঁর মনে হয়েছিল যে এই জাতির সমৃদ্ধির মূলে আছে স্ত্রী স্বাধীনতা। যুক্তি দিয়ে

বিচার করলে তাঁর এ-ধারণা সমর্থনযোগ্য বৈকি। সমাজদেহ চলে দু'টি পায়ের উপর নির্ভর ক'রে। তার একটি পুরুষ এবং অপরটি মেয়ে, একটা পা খোঁড়া হলে মানুষের যেমন দুর্দশা হয়, আমাদের দেশের সমাজবিধি সেকালে নারী-জীবনকে পঙ্গু ক'রে রেখে আমাদের সমাজেরও সেই দুর্দশা ঘটিয়েছিল বৈকি। প্রবাস হতে তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখতেন সেগুলি তাঁর মনের এইভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল। তার একটা প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই ভিন্নতা থাকুক, এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার কর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রী সৌভাগ্য অনেক দূর।"

এই চেতনার ফলসরূপ প্রবাসবাসের সময় তাঁর মনে ঐকান্তিক ইচ্ছা জেগেছিল, স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিলেতে তাঁর কাছে আনিয়ে নেন। কিন্তু এ-প্রস্তাবে মহর্ষি সম্মতি দেননি।

১৮৬৪ সালে বিলেত থেকে সিভিলিয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি কাজে যোগ দেবার আগে যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর মনে সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, মেয়েদের পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখীদের মত পরাধীনতার নিয়মের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন। এ-বিষয়ে নিজেও তাঁর এই মনের ভাবের কথা তিনি বাল্য-স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন—

"আমাদের স্ত্রীরা পর্দার আন্ধকারে কি খর্বাকৃতি বদ্ধজীবন যাপন করেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান বলক্রিয়া কিছুই স্ফূর্তি পায় না।"—বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দা উচ্ছেদ স্পৃহা আরো জেগে উঠল তাঁর মনে।

এই পর্দা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছিলেন তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে দিয়ে। এ-বিষয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণীরূপেই কাজ করেছিলেন। চাকরিতে যোগ দেবার জন্য যখন সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাইতে রওনা হন, তিনি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, পর্দা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেই। সেই প্রথম ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূ পুরুষের সামনে প্রকাশ্যে বের হয়েছিলেন। প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে বোম্বাই-তে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পত্নীরা যে রীতিতে জীবনযাপনে অভ্যস্থ সেই রীতিতেই জীবন যাপন করবার স্বাধীনতা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছুটি যাপন করতে এ'লেও বিভিন্ন ঘটনার

মধ্যদিয়ে তিনি ঠাকুর বাড়ীর পর্দাপ্রথায় আঘাত হেনেছিলেন। এ-বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের নিজের মুখ থেকেই একটি কাহিনী শোনা যাক্ ; —

"আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্মেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুন। সে কি মহাব্যাপার। শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী-সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি তো ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগ লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"

প্রসন্নকুমার ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের মানুষ এবং সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের পিতার পিতৃব্যস্থানীয়।

পূর্বে-উল্লিখিত হয়েছে যে সত্যেন্দ্রনাথ যখন প্রবাসে ছিলেন, তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল স্ত্রীকে বিলেত নিয়ে গিয়ে সেখানকার সমাজজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিলাতের সমাজের মেয়েরা যেরূপ স্বাধীনতায় অভ্যস্ত তার সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর স্ত্রী দেশে নারীস্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। তখন তাঁর পিতা সম্মতি দেননি বলে তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করেননি। চাকরিজীবনে যখন পরিবার হতে পৃথক হয়ে স্বাধীনভাবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাস করতে থাকেন, তখন ঠিক হয় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে আগেই বিলাত রওনা হবেন এবং পরে সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যতদিন সম্ভব কাটিয়ে আসবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে সম্ভবত ১৮৭৭ সালে এক ইংরেজ দম্পতীর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিলেত রওনা হয়ে যান।

দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন স্বামীর সহিত দেশে ফিরে এলেন, তিনি স্বামীর স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে অভিযানের উপযুক্ত সহকর্মিণী হয়ে গড়ে উঠেছিলন। বিলাতের নারী-সমাজের সংস্পর্শে এসে, তিনি স্বামীর আশার সহিত সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তাঁদের সদ্গুণগুলি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন ফলে স্বামী যা চাইতেন নিজের আচরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে, যেমন ঠাকুর বাড়ীর পর্দাপ্রথার বিলোপসাধনে স্বামীর সহায়তা করেছিলেন, তেমন দেশের নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক কাজও এগিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীর মনে যা ছিল ঐকান্তিক ইচ্ছা উপযুক্ত সহধর্মিনীরূপে তিনি তা পূরণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই অভিযান জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে এনেদিয়েছিল এক বিপুল পরিবর্তন। এ-বিষয়ে মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর একটি উক্তি উল্লেখ করা হল—

"আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ-সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম, তখন চারিদিক

হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।"

ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের জীবনে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছিল, তার মূলে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তিনি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে আপন আচরণের মধ্য দিয়ে এ-সব পরিবর্তন সাধন করবার চেষ্টা করেন। এ-প্রসঙ্গে মেয়েদের বাইরে যাবার উপযুক্ত বেশবিন্যাসের সংস্কারে তাঁর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ্য। তখনকার সমাজে ভদ্রসমাজের হিন্দুমেয়েরা অবরোধবাসিনী ছিলেন। যে পরিবারের আভিজাত্য যত পরিমাণ বেশি, অবরোধের কঠোরতা ছিল তত প্রবল। ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরাও পাল্কীর মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থা ছাড়া বাড়ীর বাইরে যেতে পারতেন না। এমনকি গঙ্গা স্নানের সময়ও তাঁরা পাল্কীর মধ্যে বসে স্নান করতেন। তাই বাইরে যাবার উপযুক্ত পোশাক আমাদের দেশের, এমনকি কলকাতার মেয়েদেরও ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই মেয়েদের প্রথম অন্তর্বাস ব্যবহারের প্রথা প্রবর্তন করেন। এমনকি বর্তমানে যে ডবল করে শাড়ি পরার রীতি প্রবর্তিত আছে তার মূলেও ছিলেন তিনি।

পারিবারিক জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলবার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশুদের জীবনে বৈচিত্র্য আনবার জন্য ছেলেমেয়েদের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে উৎসব করবার রীতি এ-পরিবারে তিনিই প্রথম প্রবর্তিত করেন। শিশুদের সাহিত্যরসের আস্বাদ দেবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৮৫ সালে শিশুদের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রবর্তন করেন; সম্ভবত বাংলাভাষায় এ'টিই সর্বপ্রথম শিশুপত্রিকা। পরে পত্রিকাটি 'ভারতী' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ পার্কস্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া ক'রে কিছুকাল বাস করবার পর বালীগঞ্জের নিজস্ব বাড়ীতে উঠে যান। জ্ঞানদানন্দিনীর গুণে তখনকার শিক্ষিত সমাজে তাঁদের গৃহ একটি বড় আকর্ষণ হয়ে গড়ে উঠেছিল। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর পরিবারের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও শিক্ষিত সমাজের গণ্যমান্য অনেকেই সেখানে আসতেন। এদের মধ্যে ছিলেন—তারক পালিত, মনোমোহন ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বিহারীলাল গুপ্ত প্রমুখ।

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। তাঁর সব থেকে বড়গুণ ছিল বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার আগ্রহ। বাড়ীতে যে সব বালিকাবয়সী নবীনা বধূরা আসতেন তাঁরাও তাঁর কাছে বাংলা শিখতে বাধ্য হতেন, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তো কথাই ছিল না।

মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের থেকে মাত্র এক বছরের ছোট ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার দুই ভগনীর-সঙ্গে বিবাহ হয়। হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় নীপময়ী দেবীর সঙ্গে এবং বীরেন্দ্রনাথের প্রফুল্লময়ীর সঙ্গে। এঁরা ছিলেন সাঁতরাগাছির হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে সাহায্য করে-ছিলেন এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সহধর্মিনী কাদম্বরী দেবী। ১৮৬৮ সালে ৫-ই জুলাই তিনি ঠাকুর বাড়ীতে বধূবেশে আসেন। এঁর এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা স্বভাবতই বালক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁকে স্নেহ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, তাঁর সেবাযত্ন করে তিনি বালক রবীন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ মনের একটি বড় প্রয়োজন মিটিয়ে ছিলেন। যে বালক অনেক সন্তানের মাতার সেবা ও যত্ন হতে বঞ্চিত, যে বালক অনাদরে চাকরদের তত্ত্বাবধানে মানুষ হচ্ছিল, সে হঠাৎ একজন নতুন আগন্তুকের কাছে স্নেহের স্পর্শ এবং সেবা পেয়ে পুলকিত হয়েছিল। স্নেহবুভুক্ষু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই মনে হয়েছিল এই নববধূর আগমন যেন তাঁর জীবনে এক নতুন আনন্দময় অধ্যায় রচনা করেছিল। তিনি বার্ধক্যে জীবনস্মৃতিতে তা প্রকাশ করেছিলেন—

> "আমার বয়সে এ-বাড়ীতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
> পরের ঘর থেকে,
> সেদিন যে মনটা ছিল নোঙর ফেলা নৌকা।
> বান ডেকে তাকে দিল তোলপাড় ক'রে।
> জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
> এল অদৃষ্টের বদান্যতা।"

ক্রমে দেওর ও বৌদির মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধটি গড়ে ওঠে, তা এঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। বৌ-ঠাকুরণের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে রবীন্দ্রনাথের কত না চেষ্টা। নানাভাবে খুশি করতে চেষ্টা ক'রেও এই বালক দেওরটিকে বার বার বিফল হ'য়ে ফিরতে হয়েছে। তাই তিনি ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে-ছিলেন যে তাঁরা দু'জন ভিন্ন মসলায় তৈরী মানুষ। তবে এই অভিজ্ঞতা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তিনি নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে বৌঠানের মনের মধ্যে ঢুকতে একটি ক্ষুদ্র দরজা খোলা আছে। সেটা হল তাঁর কাঁচা আমের প্রতি আকর্ষণ। লঙ্কা দিয়ে শুসনা শাক মিশিয়ে তিনি কাঁচা আম খেতে ভাল-বাসতেন। অতএব বুদ্ধিমান দেওর বাগান থেকে কাঁচা আম সংগ্রহ করে. তাঁকে জুগিয়ে চলতেন এবং ক্রমশ বৌঠানের কৃপাদৃষ্টির ভাগ পেতে থাকেন। কিন্তু

এ-পথেও সব সময় ফল পাওয়া যেত, তা নয়। তার একটি পরিচয় কবি তাঁর কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন—

"একদিন শিলাবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম, ও বললে 'কে বলেছে তোমাকে আনতে'।

আমি বললুম, 'কেউ না'।

ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।"

বাল্যকালে বৌঠানকে তিনি নানাভাবে জ্বালাতন করতেন। তার পরিচয়ও তিনি তাঁর সাহিত্যে কিছু রেখে গেছেন।—বাড়ীর তেতলার ছাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্ধ্যগানের মজলিস এককালে বিখ্যাত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তখন তিনতলার পশ্চিমদিকের ঘরগুলিতে বাস করতেন। তার দক্ষিণে যে প্রশস্ত ছাদ আছে, সেখানে ছিল কাদম্বরীদেবীর নিজস্ববাগান। সেখানে নানা রঙিন টবে তিনি নানা ফুলগাছ লাগিয়ে বাগান করেছিলেন। সন্ধ্যা হলে সেখানেই গানের মজলিস বসত। যে সময়ের কাহিনী, তখন সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ একান্তই বালক, মজলিসে ঢোকবার অধিকার তখনও হয়নি। বৌঠান সে মজলিস যখন অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত, ছোট দেওর পড়া ফেলে এসে, তাঁর আঁচল হতে চাবি চুরি ক'রে সেই বাগানের টবে লুকিয়ে রাখতেন। এই ছিল বিরক্ত করবার রীতি। কবি লিখেছেন ঃ—

"বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের পরে দাদা
সন্ধ্যা তারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।
ছুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তার শাড়িটি লাল পেড়ে।
চুরি করে চাবি গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেন নানান উপদ্রবে।"

এইভাবে স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে এই দেওরটির বাল্য জীবনের আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী। শুধু তাই নয় সেবা ও যত্ন দিয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানেও ত্রুটি ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকে। মাতৃবিয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বছরও পূর্ণ হয়নি। মাতৃবিয়োগের পর বাঁড়ীর বধূদের মধ্যে এই বৌঠানই তাঁকে শোকের আঘাত থেকে রক্ষা করতে, সেবা ও যত্ন দিয়ে মাতৃ-বিয়োগের দুঃখকে লঘু করতে চেষ্টা করেছিলেন যথাসাধ্য। এর স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাই। তিনি লিখেছেন ঃ—

"বাড়ীতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোন অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিন রাত্রি চেষ্টা করিতেন।"

ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য শক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেলে এই মহিলারই স্নেহাশ্রয়ে, তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। বালক কবিকে উৎসাহ দিতে যেমন ছিলেন তিনি, তেমনি কোনো কবিতা রচিত হলে তা শুনতে হত প্রথম তাঁরই। এ-ভাবেই তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে পেয়ে এই নবীন কবির কাব্য রচনায় শিক্ষানবিশী চলে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য শক্তির বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করবার, এই অনন্যসাধারণ বালক-কবির কাব্যকে ঠিকপথে পরিচালিত করবার দক্ষতা এই মহিলার ছিল। সেকালের রীতি অনুসারে বাল্যকালেই বিবাহিত হয়ে শ্বশুর ঘর করতে এসেও, স্বকীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অক্ষুন্ন ছিল। নিজের আগ্রহের প্রেরণায় তিনি এই শ্বশুর বাড়ীতেই সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। বই পড়া তাঁর অবসর সময় যাপনের উপায় মাত্র ছিল না—তাঁর সাহিত্যচর্চার অঙ্গ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন সঙ্গীতচর্চায় রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী ক'রে নিয়েছিলেন, কাদম্বরী দেবী তাঁকে সাহিত্যচর্চার সঙ্গী ক'রে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

"সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্য চর্চায় আমি অংশীদার ছিলাম।"

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধু। সেই সূত্রে এই বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল। কাদম্বরী দেবী তাঁর রচিত সারদামঙ্গল পাঠ করে বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েন। সেই কারণে, তিনি বিহারী-লালকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। এইভাবে দু'জনার মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাদম্বরী দেবীর এই নতুন কবির প্রতি সুগভীর ভক্তি শুধু তাঁকে সেবা করেই তৃপ্তি পায়নি; তিনি তাঁকে কিছু উপহারও দিতে চেয়ে-ছিলেন। সে উপহারের পরিকল্পনাটিও অভিনব, তা তাঁর কাব্যরস-পিপাসুমনের সুন্দর পরিচয় দেয়। তিনি স্বহস্তে একটি আসন বুনে তার মাঝখানে কবির রচিত 'সারদা মঙ্গল কাব্য হতে একটি স্তবক উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন। সে স্তবকটি হল—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু'নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও।"

এই আসনটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সাধের আসন'।

কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক ভাবে হঠাৎ মৃত্যু হলে, তাঁর উপহৃত আসনে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল, কবি বিহারীলাল তার একটি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করে পরবর্তী যে কাব্যপুস্তকটি প্রকাশ করেন তার নাম রাখেন 'সাধের আসন'।

নেপথ্যে থেকে কাদম্বরী দেবী বাংলা কাব্যসাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই কপিবুকের যুগে এই মহিলা রবীন্দ্রনাথের ছিলেন নিত্যসঙ্গিনী। জোড়াসাঁকো বাড়ী ছেড়ে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্য বাড়ীতে যান, তখনও রবীন্দ্রনাথ এ'দের সঙ্গেই থাকতেন। এই দম্পতী যখন চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঠিতে গঙ্গারধারে বাস করতে যান, তখনও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে ছিলেন। এই সময়েই তাঁর-'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের রচনাতে কাদম্বরী দেবী যে তাঁর মুখ্য শ্রোতা এবং উৎসাহদাতা ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর বছরই তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন।

১৮৮৪ সালে ১৯-এপ্রিল কাদম্বরীদেবী আত্মহত্যা করেন। ঐ বছরই বাল্যে রচিত দুখানি কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। একটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', অপরটি 'শৈশব সঙ্গীত'। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচনায় যে কাদম্বরী দেবী প্রধান উৎসাহদাত্রী, তা রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থে যে উৎসর্গপত্র লিখেছেন তা থেকেই অনুমান করা যায়।

মহর্ষির চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কন্যাদের মধ্যে সব থেকে বৈশিষ্ট্য লাভ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। বাড়ীতে পুরুষ মহলে যে নিবিড় সাহিত্যচর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তা অন্দরমহলে প্রবেশ ক'রে, মনে হয় তাঁকে তা স্পর্শ করেছিল গভীরভাবেই। গল্প, উপন্যাস, নাট্যরচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। সাহিত্য পত্রিকা 'ভারতী'-র সম্পাদনার কাজও করেছিলেন কয়েকবছর। তাঁর সাহিত্যিক ক্ষমতার কথা স্মরণ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় কিছু উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বয়সের অনেকখানি ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সরোজিনী' নাটক রচনা উপলক্ষে তাঁর কাব্যক্ষমতা লক্ষ্য ক'রে, তাঁকে তিনি সাহিত্যচর্চার সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে ভগিনী স্বর্ণকুমারীকেও যোগ্য সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি কথা হতে প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃতি করা যেতে পারে।

'পরে জানকী বিলেত যাইবার সময় আমার কনিষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় আমরা তাহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

স্বর্ণকুমারীর কথা পরবর্তী সময়ে আরো বিষদভাবে আলোচনা করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের ভবতারিনীদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় ৯-ডিসেম্বর ১৮৮৩। তাঁর শ্বশুর বাড়াতে তিনি যে নতুন নাম পেয়েছিলেন তা হোলো মৃণালিনী দেবী। এই মহিলাকে কেন্দ্র করে তার দাম্পত্য জীবন নানাভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়। তাঁর

দাম্পত্যজীবন যে সুখের ছিল তার নানান পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মাস তিনেকের জন্য বিলেত যান, তিনি নিয়মিত স্ত্রীকে চিঠি লিখতেন এবং চিঠি পাবার প্রত্যাশা করতেন। চিঠি না পেলে তাঁর মন খারাপ হত। চিঠিতে সম্বোধনেও বৈচিত্র্য ছিল। সাধারণত লিখতেন, 'ভাই ছোট বউ'। এক জায়গায় দেখা যায় সেই সম্বোধনটি 'ভাই ছুটিতে' দাঁড়িয়েছে। সম্বোধনটি নিশ্চয়ই মনোজ্ঞ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি স্ত্রীকে মূর্তিমতী ছুটি বলে কল্পনা করতে পারেন, তাঁর কাছে তিনি কত প্রিয় হয়েছিলেন, তা' বেশ অনুমান করা যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পশ্চিমের তিনতলার ঘরগুলি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর খালি থাকত। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ এই ঘরগুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। এ-খানেই তাঁর সংসার গড়ে ওঠে। এখানেই তাঁর সন্তানেরা ভূমিষ্ট হয়। কাদম্বরী দেবীর আমলের মত, এ-সময়ও তার সংলগ্ন ছাদে সান্ধ্য মজলিস বসত এবং মৃণালিনী দেবীকেই অতিথি আপ্যায়নের ভার নিতে হত। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। তার অনুবাদের কিছু অংশ উল্লেখ করছি।

"আমাদের বাড়ীর তিনতলায় একটি সমতল ছাদ আছে, তা' এতবড় যে তার মধ্যে দুটি টেনিস কোর্টের স্থান সংকুলান হয়ে যায়। তাই ছিল শিশুদের খেলার জায়গা, তাদের আনন্দ কোলাহলে তা' সারাদিন মুখরিত হত। বয়স্কদের মধ্যে মহিলারা সন্ধ্যার মুখে সেখানে একত্রিত হতেন এবং ছাদের মাঝখানে যে অংশটি মঞ্চের মত উঁচু করা আছে, তার উপর কার্পেট তাকিয়া নিয়ে বসতেন। তখনও চা-পানের রীতি প্রচলিত হয়নি, কিন্তু আমার মা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য নানারকম মিষ্টান্ন এবং পানীয় পরিবেশনের ব্যবস্থা করতেন। পুরুষরা আর একটু আঁধার হলে যখন আলো জ্বালা হত, তখন এসে হাজির হতেন। তখন মজলিস জমে উঠত। মজলিসে সঙ্গীত কখনও বাদ পড়ত না।"

এ-যুগেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খামখেয়ালী সভা গড়ে ওঠে। এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিদ্বজ্জন সমাগমের ঘরোয়া প্রতিষ্ঠান। একে কেন্দ্র করে কলকাতার সংস্কৃতিরসিক মানুষজনের সম্মিলন ঘটত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। তার কোন নিয়মকানুন ছিল না। সভ্যেরা পালা করে নৈশভোজে অন্যদের নিমন্ত্রণ করতেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা মোটামুটি কুড়ি জনের মধ্যে থাকত। কেউ কবি, কেউ গায়ক, কেউ অভিনেতা, কেউ বাদক। রবীন্দ্রনাথ যখন অতিথি সৎকারের ভার নিতেন, তখন তা রীতিমত এলাহি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। পরিবেশটি সুশ্রী ক'রে সাজাতে কৃষ্ণনগরের কারিগরদের ডাক পড়ত। সাদা মার্বেলের থালায় নানান পদ

পরিবেশন হত। আর তা রাঁধবার ভার পড়ত মৃণালিনী দেবীর উপর। স্বামীর ফরমাস অনুসারে তাঁকে নিত্যনতুন পদ উদ্ভাবন করতে হত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান কন্যা মাধুরীলতা, দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা, কনিষ্ঠা কন্যা মীরা। রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীদেবীর উপর ভার-দিয়েছিলেন রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করতে। তাঁর ইচ্ছা ছিল মূল সংস্কৃত রামায়ণের ভিত্তিতেই যেন এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি রচিত হয়। মৃণালিনী দেবী দুরূহ হলেও, পণ্ডিতের সাহায্যে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ক'রে স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর পূর্বে তিনি বইখানি শেষ করে উঠতে পারেননি। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে যায় পরবর্তী সময়ে।

গৃহস্থালী শিক্ষার বিষয়েও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। প্রতি রবিবার তিনি বাড়ীর ঝি চাকরদের ছুটি দিয়ে দিতেন। বড় মেয়ে মাধুরীলতা ও বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের উপর তাদের কাজগুলি করবার ভার পড়ত। অন্য ভাই-বোনেরা ছোট ছিল বলে তাদের কোন ভার দেওয়া হত না। অন্য কোন গৃহিণীকে এভাবে বড় একটা ভাবতে দেখা যায় না।

ঠাকুর পরিবারে গৃহের পরিবেশ—

রবীন্দ্রনাথ সহ সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার উৎসাহ দানের সঙ্গে ভাই-বোন সহ আত্মীয়-বন্ধুদের মিলিত উদ্যোগে ঠাকুর বাড়ীতে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, জীবন দর্শনের যে নিত্যনতুন ব্যাখ্যা, সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির যে বহুমুখী প্রচেষ্টা, সে সবই বিকশিত হচ্ছিল দেবেন্দ্রনাথের ব্যাক্তিত্বের প্রশয়ে ও প্রচ্ছায়ায়। ফলে আমরা পেয়েছি দেবেন্দ্রনাথের প্রথমপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের মত স্বদেশ অনুরাগী সংগঠককে, যিনি হিন্দুমেলা সংগঠনে আর 'ভারতী' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতের প্রথম আই. সি. এস. এই বাড়িতেই হয় ১৮৬২ সালে দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। জাতীয় আন্দোলনে নবগোপাল মিত্রেব এই সহযোগীর হাতে ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পতাকা। কন্যা ও বধূদের মধ্যেও ছিল শিল্প সংস্কৃতি চর্চার বিরল আগ্রহ। যা দেশে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করছিল।

গিরীন্দ্রনাথের দুইপুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ। গুণেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে সৌদামিনীকে বিয়ে করেন। তাঁদের চারপুত্র ও দুই কন্যা। গিরিন্দ্রনাথের বড় মেয়ে কাদম্বিনী দেবীর বিয়ে হয় যজ্ঞেশপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা কুমুদিনীর বিয়ে হয় নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নীলকমলের ভাই যদুনাথ বিয়ে করেন রবীন্দ্রনাথের সেজদিদি শরৎকুমারীকে। গুণেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনীর চারপুত্রের কনিষ্ঠ কুমারেন্দ্র মারা যান শৈশবেই, এছাড়া হলেন—

গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং কন্যা সুনয়নী ও বিনয়নী। এঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের পরেই। ভারতীয় শিল্পে নব্যধারার অন্যতম স্থপতি তিনি। সুনয়নী-বিনয়নীও খ্যাত হন শিল্প সাধনায়। ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্পকলা, চারুশিল্প প্রভৃতিতে ছিল দক্ষতা। পরবর্তী সময়ে এ-বিষয় আলোচনা করা হবে।

বাংলার সমাজ-জীবনে ঠাকুর বাড়ীর ভূমিকা—

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গৌরবময় ইতিহাসের কথা কিছুটা উল্লিখিত হয়েছে। একই পরিবারে অনেকগুলি কীর্তিমান মানুষের একত্র সমাবেশ বড় দুর্লভ বস্তু। এ-বিষয় ঠাকুর পরিবারে অনন্যসাধারণ। সম্পূর্ণ একটি শতাব্দী ধরে এই পরিবারের মানুষ বাংলার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র নেতৃত্বের আসন অধিকার ক'রে এসেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দ্বারকানাথ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার তুলনা নাই। তাঁর নানানগুণ কলকাতার ভারতীয় ও ইংরেজসমাজের সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, দেশব্যাপী যে বিরাট ধর্ম আন্দোলন চলেছিল তাঁর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে, সমান-ভাবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সাধনা, ঋষিজনোচিত আচরণ ও ধর্মকে—জাতীয় রূপদেবার প্রচেষ্টা তাঁর জীবনকে বিশেষ গুরুত্বমণ্ডিত করেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ এবং পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের ফল তাঁর পরিবারে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাঁর পুত্রদের জাতীয়তাবোধ এবং সংস্কৃত-চর্চার বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। সাধারণ জমিদার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যেখানে এই পরিবেশে আলস্যে ও বিলাসে গা ঢেলে দেওয়াই প্রচলিত রীতি ছিল, সেখানে দেখা যায় তাঁর গুণীপুত্রগণ সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক একটি বিশেধ বিষয়ের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

মহর্ষির মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় বিশেষ উৎসাহ ছিল। তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথও স্ত্রীশিক্ষায় ব্রতী হন। তিনি বাড়ীর সব মেয়েদের শিক্ষাদেবার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাতে আমাদের সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এ-বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে যখন প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তখন ইংরাজি শিক্ষা প্রচারে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেনি তারা বরং দেশীয় পদ্ধতিতে দেশীয় বিষয়ে শিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছিলেন বেশী। তাই তারা ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করে আরবী ও ফারসী শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহ দেবার জন্য। সেইরকম

হিন্দুদের নিজস্ব শাস্ত্রচর্চার উৎসাহ দেবার জন্য বারানসীতে ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করে। ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারে প্রথম উদ্যোগী হয় খ্রীষ্টান মিশনারী সাহেবরা এবং সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে যাঁরা নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। সকলে অনুমান করেছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবেশ এভাবেই ঘটবে। কিন্তু বাংলাদেশে তা ঘটেনি। তার একটি মূল কারণ, জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে ঠাকুর পরিবারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। এ-প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। সাকার উপাসনার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ছিলেন তিনি, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির রূপটিকে তিনি বর্জন করতে চাননি। সেই কারণেই তিনি রামমোহনের প্রদর্শিত পথে, ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র হতে নিরাকার উপাসনার সমর্থন খুঁজেছিলেন। এ-পথেই ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন ও ব্রাহ্মধর্ম স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয় হিন্দুর উপর খ্রীষ্টান মিশনারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযানও চালিয়েছিলেন। তাঁরই এক কর্মচারীর নাবালিকা ভ্রাতৃবধূকে বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জনসভা করে তার প্রতিবাদ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঠাকুর পরিবার শুধু ধর্ম সম্পর্কিত আন্দোলনে নয়, বাঙালীর জাতীয় জীবনের নানানক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে এবং উৎসাহ দিয়ে, বাংলার সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের বিকাশে বিশেষ সাহায্য করে। এই পরিবারকে কেন্দ্র-করেই নানান প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে ওঠে, সাংস্কৃতিক সম্পদকে পুষ্ট ক'রে তোলে। ইংরেজ সরকার প্রথমদিকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের বিরোধিতা করেছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের যেটুকু ব্যবস্থা হয়, তা জনসাধারণের চেষ্টায়। এ-ব্যাপারে দুজন বিশিষ্ট বাঙালী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, আর তাঁদের চেষ্টাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন ডেভিড হেয়ার। যে দু'জন ভারতীয় এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। এ'দেরই নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তারই ফলে ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সতীদাহপ্রথা যেন বেশীরকম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ-বিষয়ে রামমোহন রায় ইংরেজ সরকারের কাছে বারবার প্রতিবাদ জানিয়ে এই প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করবার প্রার্থনা করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড এই প্রস্তাবের সপক্ষে যে প্রবল যুক্তি আছে, তা অস্বীকার করেননি, কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম বা সংস্কারে এমন ব্যবস্থা করলে আঘাত হানা হবে, এই আশঙ্কায় তিনি এ-বিষয় হস্তক্ষেপ করতে সম্মত হননি। পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতবর্ষের গর্ভনর জেনারেল হয়ে আসেন, রামমোহন, তাঁর কাছে পুনরায় সতীদাহ প্রথা

আইনদ্বারা নিষেধ করতে অনুরোধ জানান। এ-সময় দ্বারকানাথ রামমোহনের প্রস্তাবের বিশেষভাবে সমর্থন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইচ্ছা অনুসারে ঠাকুর পরিবারের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শুরু থেকে দীর্ঘ নয় বছর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এরপর স্বর্ণকুমারী দেবী এ-পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন। ১৮৯৬ সালে এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদিকা হন স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরন্ময়ীদেবী ও সরলা দেবী এবং ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

ঠাকুর বাড়ীতে 'সাধনা' নামে একটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, প্রকাশ কাল ১৮৯১ সাল। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই পত্রিকাটি প্রকাশ হয় এবং তিনিই ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। ঠাকুর পরিবারই সম্ভবত সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে শিশুদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ করবার কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এ-পরিকল্পনা করেন। শিশুদের সাহিত্যে আকৃষ্ট করবার জন্য তিনি 'বালক' নাম দিয়ে ১৮৮৫ সালে একটি শিশু পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদিকা হন। এক বৎসর পর পত্রিকাটি উঠে যায় এবং পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এ পত্রিকাই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে শিশুকে বিষয় করে কবিতা রচনায় উৎসাহিত করে।

'বাংলার নিজস্ব প্রথম নাট্য আন্দোলন এই ঠাকুর বাড়ীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এর পূর্বে নারীর ভূমিকায় অভিনয়ে পুরুষই নামত। কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের সময় এর ব্যতিক্রম ঘটে। বালিকাবেশিনী সরস্বতীর ভূমিকায় নামলেন হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবী। এ-ভাবে এ-বিষয়েও ঠাকুর পরিবার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অভিনয়ে অপেশাদার দলে নারী চরিত্রের ভূমিকায় নারী অভিনেত্রীকে নামানোর এই হ'ল প্রথম দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশে জাতীয়তা বোধ ও স্বদেশী শিল্প প্রসারের আন্দোলনে এই ঠাকুর পরিবার হতেই প্রথম সূত্রপাত হয়। ১৮৬৭ সালে কলকাতায় প্রথম স্বদেশী মেলা বসে এঁদেরই উৎসাহে।

বাংলাদেশের নবজাগরণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অবদান সর্বজন-স্বীকৃত। ধর্ম থেকে সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে অর্থনীতির সর্বস্তরে যে এ-পরিবারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ ঘটেছিল তার উল্লেখ পূর্ববর্তী আলোচনায় মোটামুটিভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিবারের পুরুষেরা যেমন প্রগতির সর্বস্তরে অংশগ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের সাহায্যে পরিবারের নারীরাও যে এগিয়ে এসে-

ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হতে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাতও করা হয়েছে।

ঠাকুর বাড়ীর নারীদের এই ভূমিকা দ্বারকানাথের মায়ের সময় থেকে। সেই কারণে বর্তমানের আলোচনায় ক্রমঅনুসারে ঠাকুরবাড়ীর মহিলাদের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখবার চেষ্টা করছি।

অলকাসুন্দরী—নীলমণি ও তাঁর স্ত্রী ললিতার চার সন্তান। ছেলে রামলোচন, রামমণি, রামবল্লভ এবং মেয়ে কমলমণি। রামলোচনের স্ত্রী হলেন যশোরের রামচন্দ্র রায়ের কন্যা অলকাসুন্দরী। তাঁদের একটি মেয়ে শৈশবেই মারা যায়। অলকাসুন্দরী বোন মেনকার ছোট ছেলে দ্বারকানাথকে দত্তক নেন। মেনকার সঙ্গে রামলোচনের মেজ ভাই রামমণির বিয়ে হয়। অলকাসুন্দরী যেমন নিষ্ঠাবতী, ধর্মভীরু ছিলেন তেমনি ছিলেন বিষয় বুদ্ধি সম্পন্না নারী। তিনি দ্বারকানাথের ধর্ম ও সুনীতি শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণা হলেও গোঁড়ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। দ্বারকানাথের তেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর স্বামীকে হারান এবং সেই সময় থেকেই এই বিধবা মহিলা দ্বারকানাথের শিক্ষা-দীক্ষা লালন-পালনের সমস্ত দায়িত্বই নিজের হাতে তুলে নেন। দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে রাধানাথের সহায়তায় নাবালক দ্বারকানাথের বিষয় আশয় ও জমিদারী পরিচালনা করেন। দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ পূর্বে করেছি, এবং এ-ব্যাপারে শুরুতে তাঁর দত্তক মা অলকাসুন্দরীর ভূমিকার উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। অলকাসুন্দরীই তাঁকে বটবৃক্ষের মত রক্ষা করেছেন, সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন।

দিগম্বরী দেবী—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা। জন্ম যশোরের নরেন্দ্রপুরে। দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ছ'বছর বয়সে। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ, নির্ভীক ও তেজস্বিনী। ব্যবসায়িক কারণে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিভিন্ন ধর্মের মানুষজনের সঙ্গে অবাধে মেলমেশা করতেন এবং নানারকম ভোগবিলাসে আসক্ত ছিলেন। দিগম্বরী পতিব্রতা হলেও ধর্মের বিষয়ে গোঁড়া হিন্দুরমণী ছিলেন। ফলে সে-সময়কার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ গ্রহণ করে, তিনি স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন ব্যতীত অন্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

সারদাদেবী—যশোরের রায় চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে। ছয় বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে প্রবেশ করেন। সময়টা আনুমানিক ১৮৩৪ সাল, এ-সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বছর। দেবেন্দ্রনাথ বাইরের জগতের নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর সারদাদেবী নিযুক্ত ছিলেন গৃহকর্মে। ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরের সর্বময় কর্ত্রী হওয়ার ফলে নিজের সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন দেওয়ার সময় তার ছিল না। যদিও পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রায় প্রত্যেক পুত্র-কন্যা খ্যাতিলাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন তিনি। বাড়ির

বিভিন্ন উৎসব বিলাসী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রার্থনা, উপাসনায় তিনি স্বামীর সঙ্গে যোগ দিতেন। তিনি বিশেষ পড়াশুনা না করলেও তাঁর মেয়ে স্বর্ণকুমারীর লেখা থেকে জানা যায়, চাণক্য শ্লোক তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এছাড়াও আপন ছেলেদের কাছে নিয়মিত রামায়ণ-মহাভারত শুনতেন।

যোগমায়া দেবী—গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। তাঁর মধ্যে শাশুড়ি-দিগম্বরী দেবীর সনাতন ধর্মনিষ্ঠার অনেকটাই লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে লক্ষীজনার্দনের নিত্য পূজা বন্ধ করে দিতে চাইলে যোগমায়া সেইভার গ্রহণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে (গণেন্দ্রনাথ, কাদম্বিনী, কুমুদিনী, গুণেন্দ্রনাথ) নিয়ে দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সারদাদেবীর মত তিনিও কিছু পড়াশুনা করেছিলেন এবং সাহিত্য বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন।

ত্রিপুরা সুন্দরীদেবী—দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে দেবেন্দ্রনাথের ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী এই ত্রিপুরাসুন্দরীদেবী। যোগমায়াদেবী বৈঠকখানা বাড়ীতে উঠে এলেও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগ ছিলনা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর। নগেন্দ্রনাথের পর তিনি প্রয়াত গিরীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে গুণেন্দ্রনাথকে দত্তক নিতে চান। এরফলে গুণেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির অধিকাংশের উত্তরাধিকার হতে পারতেন। এই সম্ভাবনাকে পরাহত করারজন্য দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ সালে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মকদ্দমা আনেন। এই বিবাদ দীর্ঘদিন চলবার পর আপোষ মীমাংসা হয়। পরবর্তীকালে ত্রিপুরাসুন্দরী সন্দেহ পরায়ণা হয়ে ওঠেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল মহর্ষি পরিবার তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়। ফলে তিনি তাঁর সাডারস্ট্রীটের বাড়ী থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কদাচিৎ এলেও কোনও খাদ্য স্পর্শ করতেন না।

সর্বসুন্দরী দেবী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সর্বসুন্দরী দেবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তিনি ঠাকুর পরিবারে শাশুড়ি-ননদ-জা, আত্মীয় স্বজনের সেবাতেই দিন কাটাতেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী—দেবেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র সাতবছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। ঠাকুর বাড়ীতে আসবার পর তাঁর লেখাপড়ার চর্চা শুরু হয়, দেবর হেমেন্দ্রনাথের

তত্ত্বাবধানে ও আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর কাছে। সংস্কারমুক্ত সত্যেন্দ্রনাথের ঠাকুর বাড়ীর পর্দাপ্রথা ভাঙবার প্রচেষ্টায় সহযোগী ছিলেন তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। তিনিই ঠাকুর বাড়ীর প্রথম বউ যিনি স্বামীর সঙ্গে বাইরের পরিবেশে যাতায়াত করেন, দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকেন এবং পুত্র-কন্যাসহ বিদেশে পাড়ি দেন। বেশভূষার ব্যাপারেও নতুনত্ব এনেছিলেন। গুর্জর মহিলাদের অনুকরণে শাড়ীপরা, শাড়ীর সঙ্গে সায়া, ব্লাউজ, জ্যাকেট পরার প্রচলন তিনিই করেন। ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্মদিন পালনের প্রথম উদ্যোক্তাও তিনি। তাঁরই উৎসাহে সত্যেন্দ্রনাথের উনপঞ্চাশ নম্বর পার্কস্ট্রীটের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিন পালিত হয়। নাটক অভিনয়েও তিনি দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত বাজা ও রানী' নাটকে সুমিত্রার অভিনয় করে তিনি প্রশংসা লাভ করেছিলেন। সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। 'সাত-ভাই-চম্পা' ও 'টাক ডুমাডুম' রূপকথা দুটির নাট্যরূপ দেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'ভাউসাহেবের খবর' 'ইংরাজনিন্দা ও দেশানুরাগ', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'কিণ্ডার গার্টেন' 'আশ্চর্য্য পলায়ন'। শিশুদের জন্য সাহিত্য পত্রিকা 'বালক' প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালে।

নীপময়ী দেবী—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। হেমেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ। হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে একধারে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন আবার গান শেখাবারও ব্যবস্থা করলেন। সে সময় ভদ্রজনদের বাড়ীতে মেয়েদের নাচগান শেখানো নিষিদ্ধ ছিল। নীপময়ী দেবী যেমন নানান ভাষায় বই পড়তে পারতেন, তেমনি গান জানতেন, ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। এছাড়াও দেশীবিদেশী রান্না জানতেন। ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর সামনে কোন নতুন বউ এলে তাঁকে ঠাকুর বাড়ীর আদব কায়দা শেখাবার ভার পড়তো নীপময়ীর উপর। হেমেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে শেখাননি এমন বিষয় বোধহয় খুবই কম। তিনি সেকালের সুপ্রসিদ্ধ বেনীমাধব-বাবুর কাছে বাঁয়া-তবলা ও করতাল বাজাতেও শিখেছিলেন। অবশ্য তাঁর এ-সব চর্চা যতটা না প্রকাশ্য ছিল তার থেকে অনেকবেশী ছিল অন্তরালে, অন্তঃপুরের কর্মকাণ্ডে।

প্রফুল্লময়ী দেবী—বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং নীপময়ীর বোন। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থপুত্র বীরেন্দ্রনাথ। প্রফুল্লময়ী দিদি নীপময়ীর মতো হয়তো বিদুষী ছিলেন না, কিন্তু ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর মতো অসহায় সম্ভবত আর কেউ ছিলেন না। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ মানসিক রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় থেকে ১৯১৫ সালে মারা যান। ইতিমধ্যে তাঁর একমাত্র ছেলে বলেন্দ্র-নাথের বিয়ে হয়। কিন্তু তিনিও বেশীদিন বাঁচেননি। ১৮৯৯ সালে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। প্রফুল্লময়ী এইসব আঘাত সহ্য করেছিলেন শান্তভাবে। কারণ পরবর্তীকালেও পুত্রবধূর মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু, বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়া

এবং অর্থাভাব তাঁর জীবনে প্রায়শই আনাগোনা করেছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি 'আমাদের কথা' নামে স্মৃতি কথা লেখেন।

কাদম্বরী দেবী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। কাদম্বরীর বাবা শ্যাম গাঙ্গুলীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীর যোগাযোগ দীর্ঘকালের। ১৮৬৮ সালে ৫-জুলাই ন'বছর বয়সে কাদম্বরী দেবীর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়। এই বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কারণ, তাঁর আশা ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ে হওয়া উচিত কোন শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে, বালিকার সঙ্গে নয়। যদিও পরবর্তীকালে এই বালিকাই ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিচর্চার প্রধান প্রেরণাদাত্রী বা উৎস হয়ে বসে-ছিলেন বলা যায়। কাদম্বরীর প্রথম পরিচয় তিনি ঠাকুর বাড়ীর অন্তঃপুরের কর্তব্যকর্মে একনিষ্ঠ ছিলেন। মেয়েলি কাজে তাঁর সুতীব্র আগ্রহ ছিল। অসুস্থের থেকে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচর্যা করার ভার নিয়েছিলেন তিনি। সদ্যমাতৃহারা একবছরের ছোট রবীন্দ্রনাথকে মানুষ করবার ভার নিয়ে-ছিলেন তিনি। কাদম্বরীর দ্বিতীয় পরিচয় ঠাকুর বাড়ির নিয়মভাঙ্গার কাজে সহযোগিতা করায়। সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অনুপ্রাণিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন। কাদম্বরীর তৃতীয় পরিচয় তিনি ছিলেন সাহিত্য প্রেমিকা। রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরীর দানও অপরিমেয়। ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্যের, সঙ্গীতের আসরে কাদম্বরী ছিলেন প্রাণপ্রতিমা। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশে তাঁর নেপথ্যের ভূমিকা ছিল। এছাড়াও তিনি ছিলেন সুঅভিনেত্রী, সুগায়িকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকে হেমাঙ্গিনী চরিত্রে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে ঠাকুরবাড়ির অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

মৃণালিনীদেবী—যশোরের দক্ষিণ ডিহি ফুলতানাগ্রামের বেণীমাধব শীলের কন্যা ভবতারিণীর বিয়ে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৮৩ সালে ৯-ডিসেম্বর। বিয়ের পর ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর নতুন নামকরণ হয় মৃণালিনী। তাঁকে ঠাকুর বাড়ীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার ভার নিয়েছিলেন নীপময়ী। এছাড়াও তিনি লরেটো হাউসে পড়েন এবং পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি পরবর্তীকালে রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন। তাঁর অনুদিত মহাভারতের শ্লোক, মনুসংহিতা ও উপনিষদের শ্লোক পাওয়া যায়। রূপকথা সংগ্রহের কাজেও হাত দিয়েছিলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' এর মূল তাঁর সংগ্রহ থেকে পাওয়া। মৃণালিনী শুধু এসবই করেননি, রবীন্দ্রনাথের নানান প্রচেষ্টার তিনি ছিলেন সহযোগী। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় তাঁর দান অপরিসীম। তিনি ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি স্বল্প আয়ু পান।

সৌদামিনীদেবী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে। ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' পরবর্তীকালে 'বেথুনস্কুলে' দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে সৌদামিনীকে ১৮৫১ সালে ভর্তি করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সৌদামিনীর লেখাপড়া কতদূর এগিয়েছিল তা বিশেষ জানা যায় না। তবে ঠাকুর বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী ও সেবিকা ছিলেন তিনি। সারদাদেবীর মৃত্যুর পর অন্তঃপুরের দায়িত্বভার তাঁর উপরেই পড়ে। তিনি 'পিতৃস্মৃতি' নামে একটি স্মৃতিকথা ও কিছু গান লেখেন যার মধ্যে 'তোমারে পূজিব অকিঞ্চন' গানটি উল্লেখযোগ্য। সৌদামিনীর বিয়ে হয় সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

শরৎকুমারী দেবী—দেবেন্দ্রনাথের কন্যা। এ'র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ঠাকুরবাড়ীতে রন্ধনশিল্প ও রূপচর্চায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। শরৎকুমারীর বিয়ে হয় রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

সুকুমারীদেবী—দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারী দেবী খুব অল্প বয়সে মারা যান। ঠাকুর বাড়ির এবং বাঙলাদেশের নারী আন্দোলনে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। এই কারণে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন শালগ্রাম শিলা-ব্যতিরেকে ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে। সুকুমারী দেবীর বিয়েই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। ১৮৬১ সালের ২৬ জুলাই হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

স্বর্ণকুমারীদেবী—দেবেন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে আনুমানিক ১৮৫৫ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। কন্যাগণ (১) সৌদামিনী (২) সুকুমারী (৩) শরৎকুমারী (৪) স্বর্ণকুমারী (৫) বর্ণকুমারী। সেকালে অন্তঃপুরিকাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন না থাকলেও ঠাকুরপরিবারে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল। এ-প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারীদেবী লিখেছেন—

'কলিকাতায় সাধারণ সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানি না, কিন্তু সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সেকাল অর্থে এ-স্থলে আমি শুধু আমার শৈশবকাল গণ্য করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্যন্ত এ-সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি,……

যখন আমার মাতৃদেবী [সারদা সুন্দরী] পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্যা পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস করতেন। এই বহু পরিবারের কেউই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরনীয় ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই জানিতেন।

আহার বিরাম পূজা অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি-পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধ, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরানী বিদ্যালোক বিতরনার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃতি বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। অতএব বাঙলা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথাবার্তা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর দর্শন লাভ ঘটে নাই।

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতা ঠাকুরানী তো কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্যছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির কথাই নাই, তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের 'তত্ত্ববিদ্যা'র সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূ ঠাকুরানীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল, মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তক-রাশিও থাকিত।...

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পর সংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্মসংস্কারের সহিত যে পরিমাণ সমাজ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজ সংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু

গৌণভাবে নহে, ধর্মসংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইঁহার দ্বারাই যে সর্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্তন সংকল্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পরি।"...

......বেথুন স্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই একটি মহোদয় সর্বাগ্রে তাঁহাদের শিশুকন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশে এবং ভিন্নসময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, ও ধর্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকাল প্রচলিত হীন স্ত্রী আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজি কালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নবপদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ-পর্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার শিশু কন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চউন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশববাবু পিতা মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। ....

এতক্ষণ যাহা, বলিলাম, এ-সকলই মেজদাদা মহাশয় [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত যাইবার পূর্বেকার কথা—১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিত। প্রথমোক্ত সময়ে তাঁহার বিবাহ হয় এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৎসরান্তে, কিম্বা তাহারও পরে, ধর্ম্মের জন্য নহে, কেবল স্ত্রীশিক্ষার জনাই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ

ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরানী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।···

("আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার" 'প্রদীপ' বার্ষিক ভাদ্র ১৯০৬)

'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় [সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ১২৯১ থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়া স্বর্ণকুমারী দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর উপর 'ভারতী' পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। তিনি এর ভার গ্রহণ করেন পত্রিকা প্রকাশের সাত বছর পর।

তাঁর রচনা গ্রন্থাবলী—

(১) দ্বীপনির্বাণ (উপন্যাস)—১৮৭৬ ডিসেম্বর :

(২) বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য)—১৮০১ শক (৪ নভেম্বর ১৮৭৯)

(৩) ছিন্নমুকুল (উপন্যাস)—(৪ নভেম্বর ১৮৭৯)

(৪) মালতী (উপন্যাস)— ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (২৫ মার্চ ১৮৮০)

(৫) গাথা—১২৮৭ বঙ্গাব্দ (২০ ডিসেম্বর ১৮৮০)

(৬) পৃথিবী—(বৈজ্ঞানিক পুস্তক), আশ্বিন ১২৮৯ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮২)

(৭) সখী সমিতি—১২ আগষ্ট ১৮৮৬,

(৮) মিবার রাজ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)— জৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭ জুন ১৮৮৭)।

(৯) হুগলীর ইমাম বাড়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস),— পৌষ ১২৯৪ (৬. জানুয়ারী ১৮৮৮)

(১০) স্নেহলতা (উপন্যাস)— ২৩ জানুয়ারী ১৮৯০—১ম খণ্ড।
—১৫ মার্চ ১৮৯৩— ২য় খণ্ড।

(১১) বিদ্রোহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—৯ আগষ্ট ১৮৯০

(১২) বিবাহ উৎসব (নাটক)—১৩ মে ১৮৯২

(১৩) নবকাহিনী (ছোট গল্প)—১৭ আগষ্ট ১৮৯২

(১৪) ফুলের মালা (উপন্যাস)—১২ মার্চ ১৮৯৫

(১৫) কবিতা ও গান—১ ডিসেম্বর ১৮৯৫

(১৬) কাহাকে ? (উপন্যাস)—জুলাই ১৮৯৮

(১৭) কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা—১৯০১ সাল
(১৮) দেবকৌতুক (কাব্য নাট্য)—১৩১২ বঙ্গাব্দ (২৬ জানুয়ারী ১৯০৬)
(১৯) কনে-বদল (প্রহসন)—বৈশাখ ১৩১৩ (১৯০৬ সাল)
(২০) পাকচক্র (প্রহসন)—২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১১
(২১) রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস)—১৭ এপ্রিল ১৯১৩
(২২) নিবেদিতা (নাটক)—৩, এপ্রিল ১৯১৭
(২৩) যুগান্ত কাব্যনাট্য—২০ জানুয়ারী ১৯১৮
(২৪) বিচিত্রা (উপন্যাস)—১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭ মে ১৯২০)
(২৫) স্বপ্নবাণী (উপন্যাস)—জৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪ অক্টোবর ১৯২১)
(২৬) মিলন রাত্রি (উপন্যাস)—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫
(২৭) দিব্যকমল (নাটক)—১৪ এপ্রিল ১৯৩১

ইংরেজী অনুবাদ—

(১) The Fatal Garland—1910 By A christina Albers.

'ফুলের মালা'র ইংরেজী অনুবাদ, এই অনুবাদ প্রথমে ১৯০৯ সালে মর্ডান রিভিয়ুতে প্রকাশিত হয়।

(২) An Unfinished Song—1913-By Mrs. Ghosal। 'কাহাকে'র অনুবাদ।

(৩) Short Stories (Ganesan, Madras)

'দিব্য-কমল'—জার্মান ভাষায় Princess Kalyani নামে প্রকাশিত হয়।

১২৯২ সালে 'সখিসমিতি' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই এর সম্পাদিকার কাজ করতেন। 'মহিলা শিল্পমেলা'ও তাঁহারই উদ্ভাবিত।—অসহায় বঙ্গ-বিধবা ও অনাথা বঙ্গ কন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য। নারী কল্যাণ কাজে স্বর্ণকুমারীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা হিরন্ময়ী দেবী।

"সখাসমিতি ও শিল্পমেলার কর্ত্রীসভার সখীগণ"-এর তালিকা—শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs M. Ghose), শ্রীমতী বরদা সুন্দরী ঘোষ (Mrs. L. Ghose), শ্রীমতী ললিতা রায় (Mrs. P. L. Roy), শ্রীমতী মনোমোহিনী দত্ত (Mrs. P. K. Roy), শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা (Mrs. K. G. Gupta), শ্রীমতী থাকমণি মল্লিক (Mrs. O. C. Mullick), শ্রীমতী সরলা রায় (Mrs. P. K. Roy), শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্তা (Mrs. K. G. Gupta) শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী (Mrs. P. Mukherjee), শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী (Mrs. S. P. Ganguli), শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দাস (Mrs. G. N. Dass), শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু (Miss C. M. Bose), শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (Mrs. N. N.

Dutta), শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী (Mrs. R. Tagore), শ্রীমতী বিধুমুখী রায় (Mrs. R.N. Roy), শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী (Mrs. Bugchi), শ্রীমতী সুরবালা দেবী (Mrs. T. N. Mukherjee), শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (Mrs. J. Ghosal) সম্পাদিকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮২-৮৬ সময় কালে স্বর্ণকুমারী 'লেডীস্ থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন।

হিরন্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম, বালীগঞ্জ—কালক্রমে সখিসমিতির আয়ু ফুরিয়ে এলে, একে সঞ্জীবিত রাখবার জন্য হিরন্ময়ীদেবী ১৯০৬ সালে রূপান্তরিত আকারে বর্তমান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে হিরন্ময়ীদেবীর মৃত্যু হলে সরলাদেবী জ্যেষ্ঠা ভগনীর কথা যা লেখেন, তাতে বিধবা শিল্পাশ্রমের সম্বন্ধে অংশটি আছে—

উপর্য্যুপরি অনেকগুলি সন্তান বিয়োগে হিরন্ময়ীর সন্তান বাৎসল্য বুভুক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাখিয়া পালনের জন্য উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত ম্রিয়মান সখিসমিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উহা বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পর্য্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের অনতিপূর্বে তিনি অন্তপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মুল সখিসমিতি ও কলাভবনের সুমিশ্রণ জাত এই বিধবা শিল্পাশ্রম, হিরন্ময়ী দেবীর নিজস্ব কীর্তি।.. ......

এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে—'কমিটির প্রেসিডেণ্ট পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীদেবী।......তাঁর [হিরন্ময়ী] দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কীর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম ('ভারতী' ফাল্গুন ১৩৩২, পৃঃ ৩৭৪-৭৫)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৯-২১-এ মাঘ কলকাতায় ১৯-শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী সাহিত্য শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে তাঁকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দান করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার সমাদর করেছেন। মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই প্রথম এই পদক লাভ করেন। ৩-জুলাই ১৯৩২ তারিখে বালীগঞ্জের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইন্দিরা দেবী—ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর পরিবারের বিদুষী মহিলা। তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং বাংলা সাহিত্যের দিকপাল, সঙ্গীতজ্ঞ এবং দেশীকোত্তম (ডি. লিট.)। ১৮৭৩ সালে জন্ম। শৈশবে কিছুকাল কাটে

ইংলণ্ডে। বিলেত থেকে ফিরবার পর তাঁর শিক্ষা প্রধানত বিলাতী স্কুলেই হয়। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে যে স্বাদেশিকতা ছিল তার প্রভাবে ইন্দিরা দেবী মনে প্রাণে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৮৯২ সালে কলকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে বিবাহ হয়, ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' কাগজখানি প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবী যে প্রবন্ধ ধারা এই পত্রিকায় দেন, তা পরে 'নারীর উক্তি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে তাঁর খুড়তুতো বোন প্রতিভাদেবী, 'আনন্দসভা' নামে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দিরাদেবী এর সঙ্গে বহুকাল কাজ করেন। এই বিদ্যালয় থেকে 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা চালানো হ'ত। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে অস্থায়ী ভাবে কিছুকাল কাজ চালান। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী সমাবর্তন সভায় তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে ১২- আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

(১৯৪১-এর পর) শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন প্রখ্যাতা চিত্রশিল্পী চিত্রানিভা চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঠাকুর বাড়ীর আর কয়েকজন মহিলার পরিচিতি ঘটবে।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পত্র যথাসময়ে পেয়ে খুশি হয়েছি। তোমরা সপরিবারে আমার নববর্ষের আশীর্বাদ জেন। দু'মাস পরে উত্তর দিচ্ছি বলে কিছু মনে কর না।—আমি সেজন্য বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত। এই বয়স, তা'তে এই গরম। তা'তে নববর্ষের চিঠির প্রবল বন্যা এখনও সামলাতে পারিনে। তাই জন্য কাউকেই সময়মত লেখা হয় না। আমি বয়সের পক্ষে মন্দ নেই, তবে ক্রমে দুর্বল ভিন্ন সবল হবার কথা নয়। কোথাও নড়তে চলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই কলকাতায় গিয়ে জোড়াসাঁকোর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তুমি যদি ৬নং-এ গিয়ে বউমায়েদের সঙ্গে আলাপ করত মন্দ হয় না। এখন যদিও ভাঙ্গা হাট, তবুও ২।৪ জন যাঁরা আছেন দেখাশুনা হলে খুশি হবেন নিশ্চয়ই। এখানকার অমিতাকে জান নিশ্চয়? দেখি যদি তাকে লিখে তোমাদের যাতায়াতের সূত্রপাত করিয়ে দিতে পারি।

সুপর্ণা এখান থেকে মায়া বাড়িয়ে দিয়ে সম্প্রতি তার শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে—ধানবাদে ভীষণ গরমে কষ্ট হচ্ছে। আমরাও গত দু'মাসে কম কষ্ট পাইনি। তবে এখন একটু বর্ষার আশা ও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বুবু ভালই, ছেলে মেয়ে পড়া-শুনায় পাস করেছে।......

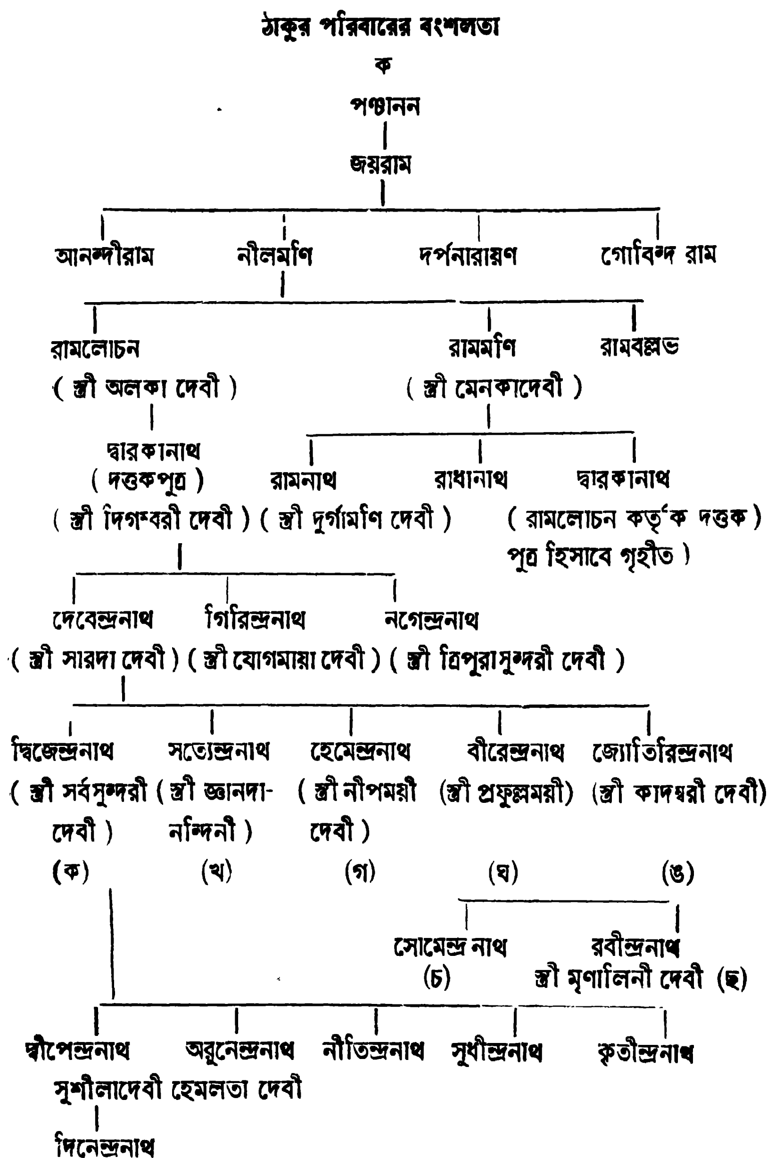
অমিতাদি—মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অহীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী।

বুবুদি—বিবিদির ভাইপো বউ, সুপর্ণা তারই কন্যা।

চিত্রলেখা—বিবিদির প্রিয় ছাত্রী এবং শিল্পী চিত্রানিভা চৌধুরীর কন্যা।

বিবিদি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরীর ডাকনাম।

সবশেষে ঠাকুর পরিবারের একটি খসড়াচিত্র উপস্থাপন করে এ-অধ্যায়ের যবনিকা টানব—



(খ) সত্যেন্দ্রনাথ—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

সুরেন্দ্রনাথ (স্ত্রী সংজ্ঞাদেবী)
ইন্দিরা দেবী (স্বামী প্রমথ চৌধুরী)

(গ) হেমেন্দ্রনাথ—নীপময়ীদেবী

হিতেন্দ্রনাথ
ক্ষিতিন্দ্রনাথ
ক্ষেমেন্দ্র (স্ত্রী মেনকা দেবী।
ঋতেন্দ্রনাথ

(ঘ) বীরেন্দ্রনাথ—প্রফুল্লময়ী

বলেন্দ্রনাথ

(ঙ) জ্যোতিরিন্দ্র নাথ—কাদম্বরী দেবী

নিঃসন্তান।

(চ) রবীন্দ্রনাথ—মৃণালিনী দেবী

মাধুরীলতা (স্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) নিঃসন্তান
রথীন্দ্রনাথ (স্ত্রী প্রতিমাদেবী)
রেণুকা (স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) নিঃসন্তান
মীরা (স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)
নীতিন্দ্র
নন্দিতা (স্বামী কৃষ্ণকৃপালনী)
সমীন্দ্র

গিরিন্দ্রনাথ—যোগমায়া দেবী

গগনেন্দ্রনাথ
স্বর্ণকুমারীদেবী)
গুণেন্দ্রনাথ (স্ত্রী সৌদামিনী দেবী)

বিনয়নী দেবী
গগণেন্দ্র নাথ
সমরেন্দ্রনাথ
অবনীন্দ্রনাথ

নগরীর অন্ধকারের কথা (বাবু-বিবিদের কলকাতা)

কলকাতার বয়স আজ ৩০০ বছর। আজ রাতের কলকাতার চিত্র পুরানো কলকাতার চিত্র অপেক্ষা যেন স্বতন্ত্র। রাতের কলকাতায় আজ যেমন চলে নগরীর নগর-বনিতাদের কোলাহল, সেকালেও চলত, তবে তফাৎ এই যে, সেকালের বাবুরা বাঈজী নাচের পূজারী কিন্তু আজকের বাবুরা দেহের পূজারী। তাই বুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে।

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের অনেকখানি সময় বাংলার সমাজজীবনে জোয়ার এসেছিল নববাবুদের স্বেচ্ছাচারিতার। খেয়াল-খুশির সমুদ্রে যথেষ্ট অবগাহনের অদম্য স্পৃহা সেযুগে এই নববাবু শ্রেণীর প্রত্যেক বাবুর মধ্যেই দেখা গেছে। পিতা-পিতামহের সঞ্চিত ধনে এ'রা ছিলেন যেমন গর্বিত, তেমনি কে সর্বোচ্চ ধনী তা প্রকাশ করার জন্য দু-হাতে যথেচ্ছভাবে অর্থ উড়িয়েছেন নির্দ্বিধায়—এমন সব নববাবুদের চিনতে সেকালে কারও অসুবিধে হতো না। পরনে চওড়া কালো পেড়ে ধুতি, গায়ে ফিনফিনে জরির কাজকরা বেনিয়ান, গলায় টুনট করা উড়ুনি। মাথায় বাবরি চুল, পায়ে নাগরাই চটি। হাতে থাকতো সুন্দর কাজকরা কাঠের ছড়ি। এ'রা যখন টমটম বা পাল্‌কি চড়ে রাস্তায় বেরুতেন, সুগন্ধী আতরের খুশবুতে পাড়াময় ম-ম করতো।

পূজো-আর্চ্চা, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, দোল-দুর্গোৎসব, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম, এমনকি গঙ্গাযাত্রার শোকবহ মুহূর্তেও এই বাবুরা আমোদ লুটতেন হরিলুটের মতো অর্থব্যয় করে। এরই পাশাপাশি চলতো আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন, বাঈজী-নাচ, বাগানবাড়ি-বেশ্যালয়, মাইফেল, বুলবুলির লড়াই।

বিষয়টাকে একটু কাব্য করে বললে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায়, সে কলকতা রূপোসী, উপোসী, ক্রন্দসী, উষসী। সে কলকাতা অঙ্গনা, ললনা, নন্দনা, অনন্যা, তার যৌবন হাস্যে টলমল, লাস্যে উতরোল। তার কৈশোরের উন্‌-মাদন, উন্‌-মোচন, উন্‌-হনন। সে কলকাতা জীবনটাকে হাজার টাকার বাজার করতো। সে কলকাতা হঠাৎ কখন ফুরিয়ে যেত। আকাশ ছিল তার সুখ সোহাগী ভাতার, বাতাস ছিল দুধদেমাকী নাগর। সে কলকাতা বাবুদের চকচকে পাম্পসু পরা, ঝকঝকে চশমা ধরা, চুকচুকে লাঠি লড়া, টুকটুকে বউ ন্যাকড়া, ফুরফুরে বাবুর দল। বড়োবাবু—মাথা সাদা, মেজবাবু—একটু কালো, রাঙাবাবু সবার সেরা, ছোট বাবু সবচে ভালো।

সে কলকাতা বিবিদের, রঙ বাহারী শাড়ির নাচন, সুর, পাহাড়ী রূপের কাঁকন, দেমাকভারী রূপের, কাঁদন, শরম ছুঁড়ী সোহাগ কারণ। কতো বিবি, মেম বিবি

সাজের মরণ, দেশী বিবি—লাজের ধরন, বাচ্চাবিবি—পেখম যৌবন, কচি বিবি—রূপের আগুন। পুরোনো কলকাতায় ছিল ন'বছরের গৌরীদান, শহরের বুকে ছিল সতীদাহের জ্বালা। অথচ এই কলকাতাতেই ছিল আতুল দেহের রাতুল পায়ের লাতুল ঝুমুর ; বাতুল মনের অতল তলে বিপুল গুমোর।

যখন আসতো খুশীর দিন, কলকাতা সাজতো কনে দেখা আলোয়, জ্বলে উঠত তিনটি রাতের রঙমশাল। দুর্গোৎসবের বিজয়ায় বাবুরা হতেন সিদ্ধির নেশায় নীলকণ্ঠ। লখ্‌নৌর বুব্‌বাঈ, বিষ্ণুপুরের সরযূবাঈ-এর ঝনক-ঝনক পায়েলে কোমল মসলিনে ফুটতো শতদল, এ-যেন উৎসবের এক অঙ্গ।

কলকাতার এই বাবু-কালচার সৃষ্টি হয় মূলতঃ বৃটিশ আমলের নতুন জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার এবং হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিত্তবান জেণ্টুদের উচ্ছ্বাসেই। এই জেণ্টু বা জেণ্টলম্যানদের কীর্তিকলাপের অজস্রচিত্র ধরা আছে সমসাময়িক কালের পত্র-পত্রিকা এবং জীবন চরিতের পাতায়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, এইসব অপকীর্তির পাশাপাশি এই নববাবু সমাজের অনেক সুকীর্তিরও স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই সব পত্র-পত্রিকায়। দান-ধ্যান, সামাজিক সৎকার্যে এ'দের দান কম ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,—

কান্দীর রাজবংশের দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ ছিলেন এমন একজন পুরুষ যাঁর চরিত্রে উক্ত উভয়দিকেরই সংমিশ্রণ দেখা যায়। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। খেয়াল-খুশি মত পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সোনার পাতায় নিমন্ত্রণের চিঠি খোদিত করে বা সোনামুখীর প্রসিদ্ধ পুরাণ কথক-গদাধর শিরোমণির পুরাণ পাঠ শুনে লক্ষ্য টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। অন্যদিকে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁদের গৃহাদি সংস্কার ও ছাত্রদের আহার পরিচ্ছদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। গঙ্গাগোবিন্দ নদীয়ার কাছে রামচন্দ্রপুরের শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী ও মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের সেবার জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দেশ করে গেছেন। ভোলানাথ চন্দ্র এ সম্বন্ধে তাঁর Travels of a Hindoo-র প্রথম খণ্ডে লিখেছেন ;

The daily expense at this shrine is said to be 500 rupees, inclusive of alms and charity to the poor.

ভাবতে কি অবাক লাগে না যে, ২০০ বছর আগে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাতৃশ্রাদ্ধের বহরটা কেমন হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কান্দীতে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতে যোগ দিতে এসেছিলেন কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে কয়েক সহস্র পণ্ডিত। ভাট, ভিক্ষুকদের তো সীমা ছিল না। নদীয়া, নাটোর, বর্ধমান, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের সপারিষদ রাজা-মহারাজারা এসেছিলেন।

এঁদের থাকার জন্য বড় বড় বাড়ি তৈরি করানো হয়েছিল। আর তেল-ঘি রাখার জন্য কাটা হয়েছিল বড় বড় দুটো পুকুর। সিধা বিতরণ করা হতো শত শত মণ—প্রতিদিনই।

এবার আসা যাক্ শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেব-এর কথায়। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনিও কম যাননি। শোভাবাজার নামটি হয়েছে মানুষের মুখে মুখে। আসলে নামটি ছিল সভাবাজার। সভাবাজার নামের সৃষ্টিকর্তা মহারাজ নবকৃষ্ণ। এর আগে এ-জায়গার নাম ছিল রাসপাল্কী। ব্রাহ্মণদের দিয়ে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে সভা বসিয়ে ছিলেন এখানে মহারাজ। এই সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অভ্যাগত রাজা মহারাজার থাকার জন্য আবাসস্থল তৈরি করিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ এক মাইল জায়গা জুড়ে। স্থাপন করিয়েছিলেন পণ্যবিথীকা। কারণ অভ্যাগত অতিথিরা যাতে বিনা পয়সায় অনায়াসে চাল, ডাল, ঘি, ময়দা সবকিছুই পেতে পারে এই পণ্যবীথিকার দোকান থেকে। আর শ্রাদ্ধের সমারোহ? সহজেই অনুমেয় কত লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ।

মহারাজ নবকৃষ্ণর দত্তকপুত্র গোপীমোহন। তিনিও তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে কম যাননি। ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ সমাচার দর্পণ পত্রিকা জানাচ্ছে ঃ

পূর্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণপত্র লোকজন ও অতি দূরদেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন যে তাঁহারা তদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই এবং দেশ-দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। সভার মধ্যভাগে সুবর্ণময় দান সাগরের সামগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপাময় গাড়ু। দানসাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া একরাশি, সভার পূর্বভাগে রূপার খট্টা ১৭ খান তাহার আসাদি সমুদয় শাঠীন বস্ত্রেতে সোনারূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্বভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ দানীর দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যক দানের দক্ষিণা একই সুবর্ণমুদ্রাসমেত সাক্ষাৎ কারে অপূর্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণহস্তে দান করিয়াছেন। পারে উত্তম ষোল জোড়া শাল ও দুই বস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগদ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পত্তি পশ্চিমদেশ হইতে আনাইয়া দুইহাজার টাকার অলংকার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণমোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সমাজ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহণ করাইয়াছেন।...

গোপীমোহন তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে বিলাসবহুল খরচ করেছিলেন। ভালো

চালের দাম ছিল ১মন ৩২ সের একটাকা চার আনা, তেল ১ মন পাঁচটাকা, আটার মন তিন টাকা।

অর্থের লড়াই, সম্মানের লড়াই, বৈভব প্রতিপত্তির লড়াই। তুমি রাজা তোমার তালুকে, আমার তালুকে তুমি কেউ নও—এই মনোভাব ছিল প্রায় প্রতি বিত্তশালী জমিদারের। কলকাতার চূড়ামণি দত্তের সঙ্গে নবকৃষ্ণদেবের রেষারেষি ছিল উপভোগ করার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চূড়ামণি দত্তের একবার ভীষণ পীড়া হয়। বললেন, গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর। সজ্ঞানে গঙ্গায় অন্তত তিনরাত্রি বাসের পর নাভিদেশ পর্যন্ত গঙ্গাজল পান করে যে মৃত্যু—তাকেই গঙ্গাযাত্রা বলা হয়। এই মৃত্যুই সেকালে হিন্দুদের অত্যন্ত কাম্য ছিল। এ-সম্বন্ধে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেনঃ 'চূড়ামণি দত্তের পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবামাত্র তিনি বহুসংখ্যক ঢুলী আনাইয়া আপনি একখানি রৌপ্যের চতুর্দোলে বসিয়া গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। যাত্রাটি বিবাহ যাত্রার মত হইল, অসংখ্য লোহিত বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগরকীর্তন, চতুর্দোলাটি নূতন রকমে সাজান, নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসী মালার ঝালর, চারিদিকে তুলসী গাছ মধ্যে চূড়ামণি দত্ত আসন করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকের উপর শালগ্রাম শিলা, সর্বদা হরিনামে ছাপে চিত্রিত, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী এবং গলে ও হস্তে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা চূড়া যায় জমজিনিতে বাজাইতে লাগিল, কীর্তনীয়ারা গাইতে লাগিল—

আয়রে আয় নগরবাসী
দেখবি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া
জম জিনিতে যায়।
জম জিনিতে যায় রে চূড়া
জম জিনিতে যায়।
জপ তপ কর কিন্তু
মরিতে জানিলে হয়।

বিষয়টির উল্লেখ করা হোলো এই কারণে যে একজনের মায়ের শ্রাদ্ধের ধূমধাম আর একজনের মরতে যাবার প্রস্তুতি, এখানেও রেষারেষি। কলকাতার বাবুদের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হোলো। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মূলতঃ রাতের নগরী আর্থাৎ বাবুদের বিলাস-বহুলব্যয়ের অপচয়ের দিক এবং এরই পাশাপাশি অন্ধকারের মহিলাদের কথা। আজকের কলকাতার অন্ধকারের মেয়েদের অর্থাৎ বারবণিতাদের অপেক্ষা

পুরানো কলকাতার অন্ধকারের বিবিদের ধরন যেন কিছুটা স্বতন্ত্র। কোম্পানী-বাগানের রাক্ষতা আর সোনাগাছির পতিতা পুরানো কলকাতার বাবুদের অন্ধকারের আমোদের যেমন ব্যবস্থা, তারই পাশাপাশি ছিল বাঈজীনাচের আসর। এ'দের মধ্যে অনেকেই শুধু মাত্র নাচ-গানেই খুশী করত বাবুদের। বাবু বৃত্তান্তের আলোচনা আপাতত শেষ করে এখন আমরা আলোচনা করব পুরানো কলকাতার সেইসব বিবি বারাঙ্গনাদের যারা শহরের বুকে বহাল তবিয়তে আসর জমিয়ে বসেছিল।

আমাদের প্রথমা বিবি এক বারাঙ্গনা—রাধামণি। পিয়ারী নাগরেরা তাকে আদর করে ডাকত দামড়া গোপী বলে। রূপ তার স্বর্গের ছটায় উদ্ভাসিত, কেশদামে নবমেঘের আভাস ; ভ্রূ যেন কামধনু, রতিরূপ তনু। আবাসের কোন ঠিক নেই তার, কখনো তাকে দেখা যায় কলুটোলায়, খালাসি টোলায়, আহিরীটোলায়, গেঁড়াতলা, নেবুতলা, বটতলায় আবার কখনো হাড়কাটার গলি, পাঁচিধোপানীর গলি, হাঁস পুকুরের গলি। এমনকি জোড়াবাগান, চোরবাগান, হাতীবাগান, চড়কডাঙা, কবরডাঙা, পটল ডাঙা, জানবাজার, বড়বাজার, মেছোবাজার সর্বত্র ছিল আনাগোনা। এই বারাঙ্গনার বাবুটি ছিল, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত রায় মহাশয়।

আমাদের দ্বিতীয়া বিবি এক গৃহাঙ্গনা,—কমললতা। এই বিবির ইতিহাস হল, এ'র আদিনিবাস ওসকুরায়, বিবাহ হয় কৃষ্ণনগরের এক বঙ্গজকুলীনের সঙ্গে ; কিন্তু বিয়ের পর সে হোলো স্বামীপরিত্যাক্তা, এই সুযোগ নিল এক নাপতানী ফুলবালা। তার কাজ ছিল অবলা কুলবালা শিকার করে বাবুনাগরের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই ফুলবালাই কমললতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে রেখে এল অন্ধকারের পথে। গৃহিণী হ'ল গণিকা। ঘর ছাড়ল কমললতা, ফুলবালাও বকশিশ পেল পাঁচশো টাকা। কমললতার বাবুটি হ'ল বাগবাজারের ফুলবাবু যাঁর চারপাশে খোশামুদের ভীড়, রমণী মেলক গণ্ডক বাদক নর্তক-নর্তকী, ভণ্ড-প্রতারক আর ইয়ার উমেদার দালাল মহাজনের ভীড় ; যে দিবসে রজনীতে বেশ্যা বিহারে মগ্ন থাকে।

তৃতীয় বিবি রোশনী, রুক্মিণীবাই-এর কন্যাস্বরূপ। এই নববিবিকে ছলায় কলায় পরিণতা করেছেন রুক্মিনীবাঈ। ওস্তাদ দিয়ে তাকে সঙ্গীত, নাচ শেখান। কোন এক মহাঅষ্টমীর রাতে রুক্মিনী রোশ্‌নীকে সাজাতে বসল,—পছন্দমত চুল কেটে জুলপী বার করল, সাটিনের পায়জামা পরাল। বেশভূষায়, ছলাকলায় পরিপূর্ণ রোশ্‌নীকে ধীর পায়ে এগিয়ে দিল বাবু হিমাদ্রিশেখরের রূপ বাসরে। চণ্ডী মণ্ডপে দেবীদুর্গার সন্ধিপূজার ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেলে, জীবন্ত প্রতিমা যেন এই বিলাসের নির্বাক সাক্ষী হ'ল। একজোড়া হিংস্র লোভী চোখ রোশ্‌নীর

যৌবনভরা দেহে নির্মম আঁচড় বসিয়ে দিতে লাগল। নিঃশব্দে রচিত হয় লালসার এক মৌন ইতিহাস।

আলোচনার চতুর্থা বিবি হীরা বুলবুল। জমিদার নিশিকান্তের বারমহলের টুলবুলে তুলতুলে নায়িকা এই হীরা। রামী জাতে বৈদ্য, ঘরের অবলানারীকে বাইরে বের করবার কাজে সে পটু, এই রামীবালাই হীরাকে এ-লাইনে নিয়ে আসে। রামীর আদেশে সে সাজতে শিখল, বাবুকে তুষ্ট করার হাজার কৌশল শিখে হীরা বুলবুল বাবু নিশিকান্তের পেয়ারের পেয়ারানী হল। তারপর বসন্তরাজার পুজোর দিনে প্রাচীন বারাঙ্গনাদের সামনে রেখে অভিষেক হল তার। এল বিবিরয়াবাসী খাটওয়ালি, বামনী গোপী ছিবুড়ালি, দামড়াগোপী, বেতো কিশোরী, বৈষ্ণবী বকনাপ্যারী—তাদের সামনে হীরা বুলবুল পেল বাবুর আদরের রক্ষিতার সম্মান। সে হল নাগরের রঙ্গ নটীর-রঙদার-বিনোদিনী।

পঞ্চমা বিবি নর্তকী নিকি, বিনোদনের কলকাতার এক নামী বিনোদিনী, একদিন যে নাচের ছন্দে স্পন্দন তুলেছিল নগরীর হাজার প্রাণের। এই নিকির নিষিদ্ধ কাহিনী……

হর মসুররত এক বরবাদ শুদা সম মে হ্যায়
হর গম এক বরবাদ শুদা মুসররত
হর রোশনী এক তবাহ শুদা তারিকী হ্যায়
হর তারিকী এক তবাহ শুদা রোশনী
হর হাল এক ফণা শুদা মাজী হ্যায়,
হর মাজী এক ফণা শুদা হাল।

"যে কোন জীবন্ত বর্তমানের অন্তরালে লুকিয়ে আছে নিহত অতীত, প্রতিটি উজ্জ্বল আলোর নীচে সঞ্চিত শতাব্দীর অন্ধকার, দুঃখের বেদনাকণা সুখের আতিশয্যে সমুজ্জ্বল………… . . …অতীতের গর্ভ থেকে উঠে আসে বর্তমানের দামাল শিশু, শ্বাপদ আঁধার যেন উজ্জ্বল আলোর মলিন অপচ্ছায়া, সুখের শিশির জমে যায় বেদনার কালস্রোতে…………।"

১৮২৩ সালের মে মাস। রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানবাড়িতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে ওঠে ঝাড়লণ্ঠন। আকাশের বুকচিরে জ্বলে ওঠে আতসবাজী। এই উৎসব মুখর প্রাঙ্গণে সুরের ঝর্ণাধারায় বেজে ওঠে মহাযৌবনের সঙ্গীত, সঙ্গে ঝুমুরে পায়েলে শুরু হয় বাঈজীদের মনোলোভা নাচ। বাঈজীদের মধ্যে একজন নিকি, যাকে সবাই আদর করে ডাকে পূর্বদেশের 'ক্যাটালনী' বলে। এই নিকির আসর বসত কখনো কোন জমিদারের সাজানো বাগানবাড়িতে, কখনো কোন উঠতি বাবুর বারমহলে।

আমাদের ষষ্ঠী বিবি এমিলিয়া র‍্যাংহাম, সকলের আদরের এম্‌মা, ছোট্ট করে

এমা। এমা সোনালী চুলের এক শ্বেতাঙ্গী কিশোরী। তাকে নিয়ে শহর কলকাতা তখন মজেছিল রসেরঙ্গে। দু'শোর বেশী বছর আগে এমার কেচ্ছা-কাহিনী শহরের বাতাসের বুকে ভেসে বেড়াতো প্রজাপতির পাখায় পাখায়। আজ যেখানে বেলভিডিয়ার রাজপ্রাসাদ, যার অন্তরালে জাতীয় গ্রন্থগারের সাজানো বাড়ি, তারই পাশে একদিন একজন শ্বেত ললনাকে নিয়ে রচিত হয়েছিল রক্তাক্ত ইতিহাস। এমার কথা বলবার আগে প্রসঙ্গত তার কথাও একটু বলে নিই।

আঠারো শতকের বিদায় আসন্ন। কলকাতার বুকে ইংরেজ শাসনের শুরু, হেস্টিংস তখন এ-শহরে। একদিন খবর এলো, মিষ্টার গ্রাণ্ডের পরমা সুন্দরী স্ত্রীর ঘরে ধরা পড়ল ফিলিপ ফ্র্যান্সিস। ফ্র্যান্সিস সুপ্রীম কাউন্সিলের পরিচিত সদস্য। কিন্তু মিষ্টার বারওয়েল গ্রাণ্ডের লালচোখের আগুন থেকে বেঁচে গেলেন তিনি! কারণ, জানাগেল মিসেস গ্রাণ্ড শুধু বধূ নন, নগর বধূ। মিসেস গ্রাণ্ড ছিলেন চন্দন নগরের মেয়ে, জাতীতে ফরাসী, কলকাতার হাজার বিবির বাজারে তিনি আলোড়ন তুলেছিলেন। রূপের প্রাচুর্যে এমিলিয়া ছিলেন মিসেস গ্রাণ্ড অপেক্ষা অধিক। চুঁচুড়ার মেয়ে এমা যখন কলকাতা শহরের বুকে পা রাখে, তখন সে কিশোরী। ১৭৭০ সালের ২৯ জানুয়ারী শহর কলকাতার প্রথম পত্রিকা হিকি সাহেবের বেঙ্গল গেজেটের পাতায় ছাপা হোলো রসালো কেচ্ছার জমাট কাহিনী। হিকির হাতে এমিলিয়া র‍্যাংহাম নতুন নাম পেল—চিনসুরাবেল। এই মক্ষীরানীকে ঘিরে রচিত হল যে মৌচাক তার নায়করা হলেন লিভিয়াস, টেলার, ডেভিস, হেস্টিংস, ফ্র্যান্সিস ইমপে। এমনকি সেকালের বাবু কলকাতার শিরোমণি শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পর্যন্ত। কিন্তু ২৭শে মে ১৭৮২ তারিখে লাটসাহেবের অনুমতিক্রমে অনারেবল জন কোম্পানীর সিনিয়র মার্চেন্ট জন ব্রিসের সাথে এমিলিয়ার বিবাহ হয় ঊনিশ বছয় বয়সে। কিন্তু বিবাহিত জীবন তার ভাল লাগল না। তাই ১৭৮৯ সালের ১-মে এমিলিয়া দাঁড়ালো মঞ্চে। তাঁর ইচ্ছা ছিল কলকাতার শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েদের অবসর কাটানোর সুযোগ হবে মঞ্চ; এই কারণে স্বামীর সহযোগিতায় এমা খুললেন নাট্যমঞ্চ। বাহান্ন বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি নাট্যশালার সঙ্গে যুক্তছিলেন।

সপ্তমা বিবি রোজ হোয়াইট ওয়ার্থ অ্যালমার। ইনি কলকাতা শহরের বুকে যথেষ্ট প্রসার জমিয়ে ছিলেন।

পরবর্তী বিবি একজন শ্বেতাঙ্গিনী অভিনেত্রী—নাম এস্থার। বারো বছর বয়সে তার বিয়ে হল জর্নালিচের সঙ্গে বহরমপুরে। বিয়ের পর কিছু দিনের মধ্যে জর্নালিচকে কাজের জন্য রেঙ্গুণে যেতে হলে এস্থার চলে আসে কলকাতায়। শহরের উপকণ্ঠে দমদম এলাকায় এক নাট্যমঞ্চে যোগ দিল সে; তার প্রথম নাটক শেরী ডানের দি রাইভ্যালস। এস্থার এ-নাটকে লুসির চরিত্রে একনাগাড়ে তিরিশ

রজনী অভিনয় করবার পর দমদম থিয়েটারে এস্থারের সম্মানে এক বিশেষ রজনীর ব্যবস্থা হল। দু-হাজার টাকার টিকিট একনিমেষে বিক্রি হয়েছিল সেদিন। ষোলোর কোঠায় পা রাখার সাথে সাথে এস্থারের ডাক পড়ল শহরের সেরা রঙ্গালয় চৌরঙ্গী থিয়েটার থেকে। ১৮২৬ সালে ২৭ জুলাই এ-রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় করল এস্থার স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল নাটকে লেডি টিজলের ভূমিকায়। খ্যাতির চূড়ায় উঠে এস্থার নতুন নাম পেল সারা সিডামস। সারা ছিলেন ইংলণ্ডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। এস্থার যখন ষোড়শী তরুণী সারার বয়স তখন সত্তর। ১৮৩৮ সালে কলকাতার এই সেরা রঙ্গালয় চৌরঙ্গী পুড়ে গেলে এস্থার অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর নিয়ে কিছুদিন পরে এস্থার একটি মঞ্চ তৈরী করলেন। বর্তমানের এজরা বিল্ডিং-এর নিচের তলায় পুরানো ঘোড়ার গাড়ির স্যাঁতসেঁতে আস্তাবলে আবার জমে ওঠল এস্থার নাটক। এখানে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন তদানীন্তন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের বোন এমিলি ইডেন, এঁ'র নামেই ইডেন উদ্যান। অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি এস্থার এক স্থায়ী মঞ্চ তৈরীর প্রচেষ্টা চালিয়ে তৈরী করলেন নতুন নাট্যমঞ্চ। শহরের অভিজাত মানুষজনের সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি। বড়লাট অক্‌ল্যাণ্ড দিলেন হাজার টাকা, প্রিন্স দ্বারকানাথ হাজার, মতিলাল শীল পাঁচশো। ওল্ড বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের ধারে গড়ে ওঠা এই থিয়েটারের নাম হ'ল সাঁ-সুশী। সাঁ-সুশীকে নিয়ে রঙ্গিনী নগর মেতে উঠল রঙ্গে রসে; খাস বিলেত থেকে এলেন নামী অভিনেত্রীরা। ১৮৪১ সালের ৯-মার্চ সন্ধে সাড়ে সাতটায় সাঁ-সুশী নাট্য মঞ্চে প্রথম নাটক অভিনীত হ'ল দি ওয়াইফ। এস্থার সাজলো মারিয়ানের ভূমিকায়। ১৮ই নভেম্বর হ্যাণ্ডস্যাম হাজব্যাণ্ড নাটকে অভিনয় করবার সময় এস্থারের পোশাকে আগুন লেগে যায়। এ-মঞ্চে অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন মিসেস ডিকেল, মিস কাউলি, মিসেস ব্যারী প্রভৃতি।

নবম বিবি মেরিয়ানের বাবুটি হ'ল বাগবাজারের রায় বংশের অভিজাত নববাবু। এছাড়া আছেন ওয়ারেন হেস্টিংস যিনি একাধিকবার বেশ-কিছু কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর নায়ক হয়ে কলকাতার নায়িকা বিলাসের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

জন্মসূত্রে যিনি যবনী কন্যা, যার বিচিত্ররূপের ছটায় তদানীন্তন কলকাতা নগরীর অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত তিনি হলেন আনারকলি—বিবিদের আলোচনার দশমবিবি। এই বিবির অনেক বাবু। এঁ'দের মধ্যে একজন হলেন কালী প্রসাদ দত্ত। সেকালের কলকাতার বিবি বিলাসের বলগাহারা পাল্লা লড়াই ঘটে গেছে অনেকবার। অথচ আজ তা শুধুমাত্র ইতিহাস হয়ে ক্ষয়িষ্ণু কলকাতার বুকে কালের আঁচড়ে বেঁচে আছে।

আমাদের পুরানো কলকাতার একাদশ বিবি হলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক সুন্দরী বিবি-বুনু। এই কাশ্মীরী বিবির নূপুরের নিক্কণ পুরানো শহর কলকাতার দুর্গাপূজার উৎসব মুখরিত রাতকে লীলায়িত করে তুলত। সে যুগে দুর্গাপূজায় কলকাতা শহরের ইয়ার বাবুরা নেচে উঠতো নারী আর সুরার আস্বাদিত কামনায়। আর এই কারণেই খোঁজ পড়ত বিবিদের, লক্ষ-টাকার তোড়ার বিনিময়ে শহরের বুকে আমদানী হোতো বেগম-বিবি। এমনই আমদানীর তাড়নায় বুনু নর্তকী ধরা পড়েছিল কলকাতার জালে।

তদানীন্তন শহর কলকাতা দুই মাহারাজের লড়াই নিয়ে দারুণ মেতে থাকত; এঁরা হলেন চিৎপুর জোড়াসাঁকোর রামচন্দ্র রায় এবং রূপচাঁদ রায়। এই দুই রাজার অন্তরালে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা। তাঁদের আর্থিক সাহায্যের চাকচিক্যে, দুই রায়ের পূজোর লড়াই জমজমাট হয়ে উঠতো। অবশ্য প্রথমদিকে ঘটের বদলে কলকাতার বাবুরা ঘড়া ভরা টাকার পূজো করতেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম বাবু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু ধীরে ধীরে পূজো নিয়ে উৎকট উন্মাদনার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। ব্রিটিশ কর্মচারীরা খোলামন নিয়ে এগিয়ে এলেন নেটিভদের এই উৎসবে। এঁদের মধ্যে জন চিপস্-এর নাম করা যেতে পারে যিনি ছিলেন দেশের মানুষজনের কাছে চিফ বাহাদুর নামে পরিচিত। চিপসের ব্যবসার অফিস ছিল সোনামুখীতে। রায়পুরের বিখ্যাত লর্ড সিংহ পরিবারের বিখ্যাত শ্যামকিশোর সিংহ ছিলেন চিপসের দেওয়ান। এঁর আগ্রহে জন চিপস্ সুরুলের কুঠীতে পূজোর আয়োজন করেন। এই পূজোর খরচ হয় পঞ্চাশ টাকা বাঙালী বাবুর পূজো-বিলাসে এই প্রথম নীল চোখ, সোনালী চুলের সাহেবরা জড়িয়ে পড়লেন। ১৮১৯ সালের ক্যালকাটা জার্নাল-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মহারাজ রামচন্দ্র এবং বাবু বোষ্টমডস্ মল্লিকের বন্ধুরা পূজোর যে প্রস্তুতি নেয় তা একেবারে অভাবিত। দেশ বিদেশের কোকিল কণ্ঠী সুগায়িকাদের আনা হোতো।—

………এই আসরের প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই নিকি-নর্তকী, তার সঙ্গে থাকবে পূর্বদেশের সোনার পরী মনোহারিনী নূর বক্স।………নিকি-নূরের যুগল নাচে চিত্ত হবে উন্মত্ত। বাবু রামচন্দরের পূজো প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাজা রূপচাঁদ রায় চর পাঠালেন সুদূর কাশ্মীরে।

সে যুগের কাশ্মীর থেকে যে পাখীকে বন্দী করে আনা হোলো—
সে পাখি হলো বন্দিনী, নাম হলো তার বুনু।
এলো সে রূপচাঁদের হারানো হারামে।

অবশেষে নবমীর রাতে নিকির সাথে পাল্লা দিয়ে নাচলো বুনু নৃত্যের হাজার ভঙ্গিমায়, লাস্যের দেদীপ্য কামনায়, বাৎসল্যের স্নেহসিক্ত আতিশয্যে, প্রেমের মোহময় মাদকতায়।

পরদিন তার নাচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরোয় ক্যালকাটা জার্নালের পাতায়—রামচন্দ্রের বাড়ীতে যেমন নিকি নেমেছে, তেমনি রূপচাঁদ রায়ের বাড়িতে নেমেছে বুনু। নিকির নাচে আছে বিহ্বল কামনার বঙ্কিম প্রকাশ, বুনুর নাচে ঈপ্সিত বাসনার আর্তনাদ।

বুনু বেঁচে আছে ক্যালকাটা গেজেটের পাতায়; আর জোড়াসাঁকোর বাগান বাড়িতে, যেখানে একদা তার দেহের প্রতিটি নিশ্বাসের নির্যাস জীবনের থরথর উন্মাদনায় কেঁপে কেঁপে উঠতো।

আমাদের আলোচনার দ্বাদশ বিবি মাদাম চিয়াঙ্ যিনি জন্মসূত্রে ব্রহ্মদেশের মেয়ে। ১৮২৬ সালে গোপীমোহন দেব রেঙ্গুনের এই নর্তকী মাদাম চিয়াঙ্কে শহর কলকাতায় নিয়ে আসেন। নিকি, নুরবক্স আর বুনুর সাথে মাদাম চিয়াঙ্ শহর কলকাতায় আলোড়ন তুলেছিল। এই নর্তকী এ-শহরে বয়ে এনেছিল মাঙ্গোলীয় সভ্যতার একটুকরো পিয়াস পিঙ্গলস্মৃতি। আজও যে কালাচারকে আমরা সযত্নে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করি চাইনীজ বুফে আলো-আঁধারির চীনা বারে প্রবেশ করে। মাদাম চিয়াঙ্ ছিল সেই পীত সভ্যতার অনন্যা এক চলমান উদাহরণ।

এ-কলকাতা মূলতঃ বাঙালীর, কিন্তু ভারতের নানাদেশ থেকে স্রোতের মত আসছে মানুষজন। সকলেই ছুটে আসে কলকাতা সুন্দরীর আকর্ষণে। শুধু ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের মানুষজনই নয়, এরই পাশাপাশি ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ আমেরিকান আর বৃটিশরা জমজমাট রাজত্ব শুরু করে দিয়েছিল। শোভারাম বসাকের পুত্রবধুর নামে হয় বৌ-বাজার। শহরের যে কোন উৎসবে বাবুদের রঙ তামাসার অন্ত ছিল না। আর এ-কথা প্রকাশ করতে বাধা নেই যে মাদাম চিয়াঙ্ তার সঙ্গিনীদের নিয়ে জমিয়ে দিত পুজোর আসর।

ত্রয়োদশ বিবি লোলা মন্টেজ। লোলাকে বাংরেজী কালচারের মেয়ে বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ বলি তদানীন্তন শহর কলকাতার সাহেবদের মধ্যে অনেকে বাঙলী মেয়েদের সযত্নে সাজিয়ে রাখতেন তাঁদের ভোগ বিলাসের হারামে। তাই চার্চ থেকে ফতোয়া জারি হলো, সাধারণ নাবিক আর সৈন্যরা দেশী বিবি গ্রহণ করতে পারে। এই ফরমানের বলে সাহেব পাড়ায় বাঙালী মেয়ে বিয়ে করার ধুম পড়ে গেল। কিন্তু সবাই এমনভাবে বিয়ের বাঁধনে কালোমেয়েদের বাঁধতে চাইতেন না। ক্যালকাটা গেজেটে ১৮০৩ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি লক্ষ্য করুন।

তালতলা বাজারের কাছে একমস্ত বড় বাগানবাড়ি বিক্রি হচ্ছে। বাড়িটি যিনি কিনবেন তাঁর কাছে এটি হবে ডিজায়ারেবল পারচেজ। কেননা একই দামে পাওয়া যাবে এক রূপবতী হিন্দুস্থানী ফিমেল ফ্রেণ্ড।

এ-ধরনের বান্ধবী নিয়ে ঘর করা কলকাতায় তখন এক চলিত রেওয়াজ। তাই অনেক সাহেব সহধর্মিণী হিন্দু মেয়েকে ও তার সন্তানদের রেখে শহর ছাড়তে পারতো না। এদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে সহজ সরল মনের দেশওয়ালী ভায়েরা গেয়ে ওঠে,—

গাড়ি ঘোড়া লোনা পানি,
আউর রণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়।
এস্‌মে যো বেঁচে মোসাফির,
মৌজ করে কলকাতা হ্যাঁয় ॥

এভাবেই বাবু-বিবি সভ্যতা তখন ইংরেজেদের ধাক্কায় ভেসে চলছিল, আর বাঙলী মেয়েদের নিয়ে টানাটানির অভিযান জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে ঈশ্বর গুপ্তের ছড়ায়—

কপালে যা লেখা আছে,
তার ফল তো হবেই হবে।
(এরা) ....
....
(এরা) পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে,
সেজেগুজে সভায় যাবে।
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বলে,
বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্ডি খাবে।
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে
সবাই দেখতে পাবেই পাবে
(এরা) আপন হতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

লোলার কথায় ফিরে আসা যাক্। লোলা মনৃটেজকে নির্দ্ধিধায় সে সময়ের বিবি কলকাতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বিদেশিনী হয়েও লোলা যেন ভারতীয় ; তার দেহের অন্তরে এল্‌মের হাওয়া, মনের শিখরে তাল তমালের প্রলয় নাচন, কণ্ঠে ভাটিয়ালীর সুর। লোলাকে তাই বিচিত্র বাংরেজী সভ্যতার প্রথম বিবি বলা যেতে পারে।

আলোচনার অনেকটাই করা হয়েছে। এবার শহর কলকাতার বিদেশিনী বিবিদের মধ্যে মাদাম গ্রাণ্ডের কেচ্ছাকাহিনীর কিছু কথা বলা যাক্। পূর্ববর্তী আলোচনায় যদিও এর কথা উঠেছিল, তবুও বর্তমানে কিছু বলা যাক্। মাদামের রূপসাগরে হাবুডুবু খেয়েছে এমন রাজপুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পুরানো কলকাতার সে ছিল সুন্দরীতম। মাদাম গ্রাণ্ডের প্রথম বাবুটি ছিলেন কলকাতার

বাসিন্দা, অনারেবল কোম্পানীর কর্মচারী ফ্রান্সিস গ্র্যাণ্ড। এ-সময়ে সে ছিল চন্দননগরের এক কিশোরী, নাম তখন ছিল তার নোয়েল ক্যাথারিন। প্রথম দর্শনেই প্রণয়, অবশেষে ১৭৭৭ সালের ১০-ই জুলাই ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু ৮ই ডিসেম্বর ফিলিপ ফ্রান্সিস রাতে বেআইনী নৈশ অভিসারে মাদামের শোবার ঘরে ধরা পড়ল। এরপরেও ক্যাথারিন কিন্তু স্বামীর চোখে বিশ্বাসঘাতিনী সাজেনি। তবে সন্দেহ দানা বাধতে থাকে। তাই আদালতে মামলাদায়ের করেন মিষ্টার গ্র্যাণ্ড। ফলে পঞ্চাশহাজার সিক্কা জরিমানা হোলো। কিন্তু নিজের অগোচরে ক্যাথারিনের মন কখন যে চুরি হয়ে গেল বয়সের বাঁধন পার হয়ে মিষ্টার গ্র্যাণ্ড তা জানতেও পারেননি। বাতাসে গুজব ওড়ে শিমূল তুলোর মতো, ক্যাথারিন নিজেই নাকি ফিলিপকে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ধীরে ধীরে ক্যাথারিন, ফিলিপ, উইলিয়াম মেকিণ্টস, টমাস লিউ, ম'সিয়ে তালোয়াঁ—একজন ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে ভেসে চলে।

আমাদের পরবর্তী বিদেশিনী বেগম জনসনের কথা না বললে বাবু কলকাতার বিবি কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মিসেস জনসন ছিলো বেগম জনসন। জনসনের স্ত্রী কি করে বেগম হ'ল তার উত্তর দেবার আগে না হয় ঘুরে আসা যাক্ সাহেবী কলকাতার সেই প্রথমযুগে। তখন তাজা টগবগে তরুণ সাহেবরা সবেমাত্র কলকাতার কুঠীতে আসতে শুরু করছেন। তাই ইউরোপীয় মনের ছোঁয়া লাগলো কলকাতায়। এখানেই থেকে গেল অনেকে। মসলিনের কামিজ, ঢিলে পাজামা আর সাদা টুপি মাথায় আদি কলকাতার বাবু সাহেবরা নেটিভদের সঙ্গে মিলেমিশে মগ্ন থাকতেন কালো রাধার সন্ধানে।

এরপর এল শ্বেত নারীরা। তাদেরই একজন এই বেগম জনসন। ক্লাইভ ওয়াটসের কলকাতায় সে ছিল অদ্বিতীয়া নায়িকা। তার ঘরে প্রতি উন্মন সন্ধ্যায় আসর জমাতো ইরানী-ফরাসী আর ইংরেজ বণিকরা। বেগম কিন্তু এক পুরুষে অভিষিক্তা ছিল না। নিত্যনতুন অলঙ্কারের মতো প্রেমিক ছিল তার শরীরের অলঙ্কার। আগের কথায় আসি, প্রথম চার বছরের বিবাহিত জীবনে দু'দুবার স্বামীকে হারিয়েছিল সে। তারপর তার তিন নম্বর বিয়ে হল ক্লাইভের সহযোগী ওয়াটসের সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন বাদেই মারা গেলেন ওয়াটস। তখন বেগম সাহেবা খ্রীষ্টান ধর্মযাজক রেভারেণ্ড উইলিয়ম জনসনের মনোহরণ করলো। হঠাৎ তিনি বিপুল ধনসম্পত্তি নিয়ে পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে। আর বেগম পড়ে রইল কলকাতায়। এমনই এক বিচিত্র জীবনে নায়িকা বেগম জনসন শহর কলকাতার রাতের পসারিনী হয়ে শহরের ক্যানভাসে স্মৃতির ফ্রেমে টাঙানো ছবির মতো হয়ে রইল।

আর একজন বিদেশিনী হেনরী টমসনের স্ত্রী সারা, যে বারওয়েলের ফাঁদে প্রথম

ধরা পড়ে। হেনরী ছিলেন কোম্পানীর নৌবহরের এক তরুণ অফিসার। আজকের রাইটার্স বিল্ডিং-এর মালিক ছিলেন বারওয়েল। হেনরীকে তিনি তুলে আনলেন আলিপুরের বাগানবাড়িতে। বারওয়েলের সাহায্যে হেনরী সাত হাজার টাকার চাকরী পেয়ে দূরে চলে গেল বিশ্বস্ত বন্ধু বারওয়েলের হাতে সারাকে দেখাশুনার ভার দিয়ে। ইতিমধ্যে বারওয়েলের সঙ্গে সারার প্রণয়ের গাঢ়তা ঘটল। হেনরী যখন এ-ব্যাপারে জানতে পারল, তখন সারা বারওয়েলের সোনার শিকলি পরে ফেলেছে অর্থাৎ তার আর ফেরার পথ নেই।

পুরানো শহর বিবি কলকাতায় নানান জাতের মেয়েরা রঙ্গে রসে কৌতুকে কল্পনায় ছন্দ ছড়িয়ে ছিল! তাদের মধ্যে একজন, মিস স্যানডারসন। সে ছিল প্রথম স্বয়ংবরা। ফেলে আসা যুগের স্বয়ংবর সভার মতো স্যানডারসনের মনোরঞ্জনে সেই আসরে হাজির হয়েছিলেন শহরের সব সেরা রাজপুরুষেরা। তার এই ঘোষনায় কলকাতার রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছেল। গর্ভনর হাউসে সাজানো নাচের ঘরে লক্ষ টাকার ঝাড়বাতির নিচে বসবে স্বয়ংবরের আসর। নায়িকার আহ্বানে একে একে জমা হলেন ষোলোজন সেরা সুন্দর পুরুষ। শুরু হল যুগল নৃত্য। সকলের সঙ্গেই নাচলো নায়িকা। তারপর মালা দিল তার মনের মানুষ বারওয়েলের গলায়। তবে এ-দাম্পত্য জীবনের আয়ু ছিল মাত্র দু-বছর। কলকাতার শীতে অকালেই ঝরে পড়ে সে—আর তারই স্মৃতিতে পার্কষ্ট্রীটের সমাধিতে বাদশা বারওয়েল তৈরী করেন এক অপূর্ব পিরামিড।

কলকাতার আর এক বিদেশিনী মিস ক্রুটেনভেন। সে ছিল আগুন লাগা শহরের বহুবল্লভা। পর পর পাঁচজনকে সে করে শয্যাসঙ্গী। এঁদের মধ্যে রোমান্সের চূড়ান্ত আতিশয্যে যিনি খ্যাত হলেন তার পঞ্চমস্বামী ববপট।

এইসব দেশী-বিদেশী নায়িকারা পুরানো শহর কলকাতার রাতকে আলোর ঝলমলানিতে ভরিয়ে তুলত। রাইটার্সের আলো-বাতাস হীন ধূলি-ধূসর ঘরে আজ যেখানে চলে কর্মব্যস্ত মানুষের আনাগোনা, একদিন তা ছিল শ্বেত বণিতার বিলাসকক্ষ। সার্কাস এ্যাভেনিউর জীর্ণ মঞ্জিলের দিকে তাকালে কি বোঝা যাবে একদিন এখানে মানুষের দুঃখে সুখে অভিমানে অনুরাগে লেখা হয়েছিল ব্যাভি-চারের ইতিহাস? পার্কষ্ট্রীটের কোনায় কোনায় শোনা যায় সুন্দরী নায়িকাদের দীর্ঘশ্বাসের ঝংকার।

পুরানো কলকাতার বাবুদের বিবি বৃত্তান্ত আপাতত শেষ। তাই আলোচনার ইতি টানবার জন্য আজকের কলকাতার কথা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আজ এসেছে কলের গান। তাই পূজার আসরে আর বাঈজী নাচ-গানের আসরের রেওয়াজ আজ আর নেই। রঙ্গিন পর্দায় ছবিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ দেখেই ভরে ওঠে আজকের যুবক-যুবতীদের মন। কিন্তু এরই পাশা-পাশি

আসে রাতের কলকাতা। দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতায় আজও চলে অন্ধকারের অভিসার। তবে এর রূপের প্রকারভেদ আছে। আজও সোনাগাছিতে চলে অন্ধকারের রাসলীলা। এছাড়া শহরের অলিতে গলিতে আছে বেশ কিছু পতিতালয় যেখানে ভীড় জমায় নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের দল, আর শহরের অতিথিরা।

কলকাতা শহরের বুকে রাস্তায় রাস্তায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ কিছু দেহপসারিনী, এদের অনেকেরই আবাসস্থল শহরতলী কিম্বা গ্রাম। এরা কেউবা আসে পেটের দায়ে, কেউবা জীবিকার সন্ধানে। এসে পথভ্রষ্ট হয় নানান অসৎ পুরুষের পাল্লায় পড়ে। এদের মধ্যে একটা অংশের বাস শহরের বিভিন্ন বস্তিতে। বস্তির দুর্গন্ধ পরিবেশ, অর্থের অনটন এদেরকে নিয়ে আসে এ-অন্ধকারের পথে। সমাজের থেকে কিন্তু আজও এরা পরিত্যক্তা। শুধু বাঙালী নয়, অবাঙালী পরিবারের মেয়েরাও এ-পথে চলে আসতে বাধ্য হয়।

রাতের কলকাতার বিবিরা আজ আর নেই, আছে কলগার্ল যাদের নিয়ে রাত কাটালেই দিতে হয় কিছু পারিশ্রমিক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়েই এরা নিজেদের সর্বস্বান্ত করে দিয়ে অকালে ঝরে যায়। এরই পাশাপাশি আছে বেশ কিছু হোটেল, বার-কাম-রেস্তোরা যেখানে রাতের আলোয় চলে নর্তকীদের বলড্যান্স, ক্যাবারে আরো কত-কি। এগুলির অবস্থান বেশীরভাগই মধ্য কলকাতায়—পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী পাড়ায়। এছাড়াও ছড়িয়ে ছিটেয়ে আছে বেশ কিছু চাইনীজ রেস্তোরা যেখানে চলে রাতের অভিসার।

এভাবেই শহর কলকাতা দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায় অন্ধকারের খেলায়—চলে মদের ফোয়ারা, কলগার্লের হাতছানি, বারবণিতার অপেক্ষা, বারে হোটেলে সিঙ্গারের কলতান। যেন শহরের নারীরা দেহের বেসাতী নিয়ে বসে থাকে শহরের বুকে নাগর ধরবার আসায়। শহর কলকাতা কিন্তু এ অন্ধকারের মধ্যেও কল্লোলিনী। কারণ, অন্ধকারের বিপরীত দিকে আছে আলো; তাই নগরীর উচ্ছলতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ্যতা এর নারীদের করে তুলেছে মহিমান্বিত। তাই তো আঁধারের আলোচনার এখানেই পরিসমাপ্তি টেনে আমরা এগিয়ে চলব আলোর দিকে।

কলকাতার মেমসাহেব কাহিনী

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী আমল অস্তমিত হলে এক নব-অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেটি হোলো, কলকাতার বিয়ের বাজারে প্রতিবৎসর জাহাজ ভর্তি হয়ে মধ্যম-রকমের সুন্দরীদের আগমন ঘটতে লাগল। সাহেবরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল এই পণ্যের জন্য। কিন্তু এ-বিয়ে সুখকর হোতো না। ১৭৫০ সালের আগে যে সমস্ত ইংরেজ মেমসাহেব কলকাতায় আসত তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে কারো কারো নাম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তাঁদের জীবনের কোনো সামান্য ঘটনা থেকেই তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা করে নিতে হয়।

১৭৫০ সালের পর থেকে এঁদের জীবনযাত্রা সকলের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কলকাতায় তখন মেম সাহেবের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কেবলমাত্র দুঃসাহসী ও যাঁদের কোন উপায় ছিল না তাঁরাই আসতো। কোম্পানীর আমলে প্রায় দেড়শ বছর ধরে সাহেবদের পর্তুগীজ রমণীর অথবা দেশীয় মহিলাদের বিয়ে করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বোম্বাই অঞ্চলে বসবাসকারী সাহেবরা কখনও সুযোগ সুবিধামত দেশ থেকে মেমসাহেব আমদানী করেও বিয়ে করত। কলকাতায় যে সমস্ত সাহেবরা ছিল তারা যদি একান্তই বিয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করত তখন হয় কোনো ইংরেজ বিধবাকে বিয়ে করত নতুবা কলকাতার জাহাজ ঘাটায় খোঁজ করত, কবে বিলেত থেকে জাহাজ আসবে। কোম্পানীর আমলে যে সমস্ত কেরাণী কলকাতায় আসত তাদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল অবিবাহিত। তাদের কর্মজীবন শুরু করতে হত খুব সামান্য বেতনে। তাদের বসবাসের জন্য ফ্রি কেয়ার্টার এবং পানীয় হিসাবে অল্পমূল্যে মদ সরবরাহ করা হোতো।

প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব তাদের ছিল না, অভাব ছিল শুধু জীবনসঙ্গিনীর। তাছাড়া এই সময় রাইটারদের শিক্ষা-দীক্ষা বা সামাজিক প্রতিপত্তি এমন কিছু ছিল না যাতে সাত-সাগরের পার থেকে এদের আকর্ষণে ইংরেজ রমণীরা কলকাতায় এসে হাজির হবে। এদের কর্মজীবনেও এমন কিছু স্বাধীনতা ছিল না যে ইচ্ছে করলেই দেশে চলে যাবে বা বিয়ে করে জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে সুখের সংসার রচনা করবে। যদি কেউ বিয়ে করবার জন্য বা সাংসারিক অন্য কোন কারণে যেতে চাইত তাহলে তাকে পেনসনের মায়া ত্যাগ করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হোতো। চাকুরীর নিশ্চয়তা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকা সত্ত্বেও অনেক ইংরেজ রমণী হয়ত কোন একটি বিশেষ মানুষের আকর্ষণে এ-দেশে আসার জন্য

উৎসুক হয়ে উঠত, কিন্তু যখন বহু দূরের এই পথের দুর্গমতা, কষ্ট এবং সমুদ্রে জল-দস্যুর হিংস্রতার কাহিনী শুনত, এদেশের রোগমহামারীর কথা মনে পড়ত তখন আর কেউ অগ্রসর হোতো না।

যখন ইংরেজ রমণীরা গার্ডেনরীচের জাহাজঘাটায় নামত তখন পরিচিত অপরিচিত সকলেই হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানাত। সকলের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হলে তারা পাল্কীতে উঠতে পেত। যে-রাস্তায় পাল্কী যেত, তার দু' ধারে রাইটাররা দাঁড়িয়ে কেউ বা হাত নাড়ত, কেউ বা রুমাল ওড়াত। পূর্বনির্দিষ্ট আস্তানায় পৌঁছোবার পর শুরু হত একদফা সকলের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হবার পালা। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত আগন্তুকরা আসত। এভাবে কিছুদিন গেলে হয়ত কোন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসত। অনেক প্রস্তাব নাকচ করে মেমসাহেব একটি প্রস্তাবে রাজী হত। বিয়ে হয়ে যেত। দেশে আত্মীয়-স্বজনদের জানাত।

"·········the blackmen were very amiable, and Calcutta a perfect paradise!"

তখন তাদের আর কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা মনে হোতো না। এরপর শুরু হতো সামাজিক জীবনহীন নিঃসঙ্গ জীবন। এই নিসঙ্গতাকে ভুলবার জন্য মেমসাহেবরা দেশে চিঠি লিখত। হাজার হাজার শব্দে চিঠির পাতা ভরিয়ে তুলত। এই সময় কলকাতার ইংরেজ মেমসাহেবদের ব্যবহৃত চিঠির কাগজের চাহিদা সমষ্টিগতভাবে লণ্ডন, এডিনবরা, ডাবলিন এবং প্যারী প্রভৃতি নগরীতে চিঠির কাগজের চাহিদাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়—সাহেব অফিসে, মেমসাহেব সারা দুপুর নিঃসঙ্গ, সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত। তাই নিঃসঙ্গতা ও একঘেয়ে জীবনকে ভুলে থাকবার জন্য তারা চিঠির পাতায় শব্দের মালা গাঁথত। সেই চিঠি অতি যত্নের সঙ্গে তারা লিখত, খামে ভরে সিল করে পাঠিয়ে দিয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকত উত্তরের জন্য।

প্রতীক্ষা আর নিঃসঙ্গতা এদের সুস্থ জীবনকেও অসুস্থ করে তুলত। এখানে এসে মেমসাহেবরা যে রোগটিতে ভুগতেন তার নাম 'এ্যাংলো ম্যানিয়া'। এ-রোগের উপসর্গগুলি হচ্ছে—'It is an utter antipathy and disgust to every matter or thing uncommon with England and consequently a thorough contempt for the manners and customs... ... ... It is somewhat appeased in the cold weather, but the hot winds and rains increase it considerably. It gives an elevation to the muscles of the nose—contracts those of the mouth downwords, and creates a shouldering at a white jacket or Hooka.'

বেশীদিন এ-রোগ স্থায়ী হতো না। একদিন সাহেব সংসার গুছিয়ে বসত এই কলকাতায়। সে তার তৎকালীন দেশাচারকে ভুলতে পারেনি। তাই সে এক ভয়ঙ্কর সামাজিক রীতির আমদানী করে এই কলকাতার বুকে, নাম ডুয়েলিং।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয় তার মূলে ছিল অতি তুচ্ছ কারণ, রাজনৈতিক কারণে মতানৈক্য, সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতবিভেদ বা যে কোন তুচ্ছ কারণেই তৎকালীন কলকাতায় ডুয়েলিং সংগঠিত হত। কলকাতায় আগত ইংরেজরাই তাদের মাতৃভূমি থেকে এই ভয়ঙ্কর সামাজিক রীতিটির আমদানি করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজদের সামাজিক জীবনের শেষ অঙ্গ ছিল এই ডুয়েলিং। কোম্পানীর আমলে ডুয়েলিং ছিল চিত্ত বিনোদনের একটি বিষয়বস্তু। যাঁরা নৈতিক জীবন যাপন করতেন তাঁরাই ছিলেন ব্যতিক্রম ও সংখ্যালঘুদের দলে। কারো কারো মতে রীতিনীতি বিবর্জিতা কয়েকজন রমনী ছিলেন সেই সমাজের মধ্যমণি। তাঁদের ঘিরে চলত সমাজের হাসি-কান্নার পালা। তাঁদের মুখের একটি মিষ্টি কথা বা হাসি যে কোন ইংরেজ যুবককে যে কোন নিন্দিত কাজে উৎসাহিত করতে পারত। এইসব যুবকদের সুস্থ সামাজিক জীবন ছিল না।

১৭৯৩ সালের ২১শে মে-র 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল'-এর, সংবাদ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, কোন একটি ক্ষেত্রে পিস্তলের পরিবর্তে ছোট তরবারিও ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ পিস্তলের ব্যবহার ডুয়েলিং-এ ছিল। গড়ের মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে নির্জনস্থানে গাছের সারির আড়ালে সংঘটিত হত এই ডুয়েলিং, তাই গাছগুলিকে বলা হত 'দি ট্রিস অব ডেসর্টান'। প্রাতঃকালই ছিল ডুয়েলিং-এর প্রশস্ত সময়। এই শহরের বুকে যে দু'টি ঐতিহাসিক দ্বৈরথ-সময় অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্পর্কে হরিহর শেঠ মহাশয় মন্তব্য করেছেন ঃ—

'হেষ্টিংসের পরস্ত্রীর সহিত স্বামী-স্ত্রীরূপে অবৈধবাস, ফ্রান্সিসের পরস্ত্রী মাডাম-গ্রাণ্ডকে পাপে লিপ্ত করা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তখন সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যগণ পরস্পরকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস ফিলিপের এবং ক্লেভারিং ও বারওয়েলের দ্বৈরথ যুদ্ধ তাহার অন্যতম প্রমাণ।'

আরোকিছু ডুয়েলিং-এর কাহিনী 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সময়ে। ডুয়েলিং-এর ফল যাই হোক না কেন ডঃ জন্সন্ কিন্তু দ্বৈরথ সমরের সমর্থক ছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ—

'Its barbarous vilence was more jusifiable than war, in which thousands went forth, without any cause oi personal quarrel to massacre each other.'

১৮০৮ সালে ৮-ই অক্টোবর লেঃ হেনরী ফিলিপস ও তাঁর প্রতিপক্ষ লেঃ শেপহার্ড উপস্থিত হন সেই 'ট্রি অব ডেসট্রাকসনের' তলায়। ঝগড়ার মূলে ছিল এক সুন্দরী নারী। দ্বন্দ্বযুদ্ধে লেঃ শেপহার্ডের গুলিতে লেঃ ফিলিপস নিহত হন। মেজর রিচার্ড হেনরীর সুন্দরী কন্যাকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয় এই দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব।

এই দ্বৈরথ-সমর তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, আলেকজাণ্ডার ডফ্-এর মত উদারচেতা মিশনারীও একে অগ্রাহ্য করিতে পারেনি। যিনি আলেকজাণ্ডার ডফ্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন তিনি হলেন পৃথিবী বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড় তৎকালীন কলকাতার খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার মিঃ লোঙ্গারভিল্ ক্লার্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে কয়টি ডুয়েলিং অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে মিঃ হিউম্ বনাম লেঃ রেইনীর দ্বৈরথ-সমর কাহিনী সমসাময়িক 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত হয়। ডুয়েলিং-এ বাঙালী বাবুদেরও দেখা যেত।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'জবাব ক্লাব'। অর্থাৎ ইংরেজ রমণীর প্রণয় প্রার্থী বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসা যুবকরা তৈরী করেন এই সংস্থা। যাঁরা বহুবার বহুরমণীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছেন তাঁরাই এ-ক্লাবের সভাপতি বা উপ-সভাপতি হবার যোগ্য হতেন। পুরানো কলকাতার মেমসাহেবদের মফঃস্বলের জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতেও দেখা গেছে। সারা সপ্তাহের খাটুনির পর সাহেব ও মেমসাহেব এবং অন্যান্য সভ্যেরা সন্ধ্যেবেলা একত্রিত হত ক্লাবে—অনেকরাত্র পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ, আলোচনা শেষ করে তারা মদ্যপানে চুর হয়ে বাড়ি ফিরত।

পূজাপার্বনে নারী

"ছাতা ছারাবেন বা-বু' এ ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। অলিতে গলিতে কাঁধে বিরাট গাঁটরী নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে ফেরিওয়ালার দল—'সাবান, তরল আলতা চাই, মাথার কিলিপ কাঁটা চাই, চুল বন্ধনের ফিতা চা-ই—"

আকাশ এখন প্রায় মেঘ শূন্য, ভোরের সূর্যোদয় এখন বেশ মিঠে মিঠেই ঠেকছে। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে চোখ দিলে দেখা যায় দূরের নীল আকাশ। কলকাতা শহরে ত' আর কাশফুল ফোটে না, বিলও নেই যে পদ্ম বা শালুক ফুটে জানান দেবে 'তিনি' আসছেন বা এসেই গেছেন। অবশ্য বাগবাজারের খালের ধারে কিংবা উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের সীমানার বাইরে যেখানে যাযাবর ইরানীরা তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে তার আশেপাশে কিংবা ঢাকুরিয়ার জলাভূমি ; বর্তমানে যার নাম বালিগঞ্জ লেক, তার চারধারে অথবা এখন যেখানে লবণ-হ্রদ শহর যার আধুনিক নামকরণ হয়েছে 'সল্টলেক সিটি' সেখানে একবার পথ ভুলে ঘুরে এলে ওই যে বললাম—'কাশফুল' তার কিছু কিছু সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। না। তাতেও ঠিক বোঝা গেল না ব্যাপারটা কি হতে চলেছে। বড়বাজার আর কলেজস্ট্রীটের দু'ফুটপাত ধরে একটু ঘোরাফেরা করলে দোকানে দোকানে নতুন নতুন জামা কাপড়ের আমদানীতে আর সেই সঙ্গে চিৎপুরের নতুন বাজার অঞ্চলের দশকর্ম ভাণ্ডারে নতুন নতুন শোলার তৈরী চাঁদমালা টাঙান দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে—তবে বুঝি পূজোর আর বেশী বাকী নেই।

কিন্তু এতেও সংশয় কাটেনা, সবেত বিশ্বকর্মা পূজোর ঘুড়ি ওড়ানো পর্ব শেষ হল—এরই মধ্যে এসে পড়বে বাঙালীর সব থেকে বড় পরব—যার দিকে সকলেই তাকিয়ে রয়েছে।

একদিন ভোর হতে না হতেই দোর গোড়ায় শোনা গেল পাড়ার জগা বোষ্টমের গলা। হাতে খঞ্জনি নিয়ে গেয়ে চলেছে, সঙ্গে খোল (মৃদঙ্গ) বাজাচ্ছে নিতাই কামার।

'যাও যাও গিরি আনতে গৌরী উমা আমার কত কেঁদেছে—' হাতের কাজ ফেলে রেখে সবাই কান খাড়া করে থাকে ঐ বুঝি শুরু হল 'আগমনী'।

বৌ-ঝিরা ভাবে,—কখন তাদের বাড়িতে আসবে বোষ্টম ঠাকুর। সদ্য বিবাহিতা বধূটির মনের ভিতর পাড় দিয়ে ওঠে,—তাহলে পূজোর আর খুব একটা বাকী নেই—বাপের বাড়ি যাবার চিঠি এসে পড়ল বলে, কারও কারও পতি দেবতা কার্যোপলক্ষে থাকেন বিদেশে, তিনিও চিন্তা শুরু করেন—পূজোর ছুটির তা'হলে আর কত বাকী ?

জগা কিন্তু এতক্ষণে তার দোহারকে নিয়ে এক বাড়ি থেকে তার ঝুলিতে চাল, পয়সা, আনাজ-পাতি তুলে নিয়ে আরেক বাড়ীতে গিয়ে গেতে শুরু করে দিয়েছে ঃ—

"গিরিরানী কহেন বাণী কালি হেরিনু স্বপনে,
সম্বৎসর হল উমা আমার গেলো নাই কি তা
স্মরণে।
যাও যাও যদি গিরি আনতে গৌরী কন্যা বিনা শূন্য-এ
পুরী,
বিরহ যাতনা সইতে না পারি ভুলিব তা
কেমনে ॥
ভাঙ্গর ভোলা শ্মশানে মশানে থাকে ভূত প্রেত
সনে,
মায়ের প্রাণ কি প্রবোধ মানে তিলেক কন্যা
বিহনে ॥"

জগা চলে যায় আরেক গলিতে। এ পাড়া ছেড়ে আরেক পাড়ায়। মুহূর্তের জন্য যেন ঝিম ধরে থাকে আকাশ বাতাস। উমার জন্য বুঝি ক্ষণেকের তরে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে গিন্নিবান্নীদের চোখ। আহা তাদের মেয়েরাওত' এইরকম শ্বশুর বাড়ীতে পড়ে রয়েছে, কে জানে কবে ফিরে আসবে তাদের অন্তরের নিধি তাদেরই কোলে।

এইবার সত্যি সত্যিই তিনি এসে পড়লেন বলে। যে-সব বাড়িতে কুমোর এসে প্রতিমা গড়ে, সেখানে শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। এই ঠেলায় বোঝাই হয়ে বিচালি আসছে, মুটেরা গঙ্গার ঘাট থেকে প্রতিমা গড়ার মাটি বেচিয়েদের কাছ থেকে নিয়ে আসছে মাটি, তাদের বাঁকে করে। উৎসাহ ছোকরাদের বেশী হলেও বুড়োরাও এ-ব্যাপারে কিছু কমতি যায় না। অবশ্য কচিকাচাদের মত ছুটোছুটি করতে না পারলেও এসে জড় হয় কুমোরদের কাছাকাছি।

কুমোররা দলে কয়েকজন মিলে থাকে। তার ভিতর একজন মূল কারিগর, বাদবাকী সকলে তার সহকারী বা মজুর। কেউ কাঠামো ঠিক করছে, কেউ বা পাট পাকিয়ে সুতলী তৈরী করছে, কেউ কেউ মূল কুমোরের নির্দেশ মত পরিমাপ করে বাঁশ কাটছে, খড় গোছগাছ করছে কেউবা। সকলেরই আজ স্ফূর্তির নদীতে বান ডাকা শুরু হয়ে গেছে। উৎসাহের আধিক্যে দেবীমূর্তির একমেটের সময়েই একজন বলে উঠল—

'আহা মা যেন হাসছেন'—।

বলাবাহুল্য তখনও দেবীর মুখাবয়ব তৈরী হয়নি।

উত্তর কোলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ি, বাগবাজারের নন্দঘোসের (পশুপতি বসু) বাড়ি, হাট খোলার দত্ত বা চোর বাগানের মিত্তিরদের মত ঝামাপুকুর, সিংহীবাগানের সিংহ বাড়ি, জোড়াসাঁকোর ঘোষেদের বাড়ি, পাথুরেঘাটার রাজবাড়ি কিংবা দক্ষিণ কলকাতার শাঁখারী পাড়ার; মধ্যকলকাতার বেনেটোলা, পটল ডাঙার বসু মল্লিকেদের বাড়িতে ত' রীতিমত এলাহী কাণ্ড। এই থেকেই শুরু। শেষ হবে সেই বিজয়া দশমীতে মাকে গঙ্গায় দেবার পর।

কোলকাতার দুর্গোৎসবের আদিপর্ব নাকি শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি থেকেই শুরু। আলোচনার একটু গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করা যাক্।

পুরাণে আছে, রামচন্দ্র শরৎকালে অকালবোধন করে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তিনি বাঙালী ছিলেন না, আর অকাল বোধন তিনি করেছিলেন ভারতের বাইরে অদূর লঙ্কাদেশে। পুরাণে বর্ণিত এই অকালের দুর্গাপূজা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশে এত প্রচার লাভ করল কেন তার কোন ঐতিহাসিক কারণ জানা যায় না।

নাম না জানা এক ইংরেজ কবি কলকাতার পূজোর রঙিন বিবরণ দিয়েছেন—

The Church, the mart, the Court of law,
The — , everywhere is deserted ;
The very Crows have Ceased to Caw.
And Echo's broken - hearted ;
The Palaced town in silence stands
For none are left in it do jaw ;
All Creeds or as we say, all hands
Being off for the DOORGA PUJA.

অর্থাৎ গীর্জায় লোক নেই, আদালত শূন্য, দোকানের ঝাঁপ কখন পড়ে গেছে, বাজার স্তব্ধ। শহর এখন দুর্গাপূজার রঙিন সুরায় মাতাল। অবশ্য এরই পাশাপাশি শহর কলকাতার বনেদী পরিবারগুলির দুর্গাপূজার আনুষঙ্গিক উপকরণে ও দেবীর আরাধনার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে না।

বাঙলায় ঠিক কবে দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়েছিল বা কে ও কারা এই পূজার প্রথম উদ্যোক্তা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। ইতিহাসের পাতায় জানা যায় বাঙলায় তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের গড়েই প্রথম দেবী দুর্গার পূজো প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ধুমধামে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বাঙলা দেশের পণ্ডিতজনেরা ঐতিহাসিক এই তথ্যকে অতটা গুরুত্ব না দিয়ে নদীয়ার মহারাজা ভবানন্দ মজুমদারের পূজোকেই (খ্রীঃ ১৬০৬) প্রথম দুর্গাপূজার মর্যাদা দিতে চান। ১৮২৯ সালে 'সমাচার দর্পণ' যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূজাকে প্রথম পূজো বলে

উল্লেখ করেছে, কিন্তু আমরা তার আগে বাঙলার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি ১৬১০ সালে। এ-প্রসঙ্গে বলতে হয় সেই সময় খাস কলকাতা শহরের তৎকালীন জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র (খ্রীঃ ১৭২০-৫৬) কুমোরটুলী অঞ্চলে তাঁর নিজের বাড়িতে আড়ম্বরে দুর্গাপূজা করেছিলেন। এর পরের যুগে শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৬৬ সালে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করেন। সমকালীন সংবাদপত্রে বলা হয়েছে ঃ "তাঁহার দুর্গোৎসবের উদ্বোধন হইতে বাই নাচ আরম্ভ হইত, তাহা দেখিবার জন্য শহরের বড় বড় সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন। এ সময় দুর্গাপূজা ছিল কেবলমাত্র রাজারাজড়ার পূজা-উৎসব। কিন্তু ১৮৮০-১৯০০ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক বা অন্যান্য যোগসূত্রে ধনিক সম্প্রদায়ের জন্ম হল। এই সব বড়লোকের দুর্গাপূজায় কে কত বেশি সাহেব-মেম জমায়েত করতে পারেন এই প্রতিযোগিতা শুরু করলেন এবং তা পূজা উৎসব না হয়ে আনন্দোৎসবেই পর্যবসিত হত। ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাবুদের প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আনুকূল্যের অভাব দেখা যায়। সাহেব-মেমদের যোগদানে ও উৎসাহে ভাঁটা বাড়তে থাকে। কালাআদমীদের সঙ্গে তাদের ব্যবসাভিত্তিক আঁতাতও শিথিল হতে শুরু করে, অন্যদিকে ইংরেজ শাসন-নীতি ও পদ্ধতির সমীচীনতা, বিশেষ করে জাতিধর্মের প্রশ্নে বনেদী পরিবারগুলিকে সংশয়াকুল করে তুলেছিল। অধিকার ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কেও তাদের মনে সচেতনতার স্ফুরণ হতে শুরু করে। আর একদিকে ধনিক বনেদী পরিবারগুলির শরিকী বিবাদে পূজাগুলি দুর্বল হওয়ার সুবাদে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হল।

পূজোয় ভোগ রান্না করে পরিবারের সধবা দীক্ষিতা মহিলারা। ভাসান হয় সাবর্ণদের নিজস্ব ঘাট সিঁড়িটিতে। প্রচলিত কথা—"মা নাকি ভোজন করেন কুমোরটুলীর দেওয়ান অভয়াচরণ মিত্রের (খ্রীঃ ১৮০০) বাড়িতে"। পূজা শুরু হয়েছিল প্রায় ৭৫ বছর আগে পিতামহ জমিদারী কাছারীর দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্রের আমলে। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভের পর যে পূজাতে ধুমধামের আসর বসতে শুরু করল—সেটা শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের রাজবাড়ীর পূজা। ১৮২৬ খ্রীঃ ১০ অক্টোবর 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায় যে সে বছর রাজবাড়ীতে আটটি উদ্ভিন্নে যৌবনা বর্মী নর্তকীকে আনা হয়েছিল। গণ্যমান্য নিমন্ত্রিতরা তাদের নাচে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যে পূজা শুরু হয়েছিল তার ক্ষুদ্র সংস্করণে এখনও 'বাঘওয়ালা বাড়ী'তে পূজা হয়। এখানে সিংহ শ্বেতবর্ণের ভিন্ন আকৃতি (সিংহের মুখ থাকলেও ঘোড়ার আকৃতি দেখানো হয়েছে)। ১৭৬০ খ্রীঃ দর্জিপাড়ার জয়মিত্র স্ট্রীটে দাঁ বাড়িতে পূজার সূচনা। এখানে মায়ের নাম—'অভয়া'। বাঙালী তার স্বভাবজাত সংস্কারে দেবীকে একই সঙ্গে মা ও

মেয়ের রূপে আরাধনা করে। কিন্তু কি কারণে মাতৃ-বন্দনার বদলে এখানে এল কন্যা-বন্দনা। ইতিহাস বলে—দয়ারাম দাঁ ১৭৩৪ খ্রীঃ বাঁকুড়া থেকে কলকাতার দর্জিপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুত্র রামনারায়ণের এক ছেলে এক মেয়ে—ধর্মদাস ও দুর্গা। এই দুর্গা তার বিয়ের পর প্রথম দিন মাঙ্গলিক কাজের জন্য বাপের বাড়ি এসে কলেরা রোগে মারা যান। তখন শোকার্ত জননীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ১৭৬০ খ্রীঃ থেকে রামনারায়ণ দুর্গার 'অভয়া' মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা শুরু করেন। মহামায়া এখানে মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা—তাই বাহন সিংহ অনুপস্থিত—বদলে আছে একটি সিংহাসন। দেবী অসুরনাশিনী নন—তাই অসুর নেই—প্রয়োজন ফুরিয়েছে দশহাতের। শুধু তিনি দ্বিভুজা। অন্যান্য সব দেবদেবীরা উপস্থিত আছেন। ঘরের মেয়ের মত লাল ফিতে দিয়ে সরস্বতীর ও সবুজ ফিতে দিয়ে লক্ষ্মীর চুল, দেবীর চুল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। দেবীর পদতলে পদ্ম—ডান পা বাঁ পায়ের উপর রাখা আছে। দু-পায়ে মল, দু-হাতে অভয় ও বর দান করছেন। এখন এই বাড়িতে পালাক্রমে পূজা হয়। কলকাতায় দেবীকে কন্যারূপে আরাধনার এটিই সর্বপ্রাচীন পূজা বলে জানা যায়।

খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজবাড়ির পূজা—দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধনী' কাব্যে লিখেছেন :—

'ভুবনে কৈলাস—শোভা ভূকৈলাস ধাম
সত্যের আশায় শুদ্ধ সত্য সব নাম,
....
বিরাজে ঠাকুর ঘরে হেম দশভুজা,
পটবাসাকৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।

১৭৮২ সালে এখানকার রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কুলদেবী পতিতপাবনীর অষ্টধাতুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন—ঘোটকাকৃতি সিংহে আরূঢ়া মহিষাসুরমর্দিনী—দশভূজা মূর্তি। বর্তমানে ২৯ জন সেবাইতরা দেবোত্তর এস্টেটের আয় থেকে দেবী পূজার ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন।

ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা—অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ে কলকাতায় যেসব বনেদী বাড়ীতে পূজা হত—ঠাকুরবাড়ির পূজা তাদের মধ্যে ছিল অন্যতম। নীলমণি কুশারীর (ঠাকুরবংশের পূর্বসূরী) সময় থেকেই মেছুয়াবাজার (পরে জোড়াসাঁকো) ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল অতি সাধারণ ভাবে। পাথুরিয়াঘাটা ও কয়লাহাটার ঠাকুর বাড়িতেও পূজা হত। অবশেষে ১৮৫৯ সালের পর থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পূজা বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতার পটলডাঙার বসুমল্লিক পরিবারের ২৪-তম অধস্তন পুরুষ রামকুমার বসু মল্লিক হুগলি থেকে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন।

তাঁর পুত্র রাধানাথ বসুমল্লিক ১৮৩১ খ্রীঃ ১৮ নং রাধানাথ মল্লিক লেনে শুরু করেন। বসুমল্লিক পরিবারে শাদরীয়া শুক্লা ষষ্ঠীতে হয় দেবীবরণ অনুষ্ঠান। পরিবারের এয়োস্ত্রীরা আসেন নতুন শাড়ী, সিন্দুর, আলতা, টিপ, পান নিয়ে, ঢাকীদের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বরণ অনুষ্ঠান। সপ্তমীর সকালে বিভিন্ন তীর্থের ২১ ঘড়া জলে, কলাবৌ স্নান। অষ্টমী পূজার দিন সন্ধ্যের সময় আমোদ-প্রমোদ অর্থাৎ থিয়েটারের আয়োজন থাকত। নবমীর রাত্রে বসত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। দশমীর দিন সকালে বসত যাত্রার আসর। বাঈজী নাচ থেকে সরে এই ধরনের পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন রুচিগত পার্থক্যের পরিচয়। আজও এ-পরিবার নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে যাচ্ছেন। পটলডাঙা অঞ্চলে কয়েকটি প্রাচীনপূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। রূপনারায়ণ ঘোষাল পরিবারের পূজা ৭০-এ মির্জাপুর স্ট্রীটের দেবোত্তর বড় বাড়িটিতে প্রায় ১৮৯১ সালে বলাইচাঁদ ও উদয়চাঁদ ঘোষাল আরম্ভ করেন। ৯/২ পটুয়াটোলা লেনের ব্যানার্জী বংশের আদি পুরুষ ২৪ পরগনার নবগ্রাম বাসিন্দা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় দুশো পঞ্চাশ বছর আগে, ৫৪ পটুয়াটোলা লেনের বাড়িটি তৈরী করে পূজা আরম্ভ করেন। কলকাতার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পারিবারিক দেবী সিংহবাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে—শুরু হয় ১৬১৩ সালে কলুটোলার মতিলাল শীলের পূজা গত দেড়শ বছরের পুরানো। লাহা পরিবারের পূজা শুরু হয় ১নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের আদি বাড়িতে আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রীঃ। পূজাটি বর্তমানে শরিকী হওয়ায় পালাক্রমে কমপক্ষে বারোটি বাড়িতে হয় (কলকাতার মধ্যেই)। ঠনঠনে দত্ত বাড়ির পূজা ১৮৫৫ সাল থেকে চলে আসছে। পূজায় যাত্রা, নাচ-গানের প্রচলন ছিল। দোতলায় কাঠের ঝিলমিল দেওয়া বারান্দায় বসে মেয়েরা নাচ-গান দেখতেন। এই দেবোত্তর বাড়িতে পূজা এখনও বেশ ভাল ভাবেই হচ্ছে। চোর বাগানের মিত্র পরিবারের পূজা ৮৪নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়িতে সূচনা হয় প্রায় ৩৪৫ বছর আগে। কলকাতার পুরানো পূজায় এখনও তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। রানী রাসমণিদেবীর পূজা প্রাঙ্গনের হাল ঠিকানা ১৩, রানী রাসমণি রোড। রানী রাসমণির শ্বশুর জানবাজারের ধনাঢ্য জমিদার মাড় বংশীয় প্রীতরাম বাবু প্রায় ১৯৫ বছর আগে ঐ পূজা শুরু করেন। রানী রাসমণির সময় মোট ৭টি বলি হত। তখনকার দিনে টাকা খরচ হত প্রায় ৫০/৬০ হাজার। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৬ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত এ বাড়ির পূজায় উপস্থিত থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শধন্য আরো কয়েকটি বাড়ির পুরানো পূজার উল্লেখ—সিমলা স্ট্রীটে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন ১৮৮৩-৮৪ এবং ৯৭নং বেনিয়াটোলা স্ট্রীটের অধরলালসেনের বাড়িতে দুর্গাপূজায় দুইবার উপস্থিত ছিলেন। পূজাটি এখনও হচ্ছে। ডাফস্ট্রীটে সুর পরিবারের বাড়িতে নতুন

পাকা মণ্ডপে পূজা হয়েছে প্রায় ১১৫ বছর ধরে। ১৯১১ খ্রীঃ মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানী ৪৮ সুকীয়া স্ট্রীটে তাঁর নিজের বাস ভবনে দুর্গাদালান প্রতিষ্ঠা করে পূজা শুরু করেন। বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ১২৬৪ বঙ্গাব্দে কুমারটুলীতে ১৬ এবং ১৭ নং জমি কিনে তৈরী বাড়ি ও দুর্গা দালানে পূজা করে আসছেন। হাট খোলার শ্যামলধন দত্ত প্রখ্যাত স্বর্ণকার বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়িতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে পূজা শুরু করেন। সেকালে কলকাতায় একটা কথা প্রচলিত ছিল—'দেবী মর্ত্যে এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ এর বাড়ীতে'। বর্তমানে গয়না পরাবার রীতি ঘটাকরে প্রচলিত না থাকলেও ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা রয়েছে গত ১৫০ বছর যাবৎ, গোকুলচন্দ্র দাঁ এই পূজার প্রতিষ্ঠাতা।

৩২ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের মল্লিকবাড়ির পূজা প্রায় ১৮০ বছর পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটার বসু পরিবার প্রায় ১৩৫ বছর যাবৎ তাদের বনেদীপূজা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মধ্য কলকাতায়—বৌবাজার এলাকায় অক্রুর দত্তের দুশো বছরের পুরানো পূজায় এখনও কলাবৌকে স্নান করান হয় গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও কন্যাকুমারীকার জল দিয়ে। মতিলাল পরিবারে দুর্গাপূজা ১/সি দুর্গা পিতুরী লেনে প্রায় ১৮৫ বছর যাবৎ হচ্ছে। ১৫ নং রমানাথ কবিরাজ লেনের রাখাল হালদারের বাড়ির দশভুজা সিংহবাহিনী (অষ্টধাতুর মূর্তি) মূর্তিটি রামনারায়ণ হালদারের পত্নী রাসমণি দেবী ১২৫৫ বঙ্গাব্দে (প্রায় ২ ফুট উঁচু) তৈরী করান এবং ৫ নং সনাতন শীল লেনে তাঁর আদি বাড়িতে পূজা শুরু করেন। কলুটোলায় ২-এ গোপাল চন্দ্র লেনে বদনচন্দ্র রায় ১৮৫৮ সালে পূজা শুরু করেন। ৩২-এ দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে কৃষ্ণচন্দ্র ধর প্রতিষ্ঠিত দ্বিভুজা অভয়া মূর্তি পূজা শুরু হয় ১৫০ বছরেরও বেশী।

দক্ষিণ কলকাতায়—বেহালায় মুখোপাধ্যায় পরিবারের পূজা শুরু হয় ১৭৭০ খ্রীঃ, শুরু করেন এই বংশের এক মেয়ে, নাম জানা যায়নি। বেহালার হালদার বাড়ির পূজার প্রবর্তক হেমচন্দ্র হালদার, একশ বছরেরও আগে এই পূজার সূচনা করেন। বেহালার রায়দের বাড়ির পূজার বয়স প্রায় ১৪০ বছর, প্রবর্তন করেন চণ্ডীচরণ রায়। বেহালার অরবিন্দ পল্লীর সুধীর চন্দ্র দাসের পূজার বয়স প্রায় ১৩০ বছর। ভবানীপুরে মিত্র বাড়ির পূজা ১৭৫৭ সালে শুরু হয়। তিলি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী রামলাল দে প্রায় ১০০ বছর আগে পূজা শুরু করেন তাঁর ২৬/ই চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বসত বাড়িতে। এখানে বৈষ্ণবমতে পূজা হয়। পদ্মপুকুরের সিংহবাড়ীর পুরানো পূজার কলকাতার বয়সের ৭০ বছরের বেশী। গিরিশমুখার্জী পরিবারের পূজার বয়স, ১৮০৯-১০ সালে কলকাতার ৩৯

গিরিশ মুখার্জী রোডের বাড়ি। মল্লিক বাড়ির পূজা ১৯২৪ সাল থেকে ২৫-এ মোহিনীমোহন রোডে নিজ বসত বাড়িতে সুরেন্দ্র মল্লিক ও সুশীলমাধব মল্লিক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে করে আসছেন।

সার্বজনীন দুর্গপূজা—১৯১০ সালে ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট রোডে প্রথম সার্বজনীন পূজা হয়। শহর কলকাতার ব্যবসায়িক পণ্য ওঠা-নামার ঘাট ছিল এটি। এছাড়া তেলিপাড়া রামধন মিত্র লেনের যৌথউদ্যোগে সার্বজনীন পূজার মিছিলের কথা জনগণকে জানানো হয়েছিল ১৯১২ খ্রীঃ। এর পরের বছর ১৯১৩ সালে শুরু হয়েছিল সিকদার বাগান সর্বজনীন পূজা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সার্বজনীন পূজা নতুন রূপ পেল। যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এল ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। দাঙ্গার সময় থেকে পাড়ার অভিভাবক হল নতুন একশ্রেণীর যুবক (মস্তান)। এদের হাতে পড়ে পূজার চেহারা পালটে যেতে লাগল। পূজারীকে বলা হতে লাগল 'শার্টকাট' করুন। আর ফিল্মী নায়িকাদের আদলে প্রতিমা গড়ার অর্ডার আরম্ভ হল। বাজনার পরিবর্তে এল মাইক। শেষ পর্যন্ত মস্তানী ব্যবস্থাপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে এল। সমাজ কল্যাণের কাজও হয়ে থাকে—বস্ত্রবিতরণ, রক্তদান, চক্ষুদান, চক্ষুচিকিৎসা শিবির। এই ভাবেই একক বনেদী পরিবারের বাবু উৎসব অনেক-ক্ষেত্রে সার্বজনীন 'লোক-উৎসব'-এর রূপ পরিগ্রহ করল। **বারোয়ারি পূজার** কয়েকটি সংস্থা হোলো—

উত্তর কলকাতা—সিমলা ব্যায়াম সমিতি (১৯২৬, অতীন্দ্রনাথ বসু); বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব (১৯১৯, উদ্যোক্তারা হলেন,—নীলমণি ঘোষ, বটুকবিহারী চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, রামকালী মুখোপাধ্যায়, সি. কে. সরকার); কুমারটুলী সার্বজনীন দুর্গোৎসব (১৯৩৩); বেনিয়াটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব (১৯৩৪, অনিল দত্ত এবং বিশ্বনাথ দত্তের উদ্যোগে); আহিরীটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব (১৯৪০, উদ্যোক্তা হরিশঙ্কর পাল ও কাশীনাথ দত্ত; হাতিবাগান সর্বজনীন (১৯৩৬);

দক্ষিণ কলকাতায়—ধর্মপ্রসারিণী সমিতি সার্বজনীন (১৯২৩); মনোহর পুকুর জনসঙ্ঘ (মাতৃমন্দির); বিপিন পাল রোড (১৯২৭); আদি দক্ষিণ কলিকাতা বারোয়ারি সমিতি (১৯২৮); বাদামতলায়, ২২-এ পল্লী (১৯৩৯); ২৩ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি (১৯৩৯); বকুলবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব (১৯২৮); বালীগঞ্জ প্রতিষ্ঠান (১৯৩৩); পদ্মপুকুর বারোয়ারি সমিতি (১৯৩৭); বালিগঞ্জে সিংহী পার্কে (১৯৪১); ভবানীপুরে সঙ্ঘমিত্র (১৯৪৪); ভবানীপুরে মহাপূজা সমিতি (১৯৪৫); ভবানীপুরে মুক্তাদল (১৯৪৯); কালীঘাটে নতুন সঙ্ঘ (১৯৪৬); প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা

দুর্গোৎসব পরিচালনার ভার পড়ে সঙ্ঘশ্রীর উপর। 'ফরওয়াড ক্লাব' (১৯৪৬), মুদিয়ালী ক্লাব (১৯৩৫), বালিগঞ্জ দেশপ্রিয় পার্ক (১৯৪৪) এছাড়া খিদিরপুর, টালীগঞ্জ অঞ্চলেও বেশকিছু বারোয়ারি পুজো হয়ে থাকে।

মধ্যকলকাতায় অন্যান্য অঞ্চলের মত সার্বজনীন পুজোর আধিক্য বজায় রয়েছে। এই অঞ্চলের প্রায় সবকটি পার্কে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ-স্কোয়ার, মহম্মদআলি পার্ক, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, মার্কেট স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, হৃষিকেশ পার্ক, লেডিজ পার্ক, ইণ্টালী সঙ্ঘ, ভ্রাতৃ সঙ্ঘ, শহীদ স্মৃতি সঙ্ঘ, জনসেবক সঙ্ঘ, ক্রিকরোর মোড়, কপালীটোলা (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ), বৌবাজার সার্বজনীন, তালতলা সার্বজনীন প্রভৃতি।

ঠাকুর ভাসান

এবার আসা যাক ঠাকুর ভাসানের পর্বে। সেকালের ঠাকুর ভাসান একটা দেখবার জিনিস ছিল। তখনকার সময়ে যে রকম জাঁকজমকের সঙ্গে ঠাকুর অর্থাৎ প্রতিমাগুলি সাজানো হত, আজকাল সে রকম দেখাই যায় না। সেকালের ধনীদের মধ্যে কার প্রতিমা বেশী সুন্দর সাজানো, সে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। তাঁদের প্রত্যেকের এক এক দল মোসাহেব বা খোসামুদে থাকত, তারা নিজ নিজ প্রভুকে এ-সব বৃথা কাজে অকাতরে অর্থব্যয়ে বেশ পরামর্শ দিত।

জোঁড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ গন্ধবণিক ৺শিবকৃষ্ণ দাঁ দুর্গা প্রতিমা সাজাবার জন্য ফরমাশ দিয়ে প্যারিস থেকে অলঙ্কার তৈরী করে এনেছিলেন। প্রতিমার সাজাবার ডাকের গহনা যেমন প্রায়ই শোলা ও অভ্রে রং লাগিয়ে প্রস্তুত করা হয়, তার পরিবর্তে আসল হীরা-মুক্তার খাঁটি সোনার জড়োয়া গহনা করিয়ে এনেছিলেন। ঠাকুর ভাসানের সময় সেই খাঁটি গহনাগুলি খুলে রেখে গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হোতো। শোনা যায়, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতেও প্রতিমা নকল গহনার পরিবর্তে খাঁটি সোনার গহনায় সাজানো হত এবং ভাসানের সময়ও সে গহনা খুলে নেওয়া হোতো না, সম্ভবতঃ ভাসানের নৌকার দাঁড়ি-মাঝি বা অন্য কর্মচারীরা তা খুলে নিত; কিন্তু প্রতিমার গা-সাজানো গহনা আর বাড়িতে ফিরত না।

প্রতিমা ভাসানের দিন বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে ফৌজদারী বালাখানার পর্যন্ত থাকত দর্শনার্থীর ভিড়। প্রতিমাগুলিকে এ-রাস্তায়, সে-রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে জগন্নাথ ঘাট বা নিমতলা-ঘাটেই নিয়ে গিয়ে দু'টি পাল্কীর সাহায্যে মাঝগঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত। চিৎপুর রোডের এই অংশের দু'পাশে সেকালে বড় অতিরিক্ত পরিমাণে বারবণিতাদের অধিকৃত থাকত। সুখের বিষয়, আজকাল এদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। মদ্যপানের প্রচলনও সেকালে একাল অপেক্ষা কম ছিল না।

যাদের বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন করা হত, সে-সব বাবু ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ নকলববুরা প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অঙ্গীভঙ্গী ও নৃত্য করতে করতে কানে খড়কে কাঠি দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে চলতেন। বাবুদের মাথার চুল সেকালে প্রচলিত অ্যালবার্ট ফ্যাসানে ছাঁটা। সম্মুখে বেশ একটু বড় রাখা, পিছনে একেবারে ছাঁটা। সেই চুল আবার তেল-চুকচুকে করে কারও বা সোজা 'টেরি' অর্থাৎ মাথার একপাশ দিয়ে টেরি কেটে চেপে বসানো আছে। যাঁদের ক্ষমতা ছিল, তাঁরাই প্রতিমার সম্মুখে বাঁশের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটার নাচ-নাচাতে কুণ্ঠিত হতেন না। এসবের মধ্যে যে একটা নিছক নির্লজ্জ বা বেহায়াভাব আছে, সে কথা বাবুদের মাথায় চুল আলগা—কারণ তাঁরা ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে মদ্যপান করে বের হতেন—কেউ বা নেশার ঝোঁকে ঢলে পড়তেন। তাঁর উপর, নকল বাবুরা আসল বাবুদের নিত্যসঙ্গী থেকে তাদের সর্বদাই বুঝাতেন যে, এসব কাজে এ-ভাবে অর্থব্যয়েই ধনবত্তার সার্থকতা।

বর্তমান যুগে পূজোর ছুটিতে বায়ুপরিবর্তনে বের হওয়া এবং অর্থের অনটন প্রভৃতি কারণে সে-কালের এ-দৃশ্য আর ফিরে পাবার আশা নেই। তদ্ব্যতীত, এখন যাঁদের বাড়ীতে পূজো হয়, তাঁদেরও পূর্বের ন্যায় এত মদের স্রোত বয় না। কাজেই যাঁরা প্রতিমার সঙ্গে যান, তাঁদের মধ্যে লজ্জাসরম বজায় থাকে, তাঁরা আর নির্লজ্জ-ভাবে ভূতের নৃত্য নাচতে পারেন না। সে বাবুও নেই, সে ঢাকীও নেই, সে উৎসাহও নেই, কাজেই পূজোয় আর রসকসও নেই। প্রতিমা ভাসানে সেকালে শুধুমাত্র পুরুষদেরই অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। মেয়েরা ছিল পর্দাসীন। প্রতিমা বিসর্জনের আগে দেবীবরণ কাজের দায়িত্ব ছিল তাদের, দেবীবরণ শেষ করে তাঁরা—এয়োস্ত্রীরা একে অন্যকে সিঁদুর পরিয়ে শুভ কামনা করতেন। একালে কিন্তু দেবীবরণ কাজটা ঠিকই আছে তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন মণ্ডপেই সমস্ত বয়সী এয়োস্ত্রীর ভিড় দেখা যায়। পারিবারিক পূজোর সংখ্যাও ক্রমশঃ কমে গিয়েছে। তবে একালে প্রতিমা ভাসানের আনন্দে মেয়েরা যোগ দিচ্ছে। মেয়েরা আজ আর পর্দাসীন নয়। তাই দেবীবরণের সাথে দেবীকে বিসর্জনের কাজেও যোগ দিচ্ছে। তবে সংখ্যায় খুবই নগণ্য। পাড়ার কিছু উৎসাহী যুবতীই এ-ব্যাপারে আগ্রহী। বনেদী পরিবারের গৃহবধূদের মধ্যেও সামান্য পরিমানেই প্রতিমা ভাসানের শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

এ-অধ্যায়ের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এখন আমরা। এ-পর্যায়ের আলোচনা ঊনিশ শতকের কলকাতার দুর্গোৎসব ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ; অবশ্য একই সঙ্গে বর্তমানের বিষয়েও আলোকপাত করা যাবে।

আর পাঁচটা শহরের জন্ম ও রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতার জন্ম ও রূপান্তরের ইতিহাসের মিল নেই। সে-বিষয়ে পূর্ববর্তী আলোচনা হয়েছে।

কলকাতার রূপান্তর বা তার বিবর্তনের ইতিহাস বলার কোন উদ্দেশ্য নেই, শুধু একটু প্রাসঙ্গিক পিছন ফিরে চাওয়া। শারদোৎসবের মুহূর্তে যখন এ-শহরে বিশাল আয়োজনপর্ব শুরু, পারিবারিক পূজার ঘটা ও জাঁকজমক তখন বারোয়ারি বা সার্বজনীন পুজোর জাঁকজমকের কাছে নিতান্তই নিষ্প্রভ। উনিশ শতকের কলকাতা যখন ক্রমশঃ গ্রাম্য সমাজের মোহ ত্যাগ করে আধুনিক শহরের রূপ পরিগ্রহণে সচেষ্ট সেই সময় কলকাতার দুর্গোৎসবের নানান চিত্র বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ও সাহিত্যে। সেগুলি অনুসরণ করে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

৩১ আশ্বিন, ১২৯৭ বঙ্গাব্দে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা একটি ব্যঙ্গ চিত্র ও দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো—

"কালের মাহাত্ম্যে তাই হইছে এবার।
ঊনবিংশ শতাব্দীর পূজা চমৎকার॥
এইসব দুর্গোৎসব, আনন্দে উন্মত্ত সব
কী ধনী, কি নির্ধনবর্গ,
এ-আনন্দ বর্ষে বটে, এ ভারতবর্ষে বষে
হর্ষে লোক, স্পর্শে যেন স্বর্গ॥
পাড়ায় পাড়ায় ঢোল, শহরে শহরে গোল,
বাজারে বাজারে লোক যত।
পূজার বাজারখানি, মদনের রাজধানী
কলিকাতা গুলজার কত॥"

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বারোয়ারি পুজোর প্রবর্তন হলেও যত জাঁকজমক ও খরচের বহর ছিল সম্পন্ন পরিবারের বাড়ির পুজোয়। একই সঙ্গে ছিল হিন্দুস্থানী বাইজীর আসর। একবার সকলকে টেক্কা দিতে শ্বেতাঙ্গিনী মেমবাইজী আনার ব্যবস্থা করেন শোভাবাজারের রাজবাড়িতে রাজা রাধাকান্তদেব। ১৮৫৫ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে 'মর্নিং ক্রনিকল' সংবাদ প্রকাশ করে মেমবাইজীর নাচ দেখতে (যার এক রাতের দক্ষিণা দু'শ টাকা) সারা শহরে অসম্ভব সাড়া পড়ে যায়। নাচ দেখার টিকিট পেতে গাদা গাদা আবেদন জমা পড়ে শোভাবাজার রাজবাড়িতে। বলাবাহুল্য সাধারণ মানুষজনের এসব নাচ-গানের আসরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। প্রবেশাধিকার ছিল পৌত্তলিকাবিরোধী সাহেবদের। প্রবেশাধিকার বললে ভুল হবে, তাদের তুষ্টি একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জানা যায়, রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়িতে লর্ড ক্লাইভ নাকি উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া

রাজা কালীকৃষ্ণের বাড়ির দুর্গোৎসবে মিঃ ও মিসেস এমোস, গোপীমোহনের বাড়ি লর্ড ও লেডী বেণ্টিঙ্ক।

এসব দেখে হুতোম তার নক্শায় লেখেন—"পাঠকবর্গ। এ-সহরে আজকাল দু-চার এডুকেটেড ইয়ংবেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পুজোআর্চ্চা করে থাকেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদেভাতে প্রসাদ পান, আলাপী ফিমেল ফ্রেণ্ডরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পুজোর কিছু রিফাইণ্ড কেতা ....।"

এত আমোদ-প্রমোদের পাশাপাশি দেখা যেত আরেকটি দৃশ্য, কাঙালী রেডভাট ও ভিক্ষুক। তারা যদিও উৎসবের অঙ্গনে একেবারেই ছিল বাহুল্য। হুতোমের 'নবমীর বর্ণনা' থেকে জানা যায়; "আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নবুইটা পাঁঠা, সুপারি, আক, কুমড়ো, মাগুর মাছ ও মরীচ বলিদান হয়েছে। কর্মকর্তা পত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কাচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠোনে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ীর মেয়েরা উঁকি মেরে দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গ্যাচে। কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙালী, রেডভাট ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক দরজা হতে মশাগুলো পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছে।"

নিম্নবিত্তের মানুষজনের জীবনযাপন চিরকালই ছিল এক কঠিন বাস্তব। সেখানে উৎসব আনন্দ বিলাস এসব বাহুল্য হলেও ধনীর ও বাবু কলকাতাবাসীর বিলাসীতা, প্রাচুর্য তথা ব্যভিচারিতার যে চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল তা সাহেবদেরও পছন্দ ছিল না। হ্যাঁচসন সাহেব দুর্গাপুজোর বাহুল্য দেখে বলেছিলেন—'It certainly is an ill wind that blows nobody good'.

সাধারণ মানুষের জীবন যাপন ও ধনীদের বিলাসিতা নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষতঃ কার্টুন পত্রিকা হিসাবে খ্যাত 'বসন্তক' ১৮৭৪ সাল, হরবোলা ভাঁড় ১৮৭৪ সাল, হুতোমপ্যাঁচার নকশা, ১৮৬২ সাল, কলিকাতার লুকোচুরি ১৮৬৯ সাল, সচিত্র গুলজার নগর ১৮৭১ সাল, ইত্যাদি।

এইসব পত্র-পত্রিকার ব্যঙ্গ বিদ্রুপে তৎকালীন সামাজিক বৈষম্য ও ইংরেজস্তাবক বাঙালীদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'বসন্তকে' এই বৈষম্য অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় বর্ণিত হয়েছে: "ভাদ্রমাসের পনের দিন যেতে না যেতেই দুর্গোৎসবের আমোদ শুরু হয়......বড় বড় রোজকেরে বাবুরা গিন্নীর গহনা গড়াবার সোনা কিনতে বেরোন; ধনাঢ্য হোমরা চোমরারা ভাল ভাল জরির সাটিন ফুলদার মখমলের জামা কর্তেছেন সুদখোর বাবুরা নতুন আভাঙ্গা কাপ্তেন বাবুর তল্লাজ কর্তে থাকেন।

চতুর্থী এসে পড়লো চাকরে বিদেশী কেরানীরা আজ ছুটি পাবেন কিন্তু ছুটি আর হয় না, বাতি জেলেও কাজ হচ্ছে…বিকারী রোগীরা শয্যাকণ্টকীতে যেরূপ ছটফট করে সেইরূপ ছটফট কচ্চেন কি সর্বনাশ আজ হল, চতুর্থী এখনো শাটী মিশি, মাথা ঘষা, চুল বাঁধা জুরি খরিদ হয়নি, অনেক কষ্টের পর রাত সাড়ে সাতটার সময় আপিসের বড় সাহেব মাহিনা বাঁটতে লাগলেন……এখন তার কেরানী ভায়াদের মুখে হাসি ধরে না। সম্বৎসরের ইণ্টুপিড, ড্যাম-রাস্‌কেল। এণ্ড সি, এণ্ড সি, ঘুসো, লাথি সব ভুলে গেলেন, দুহাত জয় হুজুরের জয় বলে বগল বাজারে আপিস থেকে বেরিয়ে আগুন খাকির মত বাজারে পড়লেন…।"

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দুটি শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ ফুটে উঠেছে তা ভাববার বিষয়। এর সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষ উৎসবের আগমনে কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ত তারও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতিও আত্মস্মৃতি'তে……"একে পুজোর বাজার তার উপর ঝড়, দ্রব্যসামগ্রির মূল্য দারুণ বেড়ে উঠল। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, ভাল পুরানো বালাম চাল তিনটাকা মণের উপরও উঠেছিল, পাকা রুই মাছ ছ' আনা, সাত আনা সের পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। এইহারে খাদ্য পরিধেয় তখনকার হিসাবে দামে আগুন হয়ে সাধারণ লোককে বড়ই কষ্টে ফেলেছিল…।"

জন্মভূমি (১৩০০ বঙ্গাব্দ) "শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব—ভোলা দাসের চিন্তা" শীর্ষক একটি লেখায় বলা হয়েছে ; "স্মরণ করিয়া দেখ, সেই গত বৎসরের ঘটনা। সেবারে ভাদ্রমাসেই হরি-বিরিঞ্চি শিব প্রমুখ সমস্ত সুরগণ সমবেত হইয়া অবধারণ করেন, এ পাপময় নরকাগার ধরনীগর্ভে মাকে আর আসিতে দেওয়া হইবে না।" —এখানে দেবীর আগমন যাতে না ঘটে তার আবেদন।

ঊনিশ শতকে যখন অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় নেতারা নবজাগরণের ডাক দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে গোঁড়া ও স্বার্থান্বেষী মহল সোচ্চার হলেও সক্রিয় বাধা দিলেও সমাজের একটি অংশ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রভাবিত তা পরিস্ফুট হয় এই সময়ের পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত কার্টুন, সংবাদ, নিবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে। 'জন্মভূমি' অন্যত্র লিখেছেন—

"পূর্ব বৎসর দেশে ধান্যাদি যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, বণিকগণ আমাদের প্রাণের আশার সহিত তাহা নিঃশেষে গ্রহণ করিয়া কোন্ দেশে লইয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানাও নাই ; এখন অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল বা আছে তাহাতেও বণিক প্রবৃত্তির বিশ্রাম নাই। সুতরাং ধান্য তণ্ডুলের অভাব হইয়া পড়িল ; প্রতি মুদ্রায় সাত আট সের বিক্রয় হইতে লাগিল। এইবার অবশিষ্ট জীবনের শেষ সময় উপস্থিত।……"

বিংশ শতাব্দীতে এসে শারদোৎসবে পত্র-পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। বর্তমানে পত্র-পত্রিকার বিষয় বস্তুতে ধারার পরিবর্তন লক্ষণীয়। বর্তমানে কলকাতায় শারদীয়া পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক। তবে এসব পত্র-পত্রিকার বিষয় বস্তুতে দু'টি দিক বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। একদিকে কিছুসংখ্যক পত্র-পত্রিকা আছে যেগুলির বিষয়বস্তুতে যৌন-আকর্ষণের গল্প উপন্যাসের ভীড়; অন্যদিকে কিছু প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকাও আছে যেগুলির বিষয়বস্তুতে উগ্রতা অনুপস্থিত, সামাজের বাস্তব চিত্রকে, সাধারণের কথা তুলে ধরার প্রবণতা। তবে দু'ই শ্রেণীর শারদীয় পত্র-পত্রিকাতেই শারদ দেবীর আরাধনার চিত্র অনুপস্থিতিই বলা যায়।

কলকাতার দুর্গাপুজোর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এবার অন্যান্য কয়েকটি পুজোপার্বনের বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক্। আষাঢ়ের ঝিরিঝিরি বর্ষায় শহর কলকাতা মাততো রথের মেলায়। সে অনেক দিন আগের কথা। এখন আর সে মাতন শহরের বুকে দেখা যায় না। কিন্তু পুরানো কলকাতায় ছিল, রকমারী রঙের রথে ভরে যেত শহরের রাস্তা। বৈঠকখানার রথ ছিল চেয়ে দেখার মতো। লালদীঘি থেকে বৌবাজারের সোজা সড়ক ধরে টানা হত এই রথ। এই রথে সারা বছর থাকে বৈঠকখানায় বিরাট বটগাছের তলায়। এই রথ ছিল শেঠদের, এর নাম ছিল গোবিন্দজীর রথ। বসাকদের রথ স্থাপন করেন শোভারাম বসাক, এ রথেরও নাম আছে। বৌবাজার নামটি হয়েছে শোভারাম বসাকের পুত্রবধূর নামে। পোস্তার জগন্নাথ দেবের রথ ছিল তিনটি; গরাণহাটার কালাবাবুর বাড়ির উঠোনে সারা বছর এই রথগুলি থাকত; রথযাত্রার সময় পথে নামত রথগুলি। রথ চলতো আগে আগে, পেছনে থাকত গ্রাম-গঞ্জের উৎসাহী মানুষজন। তাদের সকলের হাতে থাকত নানা রঙের পতাকা। ঝালর ঝুলানোর ছাতা, আর বড় বড় তালপাতার পাখা। পাখার গায়ে রামায়ণের নামান কাহিনী নিখুঁতভাবে আঁকা থাকত। আর জ্বলতো মশাল। কোনটা কাপড়ের, কোনটা আবার নারকোলোর ছাঁচের। শহর জুড়ে রথ বেরোতো। রথ চলার পথ ছিল, ছাতুবাবুর বাজার থেকে চেতলার নাজিরবাবুর বাজার, চাঁপাতলার জয়নারায়ণ চন্দ্রের রথতলা থেকে কাশীপুরের লড়াইলের রায় পরিবারের, টালিগঞ্জের মণ্ডলদের রাসবাড়ির রথ থেকে গোবিন্দ সেনের সোনার রথ। সাতদিন ধরে চলতো রথযাত্রার অনুষ্ঠান, আর মেলা চলত একমাস ধরে। বর্তমানে অবশ্য সেই উৎসবের আনন্দ আর নেই, তবে মেলা বসে কম বিস্তর।

পুরানো কলকাতার আর এক জমাট উৎসব হোলো দোল। দোলে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত নগরবাসীর প্রাণে। দোলে অর্থাৎ হোলি যেন ফুলশয্যার রাতে নিদ্রিতা কোন কামিনী কাঞ্চনবতী; স্বল্প পরিসরে আনন্দের আবেগে মাতাল

হবার বাসনা তার। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যেত রঙ আর আবিরের খেলা। মিছিল করে দল বেঁধে বেরোতো সবাই, হাতে থাকতো তাদের রঙিন বালতি, ধুতির খুঁটে বাঁধা মুঠো মুঠো আবির। গান গেয়ে তারা পথ চলত। দোলের মজা জমতো সবচেয়ে বেশী লালদীঘিতে। তার পশ্চিমে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীবাড়ি, শ্যাম রায়ের মন্দির। মন্দিরে তৈরী হতো দোলমঞ্চ। দক্ষিণে শ্যামরায়, উত্তরে বিরহিনী শ্রীরাধিকা। শহরের ছেলে যুবারা শ্যাম আর রাধার মধ্যে আবিরের উদ্দাম লড়াই বাধাতো। আবির রাঙা হয়ে সবাই স্নান করত লালদীঘিতে, আবিরের রঙে রাঙ্গা হয়ে উঠত দীঘি, তাই এর নাম হয় লালদীঘি। আর আবিরের ধুলো মেখে রক্তিম হল পথ, তাই একেও নাম দেওয়া হল লালবাজর। রাধামাইজীদের নামে নতুন নাম হল রাধাবাজারের। অবশ্য এরই পাশাপাশি অন্তঃপুরেও জমে উঠত মেয়েদের হোলি। শহরের হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদেরও কাউকে যোগ দিতে দেখা যেত এ উৎসবে। হোলি উৎসব এখনও আছে, তবে লালদীঘির সেই আনন্দ মুছে গিয়েছে।

উৎসবের মধ্যে আর একটি রসের উৎসব ছিল, তা হোলো রাসযাত্রা। কলকাতার রাস উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠাকুরদা রাজা নীতাম্বর মিত্র। বাগবাজারের গোকুলমিত্রের বাড়িতে রাসের পার্বন ছিল দেখবার মত। তাদের ঠাকুর বাড়ীর দক্ষিণে একটি দীঘি ছিল, যেখানে নৌকায় চেপে মেয়েরা কবির লড়াইতে অংশ নিত। আহেরীটোলায় নিমুগোঁসাই রাস করতেন চৈত্র মাসে। নিমুগোঁসাই-এর রাস উৎসব উল্লেখের দাবী রাখে। এ-নিয়ে একটা ছড়াও আছে—

'জন্মমধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্রমাসে রাস।'

পরবের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছিল বছর শেষের গাজন। চৈত্রমাসের প্রথম দিন থেকেই ঢাকের বাজনায় কাঁপতো শহর। এই উৎসবের পরিধি ছিল বিস্তৃত, তাই বাবুদের সাজানো বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে স্থান নিয়েছিল সাধারণের মধ্যে। গাজন জমতো হাটে-বাজারে, অলি-গলিতে, পল্লীতে-পাড়ায়। এ-উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ছিল বাণ ফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, ফুল ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ। বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্রের শেষ দিনে রঙ্‌চঙ্‌ মেখে সঙ্‌ সেজে সবাই বেরোতো শহরের বুকে। এছাড়াও শিব চতুর্দশীতে মেয়েদের শিব পূজোর ঘটা কলকাতার ঐতিহ্যকে সেই পুরানো সময় থেকে বহন করে নিয়ে আসছে।

এইসব উৎসবের পাশাপাশি ছিল, কালীপুজো, ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজো, সরস্বতী পুজো। একদিকে কালীঘাট অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর, মাঝে আছে কত শত কালীমন্দির। শহর যেন শ্যামামায়ের মন্ত্রপূতো সাধের মেয়ে। ফিরিঙ্গীপাড়ায় ছিল ফিরিঙ্গী কালী, বাগবাজারের চিত্রেশ্বরী, চৌরঙ্গীর চৌরঙ্গী

কালী, শ্যামবাজারের সিদ্ধেশ্বরী। সেখানে তখন প্রহর রাতে নরবলি দিত ডাকাতের দল। পুরানো কলকাতার এ-সব পুজোপার্বনের সঙ্গে আজকের কলকাতার যেন তুলনাই হয় না। যদিও সব-পুজো পার্বনেই কলকাতার মানুষজন অংশ নেন কর্মবিস্তর, কিন্তু পুজোর আনন্দ-উৎসবে আজকের কলকাতা যেন কৃত্রিমতায় ভরে উঠেছে। দেব-দেবীর আরাধনার বদলে এসে জুটেছে পাশ্চাত্যকালচার, চোখ ধাঁধানো সাজসজ্জার কৃত্রিমতার পাশাপাশি কান জ্বালানো মাইকের শব্দে নগরীর মানুষজনের প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত।

নারী শিক্ষা

উনিশ শতকের কলকাতা, নবজাগরণের কলকাতা। এই সময়েই আধুনিক ভারতের স্বপ্নদর্শী কলকাতা নারী-শিক্ষারও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৮১৫ সালের রামমোহনের আত্মীয়সভা, ১৮২৮ সালের ব্রাহ্মসভা, ১৮৩৯ সালের ঠাকুরবাড়ীর দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বরঞ্জিনীসভা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সভার দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে যার নাম তত্ত্ববোধিনীসভা, হয়েছে এই কলকাতাতেই। ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ সাল) প্রভাবিত ঊনবিংশ শতকীয় শিক্ষিত সমাজ যাঁদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী—এঁরা সকলেই নারী মুক্তি, নারী শিক্ষার জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন এই কলকাতাতেই। এইভাবে কলকাতা হয়ে ওঠে নারী শিক্ষার এক পীঠস্থান।

১৮১৯ সালে মে-জুন মাসে বাঙালী মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতার গৌরীবাড়িতে। ১৮২১ সালে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব বিদ্যালয়গুলি যে যে স্থানের মহিলাদের অর্থে স্থাপিত হয়, সে স্থানের নাম বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮২২ সালের প্রথমে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকটি প্রকাশিত হয়; এটি নারীশিক্ষা প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়। ১৮২৬ সালের ২৬-জানুয়ারী সংখ্যায় গর্ভনমেণ্ট-গেজেট অনুযায়ী দেখা যায় যে, সোসাইটির শুধু কলকাতার উত্তরবিভাগীয় বিদ্যালয়গুলি হতে প্রায় ১০০ জন ছাত্রী বেনাভোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশনে এসে পরীক্ষা দেয়। ইতিমধ্যে কলকাতায় লেডিস সোসাইটি নামে আর একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা সংঘ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকে।

১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটির আনুকূল্যে লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে বিদেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে লণ্ডনে বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে একটি সংঘ ছিল। কলকাতার স্কুল সোসাইটিকে সাহায্য করবার জন্য এই সোসাইটি ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে কুমারী মেরী অ্যান্‌ কুক্‌কে কলকাতায় পাঠালেন। কলকাতার দেশীয় চার্চ মিশনারী সোসাইটির সম্পাদক রাধাকান্তদেবের সহায়তায় মিস কুক্‌ ঠন্‌ঠনিয়া, মির্জাপুর, শোভাবাজার, কৃষ্ণবাজার, মল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতে কয়েকটি নতুন অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এ-ব্যাপারে তিনি স্থানীয় লোকদেরও সাহায্য পেয়েছিলেন।

নারীশিক্ষাপ্রসারে-কলকাতা হেয়ার প্রাইজফাণ্ড-এর (১৮৪৪) বিশেষ মূল্য আছে। এই প্রাইজফাণ্ডের উদ্যোক্তারা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতাকে পুরস্কার দিতেন। এবং ঐ সব রচনার বিষয় বস্তু থাকত বাল্য বিবাহের দোষ, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে, গণচেতনার উদ্বোধনে এটি একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্যারীচাঁদ-মিত্রের সম্পাদনায় এরপরেই বের হয় 'বামারচনাবলী'। ১৮৫০ সালে কলকাতার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার নাম 'সর্বশুভকরী-সভা' আজকের ঠনঠনিয়ায় ৫৮-নং বাড়ীতে এ-সভার শুরু—উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র তারকনাথ দত্ত। এ-সভার পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বিধবা-বিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর আর দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখলেন 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধটি মদনমোহন তর্কলঙ্কার।

নারী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে কলকাতায় আরো একটি ধ্রুব নাম হোলো ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বেথুন এদেশে কলকাতার মাটিতে পা-রাখেন। পদাধিকারবলে তিনি ছিলেন Council of Education এর সভাপতি। রামগোপাল ঘোষ এই বছরেই Council of Education-এর সদস্য পদে নিযুক্ত হন। বেথুন কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় তাঁর কাছে ব্যক্ত করলে রামগোপাল ঘোষ এ-ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। ধীরে ধীরে বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ সুচারুভাবেই পরিচালিত হতে থাকে। রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাধাকান্তদেব বিরোধীদের কথায় কান না দিয়ে এ-ধরনের মহৎ কাজ অনুশীলন করার জন্য বেথুনকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানান। বেথুন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে বালিকা বিদ্যালয় অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

বেথুন তাঁর নিজ উদ্যোগে যে বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সে গৃহটি সম্পূর্ণ হবার আগেই ১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বেথুন সোসাইটি তৈরী হয়, নারী শিক্ষার কাজে সোসাইটির অবদানও ছিল যথেষ্ট। বেথুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। তাঁর প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব ধীরে ধীরে সরকার নিজেই নেয়। এরজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। এ-ইতিহাস দীর্ঘায়িত করা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। তবে কলকাতার নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে সরকারী হস্তক্ষেপের পর থেকেই এ-বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। কলকাতার কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'কাশীপুরভবন' ছিল আর একটি নারী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ১৮৫৪ সালে এই বাসভবনে কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি স্কুল তৈরী করেন। কিন্তু জনসমর্থনের অভাবে ছাত্রী

পাওয়া মুস্কিল হয়। এবং শেষে স্কুলটি উঠে যায়। কলকাতার অদূরে উত্তর-পাড়ায় 'হিতকারী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৬৩-র ৫ই এপিল। এই সভা বিভিন্ন এলাকার মেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে।

'ব্রাহ্মিকাসমাজ' তৈরী হয়েছিল পটলডাঙা স্ট্রীটের এক ব্রাহ্মবাড়ীতে। এভাবে নারী শিক্ষার অনুকূলে এক পরিবেশ কলকাতায় তৈরী হোলো। 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়'-ও এ-সময়ে তৈরী হয় কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ১৮৭১ সালে। এভাবে দেখা যায় কলকাতাকে ঘিরে নারী শিক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল ঊনিশ শতকে। জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর 'সখি-সমিতি'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীদেবী এবং আরো অনেকে যেমন—স্বর্ণলতা ঘোষ, বরদাসুন্দরী ঘোষ, চন্দ্রমুখী বসু, মৃণালিনী দেবী একাজে হাত দিয়েছিলেন। নারী শিক্ষা প্রসারে উত্তর কলকাতার বাগবাজারের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর বাগবাজারের নিবেদিতা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল সিস্টার নিবেদিতার প্রচেষ্টায়। শ্রীসারদা দেবী প্রতিষ্ঠাকালীন উৎসব শেষে আশীর্বাদ করে বললেন, 'যে সকল বালিকা এখানে শিক্ষালাভ করবে তাহারা যেন দেশের আদর্শ কন্যা হয়।'

নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে ভারতের তথা কলকাতার মাটিতে পা রাখার পর থেকেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হন। বিদেশে স্কুলের জন্য টাকা সংগ্রহের আবেদন করেন। ভারতে তাঁর স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওরা জানতে চাইলে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেনঃ—"To give education [not instruction merely] to orthodox Hindu girls in a form that is suited to the needs of the country".

ছোট কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল হিসেবে আরম্ভ করলেও এটি অচিরে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯০৩ সালের ২রা নভেম্বর বয়স্কা মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র শাখা খোলা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই নারী শিক্ষার ভার সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। সেই কারণে বিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা প্রসারের কাজ চলতে থাকে মন্থরগতিতে সদাবহমান অবস্থায়। আজ কলকাতা তিনশো বছরের বয়স্কা হলেও বিংশ-শতাব্দীর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা। যেহেতু শিক্ষার বিশেষ করে নারী শিক্ষার গতি শম্বুকগতি, এ তাই-আশানুরূপ সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় কলকাতায় নারী শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত আশাব্যঞ্জক।

১৯৭১ সালের আদমসুমারীর হিসেব অনুযায়ী এ-রাজ্যে শিক্ষার হার ৩৩·২০ শতাংশ, এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার ২২·৪২ শতাংশ। তুলনামূলক ভাবে কলকাতার ক্ষেত্রে এ-হার ৬০·৩২ শতাংশ, যার মধ্যে নারী শিক্ষার হার ৫৪·৪০

শতাংশ। অনুরূপ ভাবে ১৯৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী নারী শিক্ষা হার ৩০'৩৩ শতাংশ, এবং কলকাতার ক্ষেত্রে এ-হার ৬৩'০১ শতাংশ। অর্থাৎ নারী শিক্ষার হার ক্রমবর্ধমান এটি উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৮১-র হিসেব অনুযায়ী কলকাতায় স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্না মহিলার সংখ্যা হোলো ৮, ৬৩, ৪১০ জন।

কলকাতার তিনশো বছরের বয়সে নারী শিক্ষার কথা দুই শতকের। কিন্তু স্বল্পপরিসরে সমস্ত বিষয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই অনেক বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নি। তবে মোটামুটিভাবে একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। সফলতার বিচার পাঠকদের উপরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

বিংশ শতাব্দীর কথা

ঊনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের শতাব্দী। এ সময়কালেই এ-রাজ্যে তথা কলকাতায় নারী জাগরণের সূচনা হয় রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বন্ধ, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্যবিবাহ বন্ধ আইন প্রবর্তনের মধ্যদিয়েই। এ-শতাব্দীতেই নারী শিক্ষার সূচনা হয়, ক্রমশঃই এর প্রসার ঘটে। সামগ্রিকবিচারে বলা যায় এ-সময়ে সমাজের নবজাগরণের পাশাপাশি ধর্মের ক্ষেত্রেও নতুন ধরনের একটা জোয়ার বয়ে যায়, যাঁর প্রবক্তা হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণপরমহংসদেব। যিনি সুদূর গ্রাম থেকে এসে এই কলকাতার জানবাজারে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর মন্দিরের পূজারী। রাণী রাসমণি-এ শতাব্দীর একজন ধর্মপ্রিয়া ব্যক্তিত্ব, যিনি দক্ষিণেশ্বরে এ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুবাদেই কলকাতার মাটিতে আসেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিনী সারদাদেবী যিনি ছিলেন ধর্ম-আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা। তিনি রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর এদেশে অর্থাৎ এই কলকাতার মাটিতে আগত বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়ে বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় শুরু করেন। এতো গেল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের কথা। এবার আসা যাক্ বিংশ শতাব্দীতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য নিয়েই এ-রাজ্যে তথা এ-নগরীর নারী জাগরণের কাজ চলতে থাকে। ১৯০০ থেকে ১৯২০ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনার পাশাপাশি ঘটে বড় বড় কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দানা বেধে ওঠে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী সমাজ পরিবর্তনের ভূমিকা উদ্বুদ্ধ করে তোলে মধ্যবিত্ত সমাজকেও। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে 'মহিলা আত্মরক্ষার সমিতি' নামে আন্তর্জাতিক মহিলা সংগঠন জন্ম নেয় পশ্চিমবঙ্গে যার কেন্দ্র বিন্দু এই কলকাতাতেই। নারীদের পর্দা থেকে বাইরে এসে সংগ্রামের মঞ্চে দাঁড়াবার সময়কাল ছিল এটাই। স্বাধীনতা লাভ হবার পর সাত সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ন হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে। প্রত্যেকটি পরিকল্পনাতেই নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য কিছু না কিছু কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল আন্দোলনে মহিলারা ক্রমাগত সামিলও হতে থাকেন। ১৯৬১ সালে যৌতুক প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি বিভিন্ন গণ আন্দোলনে মেয়েরা বিপুল ভাবে অংশ নেন। সত্তরের

দশকের মাঝামাঝি দেশ জুড়ে নেমে আসে জরুরী অবস্থা। এর ফলে বিকাশের ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এর থেকে এ-নগরী মুক্তি পায় নি। তাই নগরের বুকে রাজনৈতিক কোলাহল বেশ জাঁকিয়ে বসে। নারী নির্যাতন বেশ ভাল পর্যায়েই পৌঁছায়। ১৯৭৭ সালে এ-রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে ধীরে ধীরে অবস্থা শান্ত হতে থাকে। আশির দশকে নারী আন্দোলনের ধারার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারী মর্যাদা বোধ রক্ষার, নারী অধিকার রক্ষার প্রশ্নে ভালই সাড়া মিলতে থাকে। এইসব সাফল্যকে ধরে রাখা এবং সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্য সরকারের নতুন পদক্ষেপ হোলো শিক্ষাকে সার্বজনীন করা। কলকাতার মেয়েরা এ-সুযোগের পুরোটাই ভোগের অধিকারী হোলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্ধাংশ নারীও অংশগ্রহণে সক্ষম হোলো না।

কলকাতার লোকসংখ্যা ১৮৮১ সালের গণনা অনুসারে মোট ৩৩, ০৫, ০০৬ জন। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৩, ৭৪, ৬৮৬ জন। মোট জনসংখ্যার ৩৪·৮৭ শতাংশ মূল শ্রমিকের মধ্যে ৫৫·৩১ শতাংশ পুরুষ ও ৬·১৭ শতাংশ নারী। কুঠির শিল্পে নারী শ্রমিকের পরিমাণ ২·১৭ শতাংশ। প্রান্তিক অর্থাৎ আধা-শ্রমিকের পরিমাণ মোট জনসংখ্যার ০·৩২ শতাংশের মধ্যে ০·৪৩ শতাংশ পুরুষ এবং ০·১৬ শতাংশ নারী শ্রমিক। বেকারের পরিমাণ মোট জনসংখ্যার ৬৪·৮১ শতাংশের মধ্যে ৪৪·২৬ শতাংশ পুরুষ ৯৩·৬৭ শতাংশ নারী।

১৯৮১ সালের গণনা অনুসারে দেখা যায় কলকাতায় প্রতি হাজার জন পুরুষ পিছু ৭১২ জন নারী। নগরীর মোট শিক্ষার হার ৬৯·১২ শতাংশ, এরমধ্যে পুরুষ ৭৩·৪৭ শতাংশ এবং নারী ৬৩·০১ শতাংশ।

নগরীর কর্মরত মহিলাদের মধ্যে অনেকেরই বাসস্থান শহরতলী অর্থাৎ অন্য কোনো জেলায়। সে-কারণেই শহরে বাসের জন্য কিছু হোস্টেলের প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খুব কমই থাকবার সুব্যবস্থা আছে। ১৯৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী কলকাতা শহরে কর্মরত মেয়েদের থাকবার জন্য মাত্র ৮টি হোস্টেল আছে যার প্রত্যেকটির আসন সংখ্যা ৪৭৮ জনের বেশী নয়, প্রয়োজনের তুলনায় যা খুবই সামান্য।

বেশ কিছু তপসিলী ও আদিবাসী পুরুষ-নারীর বাস এ নগরীতে। এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৪·৫৪ এবং ০·১৩ শতাংশ। তপসিলীভুক্ত পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪·৭৫ এবং ৪·২৩ শতাংশ। আদিবাসী পুরুষ ও নারী পরিমাণ যথাক্রমে ০·১৫ এবং ০·১০ শতাংশ। শিক্ষাদীক্ষা এবং সমাজের অন্য সমস্ত প্রগতির ক্ষেত্রে কলকাতায় থেকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী হয়েও কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে এরা সক্ষম হয়নি। প্রসঙ্গতঃ

১৯৬১ সালের হিসেব উপস্থাপিত করা যেতে পারা যায়—

তপসিলীভুক্ত জাতির কলকাতার ১৯৬১ সালের গণনার হিসাবে মোট জন সংখ্যার পরিমাণ ৮২, ৯৫৮ জন পুরুষ এবং ৪৩, ৬৯৪ জন নারী। এদের মধ্যে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ ১৭,৪৬৯ জন এবং নারী ৪৮৫০ জন। প্রাথমিক, স্নাতক এবং প্রযুক্তিগত ডিগ্রীলাভের ছেলে ও মেয়েদের হিসেব যথাক্রমে ৭,৪৭৫ ও ছাত্রী ২,১৮৫ জন, ১৩৯ জন ছাত্র ও ৬ জন ছাত্রী এবং ৭ জন ছাত্র ও একজন ছাত্রী। আদিবাসীর ক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যা যথাক্রমে ২,০৫১ জন পুরুষ ও ৪৬৯ জন নারী। এর মধ্যে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ ৫৭৩ জন ও নারী ৫০ জন, প্রাথমিকস্তরে ছাত্র ১৫৮ ও ছাত্রী ২৫ জন, স্নাতক ছাত্র সংখ্যা ৪ জন ও ছাত্রীসংখ্যা ১ জন ; প্রযুক্তি গত বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা ৪ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১ জন।

অসুস্থ সংস্কৃতি বোধের পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে সাড়া দিয়েছে নগরীর মেয়েরা। আর সেই কারণেই পেশাদারীর নাট্যমঞ্চের পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতি বোধের মঞ্চ শক্তিশালী করছেন গণনাট্য, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসংঘ, গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পী, সাহিত্যিকরা। এ ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখের দাবী রাখে। তাই বিংশ শতাব্দী উপেক্ষা করবার মত নয়।

বিংশ শতাব্দীর নারী কথার আলোচনার শেষ পর্যায়ে আসব বিংশ শতাব্দীর কলকাতার জন সংখ্যার তুলনামূলক বৃদ্ধির একটা হিসেব উপস্থাপনের পর—

	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ	পুরুষ	নারী	পুরুষ পিছু নারী সংখ্যা
১৯০১	৯,৩৩,৭৫৪	—	৬,১৫,১৪৯	৩১,৮৬০৫	৫১৮
১৯১১	১,০১৬,৪৪৫	৮২,৬৯১	৬৮১,৩৮৫	৩৩৫,০৬০	৪৯২
১৯২১	১,০৫৩,৩৩৪	৩৬,৮৮৯	৭০৮,২০১	৩৪৫,১৩৩	৪৮৭
১৯৩১	১,১৬৫,৩৩৮	১,১২,০০৪	৭৯৩,৬১৭	৩৭১,৭২১	৪৬৮
১৯৪১	২,১৬৭,৪৮৫	১০,০২,১৪৭	১,৪৪৮,৮৬০	৬৭৮,৬২৫	৪৫৬
১৯৫১	২,৬৯৮,৪৯৪	৫,৩১,০০৯	১,৭০৭,৩৮৯	৯৯১,১০৫	৫৮০
১৯৬১	২,৯২৭,২৮৯	২,২৮,৭৯৫	১,৮১৫,৭৯১	১,১১১,৪৯৮	৬১২
১৯৭১	৩,১৪৮,৭৪৬	২,২১,৪৫৭	?	২	৬৩৬
১৯৮১	৩,৩০৫,০০৬	১,৫৬,৭৬০	১,৯৩০,৩২০	১,৩৭৪,৬৮৬	৭১২

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিংশ শতাব্দীর নারী অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যতটা সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতার নারী

ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতির ব্যবস্থার উপর ছিল তখনকার দিনে বাঙালী হিন্দু পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাটাই অপ্রতিহতগতিতে চলে এসেছিল। এই স্মৃতির ব্যবস্থার মধ্যেই আছে সতীদাহ বিধি, বিধবাবিবাহ নিষেধ, অবরোধ প্রথা, নারীশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নারীর মানবিক অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই অধিকার অর্জনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩ খ্রীঃ) তদানীন্তন সময়ে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে যা লিখেছেন, তারই একটা অংশ সংক্ষিপ্তআকারে উপস্থাপিত হোলো—"কুলীন ব্রাহ্মণরা তখন বহুবিবাহ করতেন। সারাজীবনের মধ্যে হয়তো স্ত্রীদের এক একজনের সঙ্গে দু'চারবার মাত্র সাক্ষাৎ হত। স্ত্রীলোকেরা পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে পরাধীন হয়ে, নানা দুঃখে সারাটা জীবন অতিবাহিত করতেন। যাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ নন অথবা এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন বা যাঁরা ব্রাহ্মণ নন এবং এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন সেখানেও বহু স্ত্রীলোকের দুর্গতির অন্ত ছিল না। রান্না ও শুধুই ঘরের কাজে দাসীর পর্যায়ে তাঁদের রাখা হ'ত এবং সকলের সকল অনুযোগ ও গঞ্জনা তাঁরা সহ্য করতে বাধ্য হতেন। অনেকসময় সকলের আহারের পর কিছু কিঞ্চিৎ যা পড়ে থাকতো তাই দিয়েই তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ত। দরিদ্র সংসারে তো তাঁদের দুঃখ ক্লেশের অন্তই ছিল না। আবার ধনীর সংসার হলে, স্ত্রীর জ্ঞাতসারে বা দৃষ্টিগোচরে স্বামী বহু ক্ষেত্রেই ব্যভিচারে মত্ত থাকতেন। স্ত্রীর মানসিক ক্লেশের অন্ত থাকত না।"

রাজা রামমোহনের এই বিবরণ থেকে তখনকার সমাজের একটা দিকের ছবি পাওয়া গেলো। সমাজের অন্য দিকটাও কম দুর্বহ ছিল না।

মুসলমান আমল থেকে চলে এসেছিল পর্দাপ্রথা। নারী ঘরের বাইরে বের হ'তে পারবেন না। তাঁরা অসূর্যম্পশ্যা। গঙ্গাস্নান করতে হলেও মেয়েদের পাল্কি শুদ্ধ চুবিয়ে আনা হ'ত।

তখন বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল সর্বব্যাপী। শিশুবয়েস পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে তাদের পরিবারের একঘরে ক'রে রাখা হ'ত। ঐ শিশুবিবাহকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বলা হত গৌরীদান। পর্দাপ্রথা ও গৌরীদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে আসে অশিক্ষা। বলা হ'ত স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। তাদের লেখাপড়া শেখা পাপ।

অতএব মেয়েরা রইলেন নিরক্ষর, কুসংস্করাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও মূর্খ। বলির পশুর মতো তাদের জীবন। স্মৃতিকার বলে দিলেন, তাঁদের কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নেই; পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে তাঁদের থাকতেই হবে। তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা নেই, সম্পত্তিতে অধিকার নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরম্ভ করে সমগ্র শতাব্দী ব্যাপী এই শোচনীয় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে। এই সমাজ বিপ্লবের কাহিনীর অতিসংক্ষেপে একটু আভাস দেওয়া যেতে পারে।

সেই কোন্ প্রাচীনকালে কী কারণে যেন ভারতে সতীদাহ নাম দিয়ে নারীবলি শুরু হয়েছিল। অবশ্য সব নারীই সতীদাহ হ'তেন এমন নয়। কিন্তু ধর্মের নামে এই নারীবলি প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে, মৃত স্বামীর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হ'ত।

শোনা যায়, রাজা রামমোহনের ভ্রাতৃবধূকে সতীদাহ করা হয়েছিল, ক্ষুব্ধ আবেগে ছুটে এসেছিলেন তিনি নারীর জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দান করতে। পুস্তিকা লিখলেন 'সহমরণ ও অনুমরণ'। বহু বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সমাজে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বেণ্টিকের আমলে এই সতীদাহ প্রথা আইনদ্বারা বন্ধ হয়।

রাজা রামমোহনের পরে অর্বিভূত হন আর এক মহান সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্র্য পৌরুষ ও মানবতার মূর্ত প্রতীক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বাংলাদেশ কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, বিধবার বিবাহ দিতে হবে। শাস্ত্রে তার সমর্থন আছে। হিন্দুসমাজ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন প্রধানতঃ তিনজন মানবদরদী মহাত্মা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসু। তাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ২৬-জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৮২৯ সালের 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন' এবং ১৮৫৬ সালের 'বিধবা বিবাহ আইন' যুগ প্রবর্তনের দুই সন্ধিক্ষণ। রাজা রামমোহন নারীকে দিয়েছিলেন জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার। বিদ্যাসাগর নারীকে দিলেন আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার। নারীকে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই শুধু নন, আমরা পেয়েছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক প্রধান সমাজ-সংস্কারক-রূপে। এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তারপর মানবতার পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ শুধু নারীকেই নয়, সমগ্র জাতিকেই জড়নিদ্রা থেকে, হীনমন্যতা থেকে

জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) বিধবা বিবাহ দিতে অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, তাঁদের কেউ বিবাহ করতে রাজী নন। জাতিভেদ প্রথা অতি প্রবল। নিজের জাতির গণ্ডীর বাইরে যেতে কেউ রাজী নন। কেশবচন্দ্র বললেন, আমি অসবর্ণ-বিবাহ প্রবর্তন করব। বিবাহ বিবাহই। গণ্ডীর ভিতরে না হ'লে গণ্ডী পার হ'য়ে গিয়ে পরিধি বিস্তীর্ণ করতে হবে। আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। ব্রাহ্মসমাজের দান এখানে অবিস্মরণীয়। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭২ সালে 'সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট' অথবা 'তিন আইন'-এর বিবাহ বিধিবদ্ধ করালেন। জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি সেদিন হিন্দু সমাজকে টেনে নিয়ে চললো সামনের আলোক রশ্মির দিকে। তাঁরা সকল জাতির মধ্যে বিবাহের সুফল সমাজকে দেখাতে লাগলেন। এই তিন আইনে, বিবাহে জাতিভেদ নেই, বাল্যবিবাহ প্রায় নেই, বহু বিবাহ তো নেই-ই।

সেই অগ্রগতিই পূর্ণরূপ পেল ১৯৫৬ সালে 'হিন্দু-বিবাহ-আইন' ও 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন'-এ। এতদিনে স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের দেশের নারী বিবাহ ও সম্পত্তিতে অনেকখানি স্বাধিকার পেলেন।

আবার ফিরে যাই সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের যুগে। বিদ্যাসাগর দেখলেন, কেবলমাত্র সতীদাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হ'লেই চলবে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একান্ত প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি জনমনকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলবার জন্য প্রচারকার্যে ব্রতী হলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র মধ্য দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর দুই যুগ্ম সম্পাদক আনতে চাইলেন সমাজে প্রচণ্ড মানসিক বিপ্লব। নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ লেখা দিয়ে তাঁরা সমাজকে নাড়া দিতে চাইলেন, সাড়া জাগাতে চাইলেন।

নারী আন্দোলনের প্রবর্তক এই সব মনীষী উপলব্ধি করেন যে, নারীরা অগ্রণী হয়ে তাঁদের অধিকার বুঝে নেবার প্রচেষ্টায় নিজেরা আত্মনিয়োগ না করলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় সাধারণ ভাবে নারীজাতির শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার অভাবের জন্য নারীর মন কুসংস্কার মুক্ত নয়। তাই এই সব যুগ প্রবর্তক মনীষীগণ নারীশিক্ষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দিলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন 'বেথুনস্কুল'। রামগোপাল ঘোষ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের স্বাধীন স্বত্ত্বা গড়ে উঠবে এই আশঙ্কায় বিরুদ্ধবাদীরা চীৎকার করতে লাগলেন—মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে, জাত যাবে। কুসংস্কারের এই কঠিন

পরিবেশের মধ্যেও কয়েকজন মহাপুরুষ ছিলেন নিজ সংকল্পে অটল।

সর্বপ্রথম যাঁরা বেথুন স্কুলে নিজের মেয়েদের স্বেচ্ছায় ও আনন্দে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর দুটি মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দবালা দেবীকে তিনি 'বেথুনস্কুল' প্রতিষ্ঠা হবার প্রথমদিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (১৮৪৯)। কিছুদিনের মধ্যেই মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হয়। উইল করে তিনি ত্রিশ হাজার টাকা ও নিজের গাড়ী ঘোড়া এই স্কুলকে দান করে যান।

১৮৬২ সালে দেখা যায়, ১৫-টি স্কুল বেথুন স্কুলের অনুকরণে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; ছাত্রী সংখ্যা ৫৩০ জন।

নারীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে এসে যোগ দেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন আরম্ভ হয় 'অন্তঃপুর শিক্ষা-'র (১৮৬২-৬৩)। অন্তঃপুরে গিয়ে বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র বেথুন স্কুল ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নারীশিক্ষা প্রচার এবং সমাজ সংস্কার করবার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও প্রাণপণ প্রচেষ্ঠায় কুসংস্কারের বদ্ধমুষ্ঠির উপর ক্রমাগত চাপ ও আঘাত পড়তে থাকে, ফলে বজ্রমুষ্ঠির কাঠিন্য ক্রমেই শিথিল হয়ে এল। তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করছি ঃ—

(১) সমাজোন্নয়ন বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪), (২) সর্বশুভকারী-সভা (১৮৫০), (৩) ব্রাহ্মবন্ধুসভা (১৮৬২), (৪) বামবোধিনীসভা ও পত্রিকা (১৮৬৩, ১৮৬৪), (৫) ভিক্টোরিয়া স্কুল, (১৮৮২), (৬) ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় (১৮৯০), (৭) নিবেদিতা বিদ্যালয় (১৯০৩) ইত্যাদি।

এসময়ে নারী শিক্ষায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দানও কম নয়। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় এক একটি করে সমিতি গড়ে ওঠে এবং নারীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতিব জন্য অক্লান্ত কাজ করে। সাধারণ ঘরের হিন্দুরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াতে ও উচ্চশিক্ষা দিতে সাহস করতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সগৌরবে আপন শক্তি. যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৮ সালের ২৭-এপিল ইউনির্ভাসিটির সেনেটে এই নিয়ম প্রবর্তন করা হয় যে, ছাত্রীরাও ইউনির্ভাসিটি পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পাবার এক বিরাট বাধা দূর হয়ে যায়। বেথুন স্কুল সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হয়। বেথুন স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম বিভাগের নম্বর থেকে মাত্র একনম্বর কম পান

তিনি। তাঁর আরো বেশী অধ্যয়ন করবার স্পৃহা জাগে। গর্ভণমেণ্ট বেথুন স্কুলে কলেজ ক্লাস খুললেন। ১৮৮০ সালে অবলা দাস (লেডি বসু) এন্ট্রান্স পাস করে স্কলারশিপ পান। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়বার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত দিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তীব্র আপত্তি জানালেন এবং প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি এবার একটি উদার দৃষ্টির পরিচয় দেয় তাঁকে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়বার অনুমতি দিয়ে।

বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম বি. এ. পাস করেন। এই বছরই ব্রাহ্মনেতা দ্বারিক গাঙ্গুলীর সঙ্গে কাদম্বিনী বসুর বিবাহ হয়। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়বার অনুমতি চাইলেন। ১৮৮৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এক প্রস্তাব পাস ক'রে তাঁকে অনুমতি দেন। তিনিই এখানকার প্রথম ছাত্রী। তাঁর পরে আসেন বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মিত্র। শ্রীমতী মিত্র ১৮৮৮ সালে মেডিকেল কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করেন। নারী ধীরে ধীরে আপন সুপ্ত শক্তি প্রকাশ করতে থাকে।

১৮৯০ সালে তিনটি মেয়ে ইংরাজী বিষয়ে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। তাঁদের মধ্যে সরলা ঘোষাল (দেবী চৌধুরানী) ছিলেন অন্যতম। রাজনীতির বীজ তখন সুপ্ত ছিল এই মহিয়সী নারীর মধ্যে। পরবর্তী জীবনে এই নারী সমগ্রজাতিকে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলেন। নারীশিক্ষা প্রসার একদিকে যেমন ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে অন্য দিকে তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) খ্রীঃ, এবং সমগ্র ঠাকুর পরিবারের দান বাংলাদেশের নারী সমাজকে অনেকখানি অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলছিল। ঠাকুর পরিবার পাশ্চাত্যের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির। তাঁরা নারীকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে সুখী ছিলেন না। তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নারীকে পুরুষের সমান স্তরে উঠিয়ে এনে, আনন্দের সমান অংশ দিতে, জীবনে মানুষের যোগ্য হয়ে বেঁচে থাকবার ও বিকাশ লাভ করবার প্রেরণা দিতে চাইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্রকন্যা ও বধূগণ এই আন্দোলনকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছিলেন।

যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও বধূদের গঙ্গাস্নান করতে হলেও পাল্‌কি শুদ্ধ গঙ্গায় চুবিয়ে আনা হ'ত, সেই ঠাকুর পরিবারের বৌ হয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) বহু বিঘ্ন পার হয়ে বিলাত যান। পাল্‌কিতে ক'রেই তাঁকে জাহাজ পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল। বাঙালী মেয়েদের তখনকার দিনের পোষাক ছিল কেবল একটি মাত্র শাড়ী। সত্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন ঐ পোষাকে ভদ্রসমাজে যাওয়া যায় না। স্বামীর অনুরোধে ও আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

গুজরাটী মহিলাদের অনুকরণে সভ্য ও সুন্দর পরিচ্ছদ প'রে দেশে ফিরলেন। 'দেশীয়তা, শোভনতা ও শালীনতা' এল বাঙালী নারীর পোষাকে।

এই পরিবারের বধূরা লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। অবরোধপ্রথা অতি ধীরে ধীরে অপসৃত হ'তে আরম্ভ করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন "শত শত ইংরেজ মহিলার মধ্যে গিয়ে প্রকাশ্যস্থলে বসতেন" তখন ঐ পরিবারেরই গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিরা রাগে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়তেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যখন দু'টি আরবী ঘোড়ায় চ'ড়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন তখন পথের দু'ধারে লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো।

ঠাকুর পরিবারের মধ্যে নারী জাগরণের যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তারই তরঙ্গমালা এই পরিবারের সীমা অতিক্রম ক'রে দুই কূল ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে।

এভাবে কঠিন প্রয়াসে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণের ধারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, যদিও সে-গতি তখনও সতর্ক, ধীর, ও বিলম্বিত। পাশ্চাত্য ভাবধারা, জাতীয়তা-বোধ একতা এবং জাতীয় উত্থানের আকাঙ্ক্ষা নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর মনে জেগে উঠতে থাকে। একই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় পাশ্চাত্য সমাজে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করে ফিরে এলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক প্রেরণা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটি সামান্যতম মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত। এই প্রচণ্ড আত্মত্যাগের প্রেরণা, তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য আকুল আহ্বান দেশটাকে সেদিন প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল। নব-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ নারীও সেই জাগরণে সাড়া দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে-ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী তখন শেষ প্রান্তে। কিন্তু পর্দার প্রচণ্ড বাধা তখনও তাকে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে, তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। উচ্চ-শিক্ষার প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে নারীরা ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রচেষ্টায় কঠিন লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলে দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতার বিজয় অভিযানে যোগদান করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কার ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল। শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে নারী-প্রগতি যতই বিস্তৃতি লাভ করে ততই নারীসমাজ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। তাঁদের মধ্য থেকে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকাশিত হয় রাজনৈতিকগগনেও। পরাধীনতার কলঙ্ককালিমা দেশ মাতৃকার ললাট থেকে মুছে ফেলে তাঁরাও কৃচ্ছসাধনায় যোগদান করতে

থাকেন অধিক সংখ্যায়। মানসিক ও সামাজিক বিপ্লবের সুযোগ পেয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে বেরিয়ে এলেন প্রথম নারী, প্রতিভাশালিনী সরলাদেবী চৌধুরানী। কেবলমাত্র নারীমহলে নন, সমগ্র জাতিরই তিনি সেদিন একজন অগ্নিবাহিনী নেত্রী।

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও দেশপ্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিতা ভগিনী নিবেদিতা এসে যোগদান করলেন অরবিন্দের বিপ্লবী দলে ১৯০৩-এ। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে তাঁর অমূল্যদান চিরস্মরণীয়। প্রতিভা ও হৃদয়ের সমন্বয়ে অপূর্ব তেজময়ী এই নারী। ১৯০২-এর জুলাই মাসে স্বামীজীর তিরোধানের পর নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন "সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ" ছিলেন তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রচার করতে। গুরুর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে এই পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করার প্রয়াসের ভিতর অসামান্য কীর্তি রেখে গেছেন নিবেদিতা। তার সঙ্গে পরিচয় হয় ঠাকুরবাড়ীর সরলাদেবী ও বালিগঞ্জের কয়েকজন ইংরেজ শাসনে অসহিষ্ণু তেজস্বী লোকের সঙ্গে। এরমধ্যে থেকে একটা গুপ্তসমিতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তাতে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র এবং নিবেদিতা সংযুক্ত ছিলেন। সরলাদেবীর শরীর চর্চার কেন্দ্র ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর শক্তি, সাহস ও বীর্য সংগঠনের উদ্দেশ্যে তিনি যখন বোম্বাই-এ তাঁর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথঠাকুরের কাছে যান তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে অরবিন্দের পরিচয় ঘটে।

১৯০২-এর শেষের দিকে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেন সরলাদেবীর কাছে যাতে সরলাদেবী তাঁকে গুপ্তসমিতি স্থাপনে সহায়তা করেন। সরলাদেবী একাজ করেছিলেন। কলকাতায় এসে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের পরিচয় হয়। বহু পত্রিকা ও কাগজে নিবেদিতা জ্বলন্ত ভাষায় প্রবন্ধ লিখে ইংরেজ বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ১৯০৫-এর ২০ জুলাই জানা যায় যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে অনুমোদন করেছে। ১৬-অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়। হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সহ সুরেন্দ্রনাথের আবেদনপত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের আগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত বাংলাদেশ ক্ষেপে উঠল। নেতারা বিদেশী জিনিস বর্জন ও স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করতে জাতিকে আহ্বান করেন। স্বদেশী আন্দোলনে শহর থেকে গ্রামের মধ্যে বিস্তারলাভ করে।

অরবিন্দের গুপ্তসমিতি কাজ করে চলে। নিবেদিতার বাগবাজারের বাসা তখন গুপ্তসমিতির একটি কেন্দ্র। ছেলেদের শোনাচ্ছেন তিনি বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান ঃ "তোমার দেবতা চায় আজ তোমার জীবন বলি, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার জননী জন্মভূমি।"

এই বিপ্লবের আহ্বানে তরুণদল উৎসাহে সাড়া দিয়ে উঠলো। ওদিকে স্বদেশী পণ্য উৎপাদনের জোয়ার এলো। ১৯০৫-এ বিপিন পালের চরমপন্থী প্রতিষ্ঠান 'স্বদেশী মণ্ডলী' স্থাপিত হয়। এ-বছরের ডিসেম্বরে প্রিন্স-অব-ওয়েলস (পরে রাজা পঞ্চম জর্জ) কলকাতায় আসেন, তার পূর্বেই স্বদেশী মণ্ডলী তাঁর অভিনন্দন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬-এ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ঘটনা-স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চলল। ১৯০৬-এর মার্চ মাসে কলকাতার বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯০৬ এর ১৪ এপ্রিল বরিশাল সম্মেলনে অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করলেন ছোটলাট ফুলারের দমননীতির প্রচণ্ডরূপ। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তোলার অপরাধে চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে পুলিশ নির্দয় ভাবে প্রহার করে এবং পুলিসের অত্যাচারে সম্মেলন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বরিশাল থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ নিবেদিতার কাছে নিজের সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলেন। ফুলার হত্যার আয়োজন চলে যুগান্তরের আড্ডায়; অরবিন্দ প্রবন্ধ লিখে চলেন সক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরম্' কাগজে।

১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সুরাটে কংগ্রেস দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। এ বছরেরই জুলাই মাসে 'যুগান্তর'-এর একটির প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। নিবেদিতার উপর পুলিশের কড়া নজর লক্ষ্য ক'রে তাঁর হিতৈষীগণ তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে গেলে দেশের কাজ কিছু করতে পারবেন না; বরং কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে গেলে, সেখান থেকেও এদেশের জন্য অনেক কাজ তিনি করতে পারবেন। এই কথানুসারে নিজের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'বছরে জন্য নিবেদিতা ১৯০৭-এর আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯০৯-এর জুলাই মাসে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন। তাঁর কলকাতায় আসবার কিছুদিন আগেই অরবিন্দ মুক্তি পান। ১৯০৯-এর ১৯-জুন অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১০-এ তিনি এ-পত্রিকার সমস্তভার নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে চলে যান চন্দননগরে। ১৯১১-নিবেদিতার মৃত্যু হয়।

অগ্নিযুগের অধ্যায় ১৯২১-এর আগে পর্যন্ত। ১৯২১-এ হয় অসহযোগ আন্দোলন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারীর যোগসূত্র ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে। ১৮৮৫-তে যে জাতীয় কংগ্রেস জন্ম নেয়, ১৮৮৯-এর বোম্বাই অধিবেশনে সর্বপ্রথম ভারতীয় নারী যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে যান ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৯০ সালের কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিকে একটি বক্তৃতা দিয়ে ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী প্রচার ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রচারের চেষ্টা করেন। বহুদিন তিনি 'ভারতী' এবং 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। এই পত্রিকার মধ্যদিয়ে এবং তাঁর 'সখি-সমিতির'-র সহায়তায় তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা দিতেন। ১৯২১-এ গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিলাতী জিনিস বর্জন এবং খদ্দর ও অন্যান্য স্বদেশী জিনিসের মধ্য দিয়ে নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া। মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক গণআন্দোলন ভারতীয় নারী জাগৃতির ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধি।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর করেছিলেন নারী শৃঙ্খল মোচনের সূচনা। গান্ধীজীর দীক্ষায় নারী এবার জাতির কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিয়ে একসাথে চলতে প্রেরণা লাভ করেন। ১৯২১-এর এই অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে যে সমস্ত নারী প্রথম অগ্রণী হয়ে দেশ সেবার কাজে জনগণের মধ্যে নেমে এসে কারাবরণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী উর্মিলাদেবী। নারীদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল, শুধু তাই নয়, কাতারে কাতারে তরুণ কর্মীর দল এ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জেলখানা ভরে ফেললেন।

১৯২৮-এ এল সাইমন কমিশন। গান্ধীজী ও কংগ্রেস-এ কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। এর কারণ, এর মধ্যে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না। শুরু হল 'সাইমন ফিরে যাও' আন্দোলন। মেয়েদের মধ্যেও দারুণ বিক্ষোভ জেগে ওঠে। এ-বছরেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস অধিবেশন। অরবিন্দের দাদা কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষ এবং তরু সেন এগিয়ে আসেন, মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার কাজ করতে থাকেন। লতিকা ঘোষ যে কেবল সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজের হরতালে অংশগ্রহণ করেন তাই নয়, সংগঠনের একটা বিরাট দায়িত্বও তাঁর উপর ছিল। তিনি সে বছরের কংগ্রেসে নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ভারপ্রাপ্তা ছিলেন। সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁর অধীনে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সমান পদক্ষেপে সেদিন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেসমণ্ডপ পর্যন্ত মার্চ ক'রে চলেছিল। প্রকাশ্য রাস্তায় এসে জনসাধারণের সামনে দিয়ে এমনভাবে মার্চ করে চলে যাওয়া তখনকার দিনে ছিল নারীর পক্ষে একটা অসীম দুঃসাহসের কাজ।

নারী জাগরণের ফল্গু নদী এবার আত্মবিশ্বাস ও স্পর্ধা নিয়ে বাইরে এসে সর্বসমক্ষে বয়ে যেতে শুরু করেছে, যদিও গতি তার তখনো ততটা দ্রুত নয়। মেয়েরা

একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল জনসেবার কাজে। তাঁরা ঘরের কাজও করতেন, লেখাপড়াও শিখতেন, আবার ঘরের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতেন। কংগ্রেসের ঐ স্বেচ্ছাসেবিকাদল নিজেদের পশ্চাতে দলে দলে কর্মী মেয়েদের আহ্বান জানিয়ে দলের বিস্তার বৃদ্ধি করতে লাগল। ১৯২৮-এ কলকাতায় কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) 'ছাত্রীসংঘ' প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তোলার প্রয়াস পান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঢাকাতে লীলানাগ এর আগে থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন কাজের মধ্যদিয়ে মেয়েদের সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৩০-এ আরম্ভ হয় লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন, স্বয়ং গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযান করেন। মেয়েদের কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সংগঠিত হয়। মেয়েরা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এবং আইন অমান্য করে দলে দলে কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান বহু মহিলাকে দলে দলে আইন অমান্য করতে এগিয়ে দেয়। কাতারে কাতারে মহিলা কর্মী মহা উৎসাহে কারাবরণ করেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর অহিংস আন্দোলনে যেমন সত্যাগ্রহী নারীরা বহুসংখ্যায় যোগদান করেন, তেমনি অনেক বিপ্লবী মেয়েরাও ১৯৩০ থেকে সর্বস্বত্যাগ ক'রে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। ১৯৩০-এর ২৫ আগষ্ট কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্ট-এর উপর বোমা পড়ে। বিপ্লবী মেয়েদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। কলকাতার বীণাদাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলী করেন। ১৯৩৮-এ গুপ্তসমিতি ভেঙে যায়। এরই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সন্তোষকুমারী গুপ্তা সর্বপ্রথম ১৯২৬-এ শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। এরপর ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা নেতৃত্ব দেন কলকাতার বিখ্যাত মেথর ধর্মঘটের। আরো পরে বীণাদাস, সুধারায়, মৈত্রেয়ী বসু প্রমুখ এগিয়ে আসেন। ১৯৪২-এ স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে এসে সহিংস ও অহিংস বিপ্লবীরা মিলেছিলেন এক স্রোতধারায়।

কলকাতার নারী সত্যাগ্রহ সমিতি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রথমদিকে খুব সীমাবদ্ধ হ'লেও সংগ্রাম যতই জাগরণের মধ্যে প্রসার লাভ করে ততই অধিক সংখ্যায় তাঁরা সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময়ে প্রথম অগ্নিযুগের এবং ১৯১৪-র দ্বিতীয় অগ্নিযুগের কৃচ্ছ্রসাধনায় অতি অল্পসংখ্যক নারী সহায়তা করলেও তার প্রভাব কম ছিল না। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে যখন বাসন্তী দেবী, উর্মিলাদেবী প্রমুখের প্রেরণায় নারী বাইরে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন দেখা গেল এই অপেক্ষাকৃত সরলপথে দেশসেবা করতে অনেক নারী সহজেই প্রস্তুত। ধীরে ধীরে নারী জাগবণ বেগবান হ'তে থাকে। ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এ এই জাগরণের বন্যা কূল ছাপিয়ে ক্রমশই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর আহ্বানে সাধারণ নারী কাতারে কাতায়ে বেরিয়ে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯৩০-এ গান্ধীজী নারীকে অহিংসা আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক যোগ্য বলে আখ্যা দেন। তাঁদের তিনি বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান করেন। ভারতের নারী শত শত বছরের জড়তা কাটিয়ে জেগে ওঠে। ১৯৩০-এর ১৩-মার্চ বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস নেত্রী কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের বাইরে ছিল, সমিতির সভানেত্রী ছিলেন উর্মিলা দেবী, সহকারী সভানেত্রী মোহিনী দেবী ; জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নিস্তারিণী দেবী, অলোকলতা দাস এবং হেমপ্রভা দাসগুপ্তা। যুগ্ম সম্পাদক শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী ; সমিতির সদস্যা—ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, সরলাবালা সরকার, অম্বালিকা দেবী, জ্যোৎস্না মিত্র, সজ্জন দেবী, মানস নলিনী দেবী, প্রীতি দাস, সুষমা দাসগুপ্তা প্রমুখ। সমিতিতে যোগদান করেন বহু বাঙালী, গুজরাটী, মারোয়ারী, পাঞ্জাবী, উত্তরপ্রদেশী, বিহারী প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রদেশীয় মহিলা সত্যাগ্রহ ক'রে বন্দীজীবন যাপন করেন। অবাঙালী মহিলাগণ প্রধানত ছিলেন কলকাতা নিবাসী।

সমিতির কার্যধারা ছিল সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালিত করা, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে এবং মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করা। বড় বাজারের সদাসুখকাটরা, মনোহর দাস কাটরা, পচাগলি, সূতাপটী, গ্র্যান্টস্ট্রীট, চাঁদনী, ক্রসস্ট্রীট, বৌবাজার, নিউমার্কেট প্রভৃতিতে বস্ত্রের দোকানের সামনে তাঁরা পিকেটিং

করতেন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পুলিসের কড়া দৃষ্টির সামনে। পুলিস তাঁদের দলে দলে গ্রেপ্তার ক'রে ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যেতো। পুলিসের ভ্যান সবসময়েই বড়বাজারে মজুত থাকত গ্রেপ্তার করার জন্য। কিন্তু পুলিস ও মিলিটারীর ভয় দেখিয়ে নারীদের নিরস্ত করা যায়নি। পুলিস যতই কঠিন শাস্তি দিয়েছে, নারীরা ততই মরিয়া হয়ে আরো দলে দলে এগিয়ে এসেছেন।

শোভাযাত্রার একদিনের ঘটনা—১৯৩০-এর ২২ জুন দেশবন্ধুর বার্ষিক শ্রদ্ধাতিথি দিবসে সমস্ত কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারী ছিল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। শোভাযাত্রা চলছিল কলেজস্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত। অসংখ্য পুলিস, সার্জেণ্ট ও ঘোড়সওয়ার বেষ্টিত বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতা শহরের বুকের উপর নারী তখন রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ ক'রে সত্যাগ্রহীদের পদদলিত করতে উদ্যত ঘোড়াকে রুখেছেন তার লাগাম ধ'রে ঝুলে পড়ে ; আলুথালু কেশ তাদের খুলে পড়েছে, দেহমনের অসীম শক্তি যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। পুলিশের নির্মম অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে সবিক্রমে আটকাচ্ছেন তাঁরা পুলিসের লাঠিকে, ঘোড়াকে ও বেটনকে, ঘোড়সওয়ার পুলিস ও সার্জেণ্ট এমন অত্যাচারের নির্মমতা সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল দেশবন্ধু পার্কে। সেখানেও পার্ক ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে বৃটিশ শক্তি।

জীবন তুচ্ছ ক'রে অগণিত নরনারী সেদিন ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে পার্কের ভিতর প্রবেশ করেছিল জলস্রোতের মতো। সার্জেণ্ট, ঘোড়সওয়ার ও পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের উপর। নারী সেদিন অকুতোভয়ে কখনো ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছেন, কখনো শুয়ে পড়ে ঘোড়ার অগ্রগতি ব্যর্থ করেছেন, কখনো পুলিসের বেটনে আহত হয়েছেন। এভাবে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত জনসমুদ্রের সামনে বক্তাগণ বক্তৃতা দিতে থাকেন। সভানেত্রী উর্মিলা দেবী তাঁর বক্তৃতায় দেশবন্ধুর জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করেন। এভাবেই এই সমিতি নানান কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। তদানীন্তন সময়ে কলকাতার এই সমিতির মধ্যে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে ছিলেন তাঁরা হলেন—সরলাদেবী চৌধুরানী, বাসন্তী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, উর্মিলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, শান্তি দাস, বিমলা প্রতিভা দেবী, ইন্দুমতি গোয়েঙ্কা, কল্যাণী দাস, শশীবালা দেবী, শান্তিঘোষ, বীণাদাস, কল্পনা যোশী, উজ্জ্বলা রক্ষিত, পারুল ও উষা মুখার্জী, শোভারাণী দত্ত, রেনু সেন, হেলেনা দত্ত, আভা দে, সুলতা মিত্র, ইলা সেন, সুরমা মুখোপাধ্যায়, বেলা মিত্র, বনলতা সেন, নির্মলা রায় ও সুষমা রায়, সরযূ গুপ্তা,

মীরা দাশগুপ্তা, বগলাসুন্দরী সোম, কমলা দাস, মায়াদেবী, চামেলী দেবী গুপ্তা, করুণা ঘোষ (সাহা) প্রমুখ।

নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩০-এর লবণ আইন অমান্য এবং ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাবরণ করেন। **কলকাতা জেলা** (১৯৩০-সালের লবণ আইন অমান্য)—

(১) নির্ঝরিনী সরকার — (২) সরোজ বাসিনী সাহা
(৩) ছায়া রানী দেবী — (৪) সুরুচি গুহরায়
(৫) পুষ্প নন্দী — (৬) লাবণ্য মিত্র
(৭) সুন্দরী দেবী — (৮) গঙ্গা দেবী
(৯) কিষেণ দেবী — (১০) দেশকালী ছেত্রিনী
(১১) নারায়ণী কাউর — (১২) মলিনা গুপ্ত
(১৩) সরযূবালা সেন — (১৪) শোভনা রায়
(১৫) সুবর্ণ সেন — (১৬) গিরিবালা রায়
(১৭) কণকলতা দাস — (১৮) শতদলবাসিনী দত্ত
(১৯) নন্দরানী ধর — (২০) উজ্জয়িনী দেবী
(২১) ইন্দুবালা দেবী — (২২) দয়াকুল দেবী
(২৩) আরতী মুখোপাধ্যায় — (২৪) সুনীতি দাস
(২৫) হিরন্ময়ী ঘোষ — (২৬) শেখর বাসিনী সাহা
(২৭) মায়া নন্দী — (২৮) গোদাবরী সেন
(২৯) ওয়াজিয়া বাই — (৩০) সুপ্রভা দেবী
(৩১) তারা দেবী — (৩২) ভগবান দেবী
(৩৩) যশোদা দেবী — (৩৪) লীলাবতী দেবী
(৩৫) যমুনা বাই — (৩৬) পুষ্প বাই
(৩৭) প্রমীলা বাই — (৩৮) প্রিয়ম্বদা দেবী
(৩৯) শৈলবালা দেবী — (৪০) সরযূ দেবী
(৪১) কুন্দরানী সুরিতা — (৪২) সুরমা মুখোপাধ্যায়
(৪৩) সুষমা মুখোপাধ্যায় — (৪৪) কমলা বিশ্বাস
(৪৫) মথুরা বাই — (৪৬) সন্তোষ বাসিনী গুহ
(৪৭) সোহম্ দেবী — (৪৮) বিন্দুবালা দেবী
(৪৯) শান্তবালা দেবী — (৫০) ক্ষীরোদ সুন্দরী দাসী
(৫১) মনোরমা দাসী — (৫২) অম্বালিকা রায়
(৫৩) মানদা সেন — (৫৪) সরলা চক্রবর্ত্তী
(৫৫) শিউবাসিনী গুহরায় — (৫৬) শান্তা দেবী

(৫৭) লাবণ্যপ্রভা দেবী
(৫৮) চপলা সেন
(৫৯) অম্বা জান
(৬০) দুর্গাবতী দাশগুপ্তা
(৬১) কুন্দ মিত্র
(৬২) প্রীতিলতা দাস
(৬৩) সরলা সরকার
(৬৪) সরস্বতী দাসগুপ্তা (মিত্র)
(৬৫) অরুণা দাসগুপ্তা
(৬৬) অমিতা দত্ত
(৬৭) সরযূবালা দত্ত
(৬৮) আভা দে
(৬৯) ছায়া চট্টোপাধ্যায়
(৭০) পুষ্পরানী নন্দী
(৭১) সুরুচি সিংহরায়
(৭২) সরযূ সেন
(৭৩) সীতা ঘোষ
(৭৪) লক্ষ্মীমণি দেবী
(৭৫) বসন্ত বেন
(৭৬) যমুনা বেন
(৭৭) রতন দেবী জেঠী
(৭৮) লক্ষ্মীদেবী কাপুর
(৭৯) লক্ষ্মীদেবী শর্মা
(৮০) গঙ্গাদেবী মেহতা
(৮১) কৌশল্যা বেন
(৮২) যজ্ঞেশ্বরী দেবী
(৮৩) কৃষ্ণা দেবী
(৮৪) দেওকালী দেবী
(৮৫) সুন্দর বাই
(৮৬) শান্তা বেন
(৮৭) প্রমীলা বেন
(৮৮) পুষ্পবতী বেন
(৮৯) সরস্বতী গুপ্তা
(৯০) সজ্জনদেবী মহনোত
(৯১) শ্রীমতী মহনোত

কলকাতা (১৯৩২) সালের আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেন—

(১) জ্যোৎস্না মিত্র
(২) গিরিজাবালা দত্ত
(৩) রমা দেবী
(৪) কুমুদিনী দাসী
(৫) ব্রিজরানী দেবী
(৬) কৃষ্ণা মিত্র
(৭) রুক্মিণী বেন
(৮) হরি বেন
(৯) বাচ্চু বেন
(১০) সরলাবালা দেবী
(১১) রামকুমারী বেন
(১২) লক্ষ্মী আচার্য্য
(১৩) বিভা দত্ত
(১৪) অনিতা দত্ত
(১৫) বিভাবতী দাসগুপ্তা
(১৬) কৌশল্যা দেবী
(১৭) লক্ষ্মী দেবী
(১৮) সজ্জন দেবী
(১৯) বাসন্তী দেবী
(২০) বীণাপাণি পাল
(২১) শীতলা কুমারী দেবী
(২২) গোদাবরী দেবী
(২৩) পদ্মাবতী দেবী
(২৪) সুভদ্রা দেবী
(২৫) প্রভাবতী দেবী
(২৬) হীরামন বিবি

(২৭)	হাজিমন্নোতা খাতুন	(২৮)	সুলতা রায়
(২৯)	সান্তনা রায়	(৩০)	আভারঙ্গী দেবী
(৩১)	বিনোদিনী ঘোষ	(৩২)	উজ্জম বেন
(৩৩)	শৈলবালা ঘোষ	(৩৪)	গৌরী দেবী
(৩৫)	রাজেশ্বরী দেবী	(৩৬)	প্রভাবতী সরকার
(৩৭)	কুঞ্জরানী দাসী	(৩৮)	হোসেন্নেসা বেগম
(৩৯)	চন্দ্রবতী দেবী	(৪০)	নলিনী বালা মাইতি
(৪১)	প্রীতিলতা ঘোষ	(৪২)	মুন্নী দেবী
(৪৩)	অনা দেবী	(৪৪)	কলালক্ষ্মী ঘোষ
(৪৫)	নলিনী প্রকাশ ঘোষ	(৪৬)	সরযূ দেবী
(৪৭)	গঙ্গাদেবী ক্ষেত্রী	(৪৮)	কমলা রায়
(৪৯)	বীণাপাণি সরকার	(৫০)	চপলাবালা সেন
(৫১)	সুনীতা বালা দাশগুপ্তা	(৫২)	সরোজিনী মিত্র
(৫৩)	রাধারানী দে	(৫৪)	সুধারানী দে
(৫৫)	অনিমা ভট্টাচার্য	(৫৬)	বীণা দাশগুপ্তা
(৫৭)	শান্তি নিয়োগী	(৫৮)	যামিনীসুন্দরী দাসী
(৫৯)	তারা দেবী খান্না	(৬০)	সরোজিনী সেন
(৬১)	সত্যবালা দাসী	(৬২)	যশোদাবালা মল্লিক
(৬৩)	কুমুদিনী মিত্র	(৬৪)	রাধারানী দেবী
(৬৫)	ইন্দুবালা দত্ত	(৬৬)	কমলিনী দেবী
(৬৭)	এলোকেশী দাস	(৬৮)	বীণাপাণী গোস্বামী
(৬৯)	দনুজদলনী গোস্বামী	(৭০)	পরিতোষ বালা দেবী
(৭১)	কুশাঙ্গিনী বরাই	(৭২)	সুশীলাবালা দেবী
(৭৩)	ননীবালা দেবী	(৭৪)	লীলাবতী কাপুর
(৭৫)	দক্ষবালা দেবী	(৭৬)	মতিবালা দেবী
(৭৭)	মলিনা দেবী	(৭৮)	পদ্মাদেবী
(৭৯)	শহীদা খান	(৮০)	কমলিনী সরকার
(৮১)	বীণাপাণি দেতু	(৮২)	তারাদেবী বিদুষী
(৮৩)	কমলরানী সরকার	(৮৪)	প্রভাবতী দে সরকার
(৮৫)	শৈবালিনী দেবী	(৮৬)	হোসেনারা বেগম

এ-আলোচনাকে গুটিয়ে আনবার আগে কয়েকজন মহিলা কর্মীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখব যাঁরা কলকাতার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নারীকর্মী—

(১) **আভা দে**—১৯৩০-এ নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান ক'রে দণ্ডিত হন এবং প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকেন। কারাদণ্ড ভোগকরে ১৯৩০-এর নভেম্বরে মুক্তি পান। ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ২৬-এ জানুয়ারী মনুমেণ্টের তলায় স্বাধীনতা দিবস পালনের পতাকা উত্তোলন করার সময় গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে কল্যাণী দাসের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বিপ্লবী কাজ করার সময় বহু বে-আইনী জিনিস ও অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। সেগুলি লুকিয়ে রাখবার বিরাট দায়িত্ব তিনি সগর্বে বহন করেছেন।

(২) **আভা মজুমদার**—১৯৪২-এ কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করাতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হন।

(৩) **ইলা সেন**—১৯২৯-এ কল্যাণী দাসের 'ছাত্রী সংঘের' সভ্য হন এবং তখন থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বাধীনতা দিবস পালন, রাজনৈতিক সভা ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এ নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র পক্ষ থেকে বড় বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করেন, অর্ডিনান্সের বিরোধিতা ক'রে সভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এ জেলে সতীন সেন প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিস কমিশনার টেগার্টের প্রহারের প্রতিবাদে জেলে অনশন করেন। ১৯৪৫-এ অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সে যোগদান ক'রেন, এবং দক্ষিণ কলকাতা শাখার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৬-এ কলকাতার দাঙ্গায় পীড়িতদের উদ্ধার কার্যে অংশগ্রহণ করেন।

(৪) **ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা**—জন্ম ১৯১৪-এ কলকাতায়। ১৯৩০-এর 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতির' পরিচালনায় আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। ১৯৩০-এর ২৪-জুন ন'মাসের জন্য গ্রেপ্তার হন।

(৫) **উজ্জ্বলা মজুমদার**—১৯৩০-এ গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৯-এ গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় মুক্তি পান। ১৯৪২-এ শুরু হয় শেষ জাতীয় সংগ্রাম 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। এ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্তি পেয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠনে অগ্রসর হন।

(৬) **কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)**—১৯২৮-এ 'ছাত্রীসংঘ' সংগঠনে যোগ দেন। এর সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র, সম্পাদক কল্যাণী দাস। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

(৭) **করুণা ঘোষ (সাহা)**—১৯৪২এ-এ কংগ্রেসের 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' যোগ দেন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হন।

(৮) **কমলা দাস**—১৯৩০-এ নিজের বাড়ীতে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়

দিতেন ও অন্যভাবে সাহায্য করতেন। ডালহাউসি স্কোয়ারের বোমার ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়।

(৯) **চামেলী দেবী গুপ্তা**—১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে কলকতার 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'-তে যোগদান ক'রে সভা ও শোভাযাত্রা, পিকেটিং করেন। জেলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেলে, সরকার প্রস্তাব করে, বণ্ড লিখে দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে, কিন্তু এ-প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন না। শরীর তাঁর ক্রমশঃ এত খারাপ হয়ে যায় যে, সরকার বাধ্য হয়ে অবশেষে তাঁকে বিনা শর্তেই মুক্তি দেয়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তিনি মারা যান।

(১০) **ছায়াগুহ**—১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের আহ্বানে নিষিদ্ধ সভা সমিতিতে যোগদান করতে থাকেন। ১৯৪২-এর ১৫ই আগষ্ট নিরাপত্তা বন্দীরূপে কারারুদ্ধ হলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। ১৯৪৫-এ মুক্তি পান। জেলখানার বন্দীদের মাতিয়ে রাখতেন তাঁর প্রাণ স্পর্শকরা গানে।

(১১) **বনলতা সেন**—১৯৩৭ থেকে 'বন্দীমুক্তি আন্দোলন', 'ছাত্র ফেডারেশন' প্রভৃতি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'অল বেঙ্গল গার্ল'স ষ্টুডেন্টস কমিটি'-র সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র বসু যখন ফরওয়ার্ড ব্লক দল পরিচালিত করেন, তিনি তাতে যোগ দেন—১৯৪২-এর আন্দোলনে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৪৫-এ মুক্তি পান। ১৯৪৬-এ কলকাতার দাঙ্গার সময় তিনি দাঙ্গা বিধ্বস্তদের মধ্যে রিলিফের কাজ করেন। নানান স্থানে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

(১২) **বিমলপ্রতিভা দেবী**—১৯২১-এ উর্মিলা দেবীর 'নারী কর্ম মন্দির'-এ যোগ দেন। ১৯৩১-এর ২-অক্টোবর মানিকতলার ডাকাতি কেসে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮-এ মুক্তি পেয়ে 'নিখিল ভারত বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটি'র সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ১৯৪১-এর ২৭-জানুয়ারী রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে দু'বছর কারাদণ্ডের পর নিরাপত্তা বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হন। ১৯৪৫-এর ২৭-সেপ্টেম্বর মুক্তি পান ও শ্রমিক অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

(১৩) **বগলাসুন্দরী সোম**—১৯২১-এ কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। বাসন্তীদেবী ও উর্মিলা দেবী যখন পিকেটিং করে কারাবরণ করেন তখন তিনি মোহিনীদেবী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি নেত্রীদের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করতে করতে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন।

(১৪) **নির্মলা রায় ও সুষমা রায়**—দুই বোন। ১৯৩৮-এ নির্মলা আর. এস. পি.—দলের সভ্য হন। ১৯৩৯-এ নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী সাব কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪২-এর ৬-সেপ্টেম্বর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা বন্দী রূপে তিনবছর প্রেসিডেন্সী জেলে

থাকেন। ১৯৪৫-এ মুক্তি লাভের পর উত্তর কলকাতার নানান বস্তীতে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে লিপ্ত হন। সুষমা রায় আগষ্ট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে ১৯৪২-এ গ্রেপ্তার হন ; প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তাবন্দীরূপে আটক থাকেন এবং পরে বছরখানেক নিজগ্রামে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৫-এ মুক্তি পান। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬-এ ভারতবর্ষের ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দেন। ১৯৪৬-এ শ্রীহর্ষ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

(১৫) **বেলা মিত্র**—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। ১৯৪৭-এ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী 'ঝান্সী রেজিমেণ্ট'-এর আদর্শে তিনি 'ঝান্সীর রানী বাহিনী' গঠন করেন। ১৯৫০-এ শিয়ালদহ ষ্টেশনে এবং অন্যান্য কেন্দ্রে রিফিউজিদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৫২-এর ৩১-জুলাই অকালে মারা যান। ১৯৫৮-এ তাঁর জন্মদিনে 'বেলানগর' নামে একটি নতুন রেলওয়ে ষ্টেশন নির্মিত হয়। ভারতবর্ষে ভারতীয় নারীর নামে রেলওয়ে ষ্টেশন এই প্রথম।

(১৬) **মীরা দাশগুপ্তা**—১৯০৬-এ জন্ম। ১৯৩৭ এবং ১৯৫২-এ দু'বার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-এ ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সভ্য হন। দাঙ্গাপীড়িতদের সেবায়, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, আর্তত্রাণ কম্পে, বাস্তুহারাদের সাহায্যে তাঁর সংগঠনমূলক কাজের অবদান অনেকখানি। ১৯৫৪ সালে সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশনের সভ্যরূপে বাংলার তরফ থেকে চীন পরিভ্রমণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের তিনি সদস্যা ছিলেন।

(১৭) **মায়াদেবী**—রাজবন্দীরূপে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকেন। সম্ভবতঃ ১৯৩৩-এ কলকাতার একটি বোর্ডিং-এ অবস্থানকালে ডিনামাইট প্রভৃতিসহ গ্রেপ্তার হন। অস্ত্রআইন আনুযায়ী পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(১৮) **পারুল মুখার্জী ও উষা মুখার্জী**—জন্ম যথাক্রমে ১৯১৫ এবং ১৯১৮ সালে। ১৯২৯-এ কুমিল্লার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পারুল মেয়েদের নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করেন। উষা ছিলেন এর কর্মী। ক্রমে এ'রা দু'বোন 'অনুশীলন সমিতি-'তে যোগ দেন। ১৯৩৪-এ উষা গ্রেপ্তার হন রাজবন্দীরূপে, ১৯৩৭-এ মুক্তি পান। ১৯৩৫-এ পারুল টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৭-এর এপ্রিল মাসে এই মামলার রায়ে তাঁর তিনবছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৯-গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় তাঁর মুক্তি হয়।

(১৯) **বীণা দাস** (ভৌমিক)—১৯১১-এ জন্ম। ১৯২৮-এ বেথুন কলেজের ছাত্রী বীণা দাস অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করতে উঠে পড়ে লাগলেন। এই বছরই কলকাতা কংগ্রেসের

অধিবেশনে বীণা ও কল্যাণী দু'বোন স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগ দেন। বীণা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা পদে থাকেন। বেআইনী সভা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন, প্রায় তিন বছর প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকার পর মুক্তি পান ১৯৪৫-এ, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন।

(২০) **সরযূ গুপ্তা**—১৮৮৮-এ জন্ম। গান্ধীজীর আদর্শে প্রবুদ্ধ হ'য়ে সারাজীবন কংগ্রেসের কাজ ক'রে যান। ১৯৩০-এ 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৪৫-এ মারা যান।

(২১) **সুলতা মিত্র (কর)**—১৯০৭-এ জন্ম। ১৯৩০-এবং ১৯৩২-এ সমস্ত ভারত জুড়ে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক কর্মী শোভারানী দত্ত এবং কল্যাণী দাসের প্রেরণায় তিনি ১৯৩২-এ অহিংসা আন্দোলনে যোগ দেন। বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করেন; এর ফলে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৪-এ যুগান্তর দলের হ'য়ে গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা অপসারণের অপরাধে পুলিস তাঁকে ভবানীপুর থানায় চৌদ্দদিন নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখে।

(২২) **শোভারানী দত্ত**—জন্ম ১৯০৬। ১৯৩০-এ ২৯-এ আগষ্ট ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমার মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবে এবং ১৯৩৪-এ গর্ভনর অ্যাণ্ডারসনের উপর আক্রমণের সন্দেহে গ্রেপ্তার হন।

(২৩) **হেলেনা দত্ত**—বিপ্লবী কাজ করতে গিয়ে ডেটিনিউ ক'রে তাঁকে হিজলী জেলে বন্দী করে রাখা হয় পাঁচ বছর। ১৯৩৯-এ 'ফরওয়ার্ড' ব্লক-এ যোগ দেন।

পৌরসভার দায়িত্বে মহিলারা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পরিচালন কতৃপক্ষের চেহারার পরিবর্তন হল। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, ৪৮ জন নির্বাচিত কমিশনার নিয়ে গঠিত হয় কলকাতা পৌর সংস্থা। যদিও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাষ্টিস অব পিস্-দের নির্বাচন করার অধিকার করদাতারা পেয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচিত পৌরসংস্থা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার কাজ শুরু করে দেয়। কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতার অগ্রগতির কাজে এগিয়ে চলতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পৌরসংস্থার-প্রথম মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

পরবর্তী সময় কলকাতা পৌরসভায় মহিলাদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং হেমলতা সরকারই কলকাতা পৌরসভার প্রথম মহিলা সদস্যা। তিনি বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে।

১৯৬৭-৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মহিলা প্রার্থীকে দেখা যায় নির্বাচন যুদ্ধের মঞ্চে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল উত্তেজনা। সবদলের নেতৃত্বই চেয়েছিলেন মহিলা প্রতিনিধি। তাই ১৪১-টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে মহিলা প্রার্থীরা নেমেছিলেন কোথাও সরাসরি, কোথাও ত্রিমুখী, বা চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ২৪ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেস দলের ছিলেন চারজন মহিলা প্রার্থী এবং বাকী আসনের মধ্যে ছিল যথাক্রমে সি. পি. এম, সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি এবং এস. ইউ. সি. দলের প্রার্থীরা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেই পৌর প্রসাশনের সূচনা। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সীমিত ভাবে পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন শুরু হয়। একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এরপরে বেশ কয়েকটি নির্বাচন হয়েছে, তবে ১৯৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর আর কোন পৌরসভার নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনে মহিলারা প্রতিনিধি হিসাবে না এলেও পৌর প্রশাসনের দরজায় প্রবেশের অধিকার কিন্তু তাঁরা পেয়েছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হেমলতা সরকার মনোনিত সদস্যার সময়-কাল ১৯২৪ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে (সঠিক সময়কাল সংগ্রহ করা সম্ভব হল না)। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পৌর প্রশাসনে প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান (পৌরমুখ্য) হিসাবে নির্বাচিত হন মিসেস নেলী সেনগুপ্তা। এরপর অবশ্য কয়েকজন মহিলাকে বিভিন্ন ক্ষমতা নিয়ে পৌর প্রশাসনে বিশেষ পদমর্যাদায় দায়িত্ব পালন করতে দেখা গিয়েছে।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে চারজন মহিলা নির্বাচিত হন। এ'দের মধ্যে সি. পি. আই. (এম) দলের তিনজন। এ'রা হলেন—মহুয়া ভট্টাচার্য, (১০১ নং ওয়ার্ড), অর্চনা ভট্টাচার্য (৯৮ নং ওয়ার্ড), রত্না রায় মজুমদার (১২৮ নং ওয়ার্ড)। বাকীজন কংগ্রেস-ই দলের আশা মাহান্তি (৪০ নং ওয়ার্ড).।

বিজয়ী প্রতিনিধিরা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের হলেও চেতনা বিকাশের দিক দিয়ে তাঁদের সমাজের প্রথম সারিতে বসানো যেতে পারে নিশ্চয়ই, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলবাসীর অনেক কাছের মানুষ। এই কজন নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে জেনেছি তাঁদের কিছুকথা—

মহুয়া ভট্টাচার্য ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত হন পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সঙ্গে। স্থানীয় অঞ্চল কমিটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা। অর্চনা ভট্টাচার্যও এই একই সমিতির দীর্ঘদিনের সদস্যা। রত্না রায় মজুমদার এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন বিশ বছর ধরে; তিনি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা এবং জেলা কমিটির সদস্যা। আশা মাহান্তি রাজনৈতিক মঞ্চে বলতে গেলে নতুন।

এ'দের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, তাঁরা পৌরসভা নির্বাচনে দাঁড়ালেন কিসের প্রেরণায়। প্রত্যেকেই একবাক্যে উত্তর দিলেন—পার্টির সিদ্ধান্তেই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা মনে করেন পার্টির নীতির সঙ্গে নাগরিক জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করার পবিত্র দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। পার্টির আস্থা এবং জনগণের আস্থা পালন করবার জন্য এ'রা সচেষ্ট।

নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে করণীয় কাজ কি আছে জানতে চাইলে তাঁরা জানান, মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে আলাদা করে কিছু করণীয় আছে, একথা চিন্তা করা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ একজন পৌর প্রতিনিধি হিসাবে নগর উন্নয়নের স্বার্থে যে সমস্ত বিষয় করণীয় সে-ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়াটাই প্রয়োজন। তবে, রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করে হঠাৎ নগর উন্নয়ণের পরিকল্পনা মাফিক কাজ সম্পূর্ণ করে ওঠা বোধহয় সম্ভবপর হবে না। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এগোনো হবে এবং এব্যাপারে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

একজন মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে মহিলা সমাজের প্রতি কি দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পারেন, এ-প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন, 'আঞ্চলিক ভাবে মহিলা সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান তো আমরা সব সময় করে আসছি। সমাজের মহিলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে আন্দোলন ছাড়াও আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন তো আমাদের হতেই হয় এবং এর সমাধানের চেষ্টাও আমরা করে থাকি। তাই কাউন্সিলার হিসাবে এ-ব্যাপারে আলাদা করে ভাববার কিছু আছে বলে মনে হয় না। ১৯৯০ সালে কলকাতার পৌর

নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ৫ জন। এ'রা হলেন যথাক্রমে মহুয়া ভট্টাচার্য (১০১ নং ওয়ার্ড), অর্চনা ভট্টাচার্য (৯৮ নং ওয়ার্ড), রত্না রায় মজুমদার (১২৮ নং ওয়ার্ড) এবং জয়শ্রী দেবনন্দী (৫৯ নং ওয়ার্ড) এ'রা সবাই সি. পি. এম. দলের মনোনীত প্রার্থী। কংগ্রেস-ই দলের আশা মাহান্তি (৪০ নং ওয়ার্ড)।

কলকাতার আজ বয়স তিনশো বছর। আর কলকাতা পৌরসভার বয়স অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত। পৌর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা তার পুরাতন পোষাক পাল্টে সেজেছে নতুন পোষাকে। আজ তাই এই কলকাতা মহানগরী হয়ে উঠেছে কল্লোলিনী। জব চার্ণকের সেই শান্ত-সৌম্য কলকাতাকে বোধহয় স্মৃতির পাতাতেই ফেলে রাখতে হবে। জনমুখর কলকাতার নারী-পুরুষ সবাই আজ এই শহরের বুকের উপর সমানতালে পা মিলিয়ে চলছে।

কলকাতার নারীদের একটা বড় অংশ প্রতিনিয়তই কলকাতার বুকে সাড়া দিয়ে যায় তাঁদের কর্মব্যস্ততার। আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শেষ প্রান্তে এসে সভ্যতার আলোকে আলোকিত কলকাতার নারীরা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তাঁদের স্বাধিকার। বিভিন্ন দিক থেকে অর্জনও করেছেন তাঁদের আসন। তাই প্রশাসনের ক্ষেত্রেও তাঁদের চাহিদা স্বভাবতই বেশি। প্রশাসনের কথাটা যখন উঠল তখন অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি, বর্তমানে সরকারী প্রশাসনিক বিভিন্নস্তরে বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা আছেন এবং এ'দের মধ্যে কলকাতাবাসীর সংখ্যাই বেশী।

পূর্বের কথায় ফিরে আসি,—পৌরসংস্থায় আরও বেশি সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজে যুক্ত হতে পারলে মহিলা সমিতির পক্ষেই মঙ্গল হবে। কারণ, সমাজ উন্নয়নের স্বার্থে পুরুষদের পাশে মহিলাদের অবস্থিতি সুফলই দিতে পারে। নারী-পুরুষের যৌথ শক্তি সমাজ উন্নয়নের পথকে মসৃণ করে তোলে। বর্তমান নারী সমাজ নিজেদের সম্পর্কে যতই দাবি করুন যথাযথ বিচারে দেখা যায় তাঁরা আজও পিছিয়ে আছেন সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। তাই তো নারীকে এগিয়ে আসতে হবে বেশি সংখ্যায়। অনগ্রসর নারী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেবেন অগ্রণী মহিলারা। আর এ-ব্যাপারে কলকাতার নির্বাচিত এ-সব প্রতিনিধিরাই সহমত পোষণ করেছেন।

পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যে নারীরা

কলকাতার নারীসমাজের প্রগতির কাল মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দী। এ-সময়েই নারী তার আপন সত্তাকে অনুভব করতে শিখেছে একটু একটু করে। একই সঙ্গে বেশ কয়েকজন সমাজ সংস্কারক নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেন নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে। যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া কোন ধ্যান-ধারণাই কার্যকরী হতে পারে না। তাই সূচনাতেই কয়েকজন উদারপন্থী মানুষ নারীর যুগ-যুগান্ত সযত্নে লালিত সংস্কার, বিধিনিষেধগুলি থেকে বেরিয়ে আসবার পরিবেশ সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এলেন। তাঁরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই মেয়েদের জ্ঞান বৃদ্ধি প্রসারের দায়িত্ব নেন। 'বামাবোধিনী' (১৮৬৩), 'অবলা-বান্ধব' (১৮৫৯) মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। বামাবোধিনীর মুখপাত্রে লেখা হোলো—

"স্ত্রীলোকদিগের সমুদয় বিষয় লেখা হইবে··············· যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়—যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল হইতে পারে··············।"

এসব পত্র-পত্রিকায় মহিলা কিছু লেখিকাও ছিলেন ; তবে এঁরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'বামাবোধিনী' পত্রিকার রৌপ্যজয়ন্তী সংখ্যায় (১৮৮৭) এমন ষোলোজন মহিলা লেখিকার নাম পাওয়া যায় যাঁরা সবাই সে যুগের আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম পরিবারের। হিন্দু সমাজের সমস্ত রকমের গোঁড়ামি, অন্যায় আচার-আচরণ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি সোচ্চার ছিল।

পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে মহিলারা পত্রিকা সম্পাদনে হাত দিলেন। এসব পত্রিকার প্রকাশের স্থান উত্তর কলকাতা। মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র 'বঙ্গমহিলা'। এই পাক্ষিক পত্রিকাটি খিদিরপুর নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১-লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। ইনি হলেন ডব্লিউ.সি. ব্যানার্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। এ-পত্রিকাটি কিন্তু মেয়েদের চোরকুঠুরির দেয়ালে ছিদ্র করে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছে,— প্রাঙ্গণের প্রখর আলোয় প্লাবিত হওয়া তাদের মনঃপুত নয়।

এ-সময়েই নারীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহী কিছু মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা 'অনাথিনী'-র প্রকাশ কাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৮৭৫)। 'ভারতী' ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিনী শরৎকুমারী চৌধুরানী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী সাহিত্যানুরাগী কাদম্বরীদেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলে পত্রিকাটির দায়িত্ব নেন স্বর্ণকুমারীদেবী। পরবর্তী সময়ে তাঁর দুই কন্যার উপর এর সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে। এঁদের কার্যকাল—

৮ম-৯ম বর্ষ—১২৯১-১২৯২ বঙ্গাব্দ—স্বর্ণকুমারীদেবী—'ভারতী'

১০ম-১৬শ বর্ষ—১২৯৩-১২৯৯ বঙ্গাব্দ—স্বর্ণকুমারী দেবী—'ভারতী ও বালক' (নামে প্রকাশিত হয়)

১৭ম-১৮প বর্ষ—১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ—স্বর্ণকুমারী দেবী—'ভারতী'।

১৯ম-২১ম বর্ষ—১৩০২-১৩০৪ বঙ্গাব্দ—হিরন্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী—'ভারতী'।

২৩ম-৩১ম বর্ষ—১৩০৬-১৩১৪ বঙ্গাব্দ—সরলাদেবী—'ভারতী'।

৩২ম-৩৮ম বর্ষ—১৩১৫-১৩২১ বঙ্গাব্দ—স্বর্ণকুমারী দেবী—'ভারতী।

৪৮ম-৫০ম বর্ষ—১৩৩১-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ—সরলাদেবী—'ভারতী'।

'পরিচারিকা' মাসিক পত্রিকাটি ১২৮৫ সালের ১লা জৈষ্ঠ্য (৮ মে ১৮৭৮) প্রকাশিত স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ; সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছর পর এর ভার পড়ে আর্য্য নারী সমাজের পক্ষে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু বিদুষী ও সুলেখিকা মোহিনী দেবীর উপর।

'খ্রীষ্টীয় মহিলা' মাসিক পত্রিকাটি ১২৮৭-র মাঘ (জানুয়ারী ১৮৮১) প্রকাশিত হয় ; সম্পাদক কুমারী কামিনী শীল। পত্রিকাটিতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পেত।

'বঙ্গবাসিনী' পত্রিকাটি বঙ্গমহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এটি ১৮৮৩ সালের কলকাতার টালা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়। মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, নিস্তারিনী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, অনুপমা দেবী, কুসুম কামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিনা ঘোষ প্রমুখ লেখিকারা পত্রিকাটিতে তাঁদের লেখায় ভরিয়ে দিতেন।

'সোহাগিনী' মাসিক পত্রিকাটি ১নং গরানহাট স্ট্রীট থেকে ১২৯১-এর বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৮৪) প্রকাশিত হয় ; সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে।

'বালক' ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

'বিরহিনী' প্রধানত গল্পের মাসিক পত্রিকা। ১১৯৫, কার্ত্তিক (অক্টোবর) সুশীলাবালা দেবী সম্পাদনায় ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী লেন থেকে প্রকাশিত হয়।

'পুণ্য' সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৩০৪, আশ্বিন (অক্টোবর ১৮৯৭) ; সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীদেবী। ইনি ১৩০৭-৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এর সম্পাদনা করেন।

'অন্তপুর' মাসিক পত্রিকাটি ১৩০৪, মাঘ (জানুয়ারী ১৮৯৮) শশিপদ-বন্দোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবীর সম্পাদনায় (শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এটি সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

১৩০৭ মাঘ—১৩১১ (চতুর্থ-সপ্তমবর্ষের)-সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরী।
১৩১১ জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র (সপ্তমবর্ষের ৫-৬ সংখ্যা) „ কুমুদিনী মিত্র।
১৩১১ আশ্বিন-মাঘ (ষষ্ঠ-দশম সংখ্যা) „ লীলাবতী মিত্র।
১৩১১ ফাল্গুন-চৈত্র (একদ্বশ-দ্বাদশ) „ সুখতারা দত্ত।
এবং ১৩১২ বৈশাখ।

১৩২২, বৈশাখ (এপিল ১৯১৫) বিরাজ মোহিনী রায় সম্ভবত নবপর্য্যায়ের 'অন্তঃপুর' প্রকাশ করেন।

উল্লিখিত মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার মহিলাদের প্রকাশিত পত্রিকা। বিংশ শতাব্দীতেও এরূপ কিছু পত্রিকার প্রকাশ হয়।

১৩০২-র আষাঢ় মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'মুকুল' নামে বালক বালিকাদের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৭) সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা দেবী। ১৩২৪-১৩২৬ বঙ্গাব্দ (১৯১৮ মে-১৯১৯ জুলাই) সময়ের সম্পাদিকা লাবণ্যপ্রভা সরকার। চব্বিশ বছর চলবার পর প্রচার রহিত হয়। ১৩৩৫-এর বৈশাখ, এটি নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হয় ; সম্পাদিকা শকুন্তলা দেবী। তৃতীয় বর্ষ থেকে বাসন্তী চক্রবর্তীর উপর সম্পাদনার ভার পড়ে, ১৩৪৮, পর্যন্ত তিনি সম্পাদনা করেন।

'ভারত মহিলা' পত্রিকাটি ১৩১২-র ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিনী সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ; এটি ১৩ বছর জীবিত ছিল।

'জাহ্নবী' ১৩১১-র আষাঢ়মাসে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় প্রকাশিত

হয়। এই মাসিক পত্রিকাটির ১৩১৪-র বৈশাখে সম্পাদনার ভার পড়ে গিরীন্দ্রমোহিনীদাসীর উপর। তিন বছর চলবার পর (১৩১৪-১৬) পত্রিকাটি লুপ্ত হয়।

১৩১৪-শ্রাবণ মাসে 'সুপ্রভাত' পত্রের উদয়। এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদিকা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (বসু)। 'সুপ্রভাতের'-কণ্ঠে এই কবিতাটি শোভা পেত—

'সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে,
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।"

মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রগুলির মধ্যে এর স্থান ছিল সর্বোচ্চ। নয় বছর চলবার পর এটি লুপ্ত হয়।

'গৃহলক্ষ্মী' ১৩১৭-র আশ্বিন শান্তিময়ী সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকাটি সম্ভবত দ্বিতীয় বর্ষেই লুপ্ত হয়।

"ভারতলক্ষ্মী' সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি ১৩১৭ চৈত্র যোগমায়া মাতাজী তপস্বিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

'প্রেম ও জীবন' মাসিক পত্রিকাটি ১৩১৯-শ্রাবণ, হেমলতা দেবীর সম্পাদনায় ১৯, ঈশ্বর মিত্র লেন থেকে প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'আনন্দসঙ্গীত' ১৩২০—শ্রাবণ, প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩২৮-আষাঢ় সংখ্যার পর এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন আশুতোষ চৌধুরী।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অসংখ্য স্বল্পায়ু পত্রিকার জন্ম হয়। হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও নবজাগরণ ঘটে। এ-সমাজের মহিলারাও যথাসাধ্য উদ্যমে নানান সামাজিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও তাঁরা পশ্চাৎপদ থাকেননি। এ-ধরনের পত্রিকাও তাঁরা বের করেছেন। তবে অধিকাংশই স্থায়ীত্বলাভ করেনি। সমস্ত পত্র-পত্রিকার তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়; তবে দীর্ঘস্থায়ী বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে এমন কিছু পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে কিছু পত্র-পত্রিকার প্রকাশের কথা; যথা—সীতাদেবী সম্পাদিত 'দীপালী' ফাল্গুন ১৩২৭ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়-এর মাসিক পত্রিকা। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-এ সুধাদেবী সম্পাদিত 'রূপরেখা'; পৌষ ১৩৩৯,-এ জাহানারা চৌধুরী সম্পাদিত 'বর্ণনারী'; আশ্বিন ১৩৪৪-রাধারানী দেবীর 'সোনার কাঠি'; মাঘ ১৩৪৫-এ শান্তাদেবী সম্পাদিত 'উৎসব' প্রভৃতি।

বাঙলার কথা ১৩২৮, ১৪-ই আশ্বিন (৩০-সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করলে তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী ১২-শ সংখ্যা থেকে (২৩-ডিসেম্বর ১৯২১) এ পত্রিকার সম্পাদিকা হন। তদানীন্তন উচ্চাঙ্গের এই পত্রিকাটিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়—'শিক্ষার বিরোধ', 'স্বরাজ সাধনায় নারী', 'সত্য ও মিথ্যা', 'মহাত্মাজী' প্রভৃতি।

'নব্যভারত' মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্নরায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ জৈষ্ঠ্য মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র প্রভাত কুমার রায়চৌধুরী এর প্রচার অব্যাহত রাখেন। ১২ ভাদ্র ১৩২৮ তাঁর মৃত্যু হলে এ বছরেই আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্মসংখ্যা থেকে তাঁর স্ত্রী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতের সম্পাদিকা হন। তাঁর সম্পদনার পত্রিকাটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (৪৩-শ বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

'সেবা ও সাধনা' মাসিক পত্রিকাটি ১৩৩০-র জৈষ্ঠ মাসে যতিপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকাটি একা ইন্দুনিভা দেবীই সম্পাদনার ভার নেন।

১৩৩০-এর আষাঢ় মাসে 'মাতৃমন্দির' সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার নন্দীর সম্পাদনায়; মেয়েদের পক্ষে সর্বোতভাবে উপযোগী করে প্রকাশ করাই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। প্রথম পাঁচ বছর (১৩৩০-৩৪) সুরবালাদত্ত এবং পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টমবর্ষের সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সুশীলা নন্দী এই পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। এরপর পত্রিকার প্রচার রহিত হয়।

সন্তোষ কুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় 'শ্রমিক' সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩৩১-এ প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গলক্ষ্মী' ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ (১৯২৫, নভেম্বর) সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির মুখপত্রস্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি সব সময়ই মহিলা হস্তে পরিচালিত হয়েছে। সম্পাদিকাগণ,—১৩৩২ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৩৩ চৈত্র-কুমুদিনী বসু, (বি. এ.); ১৩৩৪ বৈশাখ-কার্ত্তিক লতিকা বসু (ডি. লিট্, অক্সন); ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৫৫ কাতিক-হেমলতা দেবী (ঠাকুর); ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ—হেমলতা দেবী; শান্তা দেবী ও আরতি দত্ত।

'অর্ঘ্য' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৩৪, সম্পাদক প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর।

আলোক সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে 'আলোক' মাসিকপত্রিকাটি ১৩৩৬-এর কার্ত্তিক মাসে প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

'মুক্ত' সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটির পরিচালিকা তরুবালা সেন, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩০-শে ফাল্গুন ১৩৩৭, শনিবার।

'জয়শ্রী' পত্রিকাটি প্রথমে ১৩৩৮-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলেও কিছুদিন পর থেকেই এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

'অঙ্কুর' ১৩৩৮ (আগস্ট ১৯৩১)-এ প্রথম প্রকাশিত হয় রেঃ সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ-এর সম্পাদনায়। কিন্তু চতুদশবর্ষ (আগস্ট ১৯৪৪) থেকে লাবণ্য প্রভা মল্লিক সম্পাদনার ভার নেন এই বালক-বালিকাদের জন্য মাসিক পত্রিকাটির।

'বুলবুল' চতুর্মাসিক পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০-এ মহম্মদ হবিবুল্লা ও শমসুস নাহারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৩-এর বৈশাখ থেকে এ'টি উচ্চাঙ্গের মাসিকে পরিণত হয় এবং ১৩৪৬-পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল।

১৩৪০-এর শ্রাবণ, পরিমল মিত্রের পরিচালনায় 'আগন্তুক' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

'এডুকেশন গেজেট' সাপ্তাহিক বার্তবহ, ১৩৪১ বৈশাখ অনুরূপা দেবীর (কুমারদেব মুখোপাধ্যায় সহযোগে) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

'রূপশ্রী' মাসিক পত্রিকা ১৩৪১-এর কার্ত্তিক, প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী বেলা দে (ঘোষ) দু'বছর সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাটির সম্পদনা করেন।

জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্তর সম্পাদনায় ১৩৪৩-এর শ্রাবণ, 'অনুভব ও সাহিত্য' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

'মন্দিরা' সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি ১৩৪৫-এর বৈশাখ প্রকাশিত হয়। প্রথম দশ বছর পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার মহিলা হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এ'দের নাম ও কার্যকাল, যথাক্রমে—কমলা চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৫ বৈশাখ-১৩৪৬ চৈত্র), কমলা দাশগুপ্তা (১৩৪৭ বৈশাখ-১৩৪৯ শ্রাবণ), স্নেহলতা সেন (১৩৪৯ ভাদ্র-১৩৫২ অগ্রহায়ণ, কমলা দাসগুপ্তা (১২৫২ পৌষ-১৩৫৪ চৈত্র)।

'শিক্ষা' মাসিক পত্রিকাটি ১৩৪৭-অগ্রহায়ণ অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; এটি সম্পূর্ণ শিক্ষা বিষয়ের।

'মেয়েদের কথা' (১৩৪৮-বৈশাখ) মাসিক পত্রিকাটি কল্যাণী সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৫৩-এ চতুর্থ বর্ষের পত্রিকা প্রচারের পর এর বিলুপ্তি ঘটে।

'অর্চনা, ১৩১০-এর ফাল্গুন প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫১-জ্যৈষ্ঠ ৪০ বর্ষের, চতুর্থ সংখ্যা থেকে এই মাসিকপত্রের সম্পাদনার ভার পড়ে চিত্রিতা দেবীর উপর।

'মাতৃভূমি' মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫২) থেকে অমিতা মজুমদার, এম. এ. সম্পাদনার ভার নেন।

'পরিক্রমা' ঋতুসংকলনের প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩৫৩ ; সম্পাদক: কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'মহিলা', ১৩৫৪ আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় বীণাগুহের এম. এ. সম্পাদনায়। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী আশাদেবী, এম. এ. সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। সম্পাদনা পরিষদের সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

'মহিলামহল' পাক্ষিক পত্রিকাটি ১লা আষাঢ় ১৩৫৪, অঞ্জলি সরকার এম. এ. ; কমলা মুখোপাধ্যায় এম. এ. ও গীতা বোসের যুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫-এর ১লা আষাঢ় থেকে অঞ্জলি সরকার একই পত্রিকার সম্পাদিকা হন। ১৩৫৬-র ১-ভাদ্র থেকে গীতা বোস সম্পাদিকা হন। ১৩৫৭ আষাঢ় থেকে এ'টি মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

'সংগঠন' পাক্ষিক পত্রিকাটি ১৩৫৪-র ২রা শ্রাবণ শচীন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩৫৪-র আশ্বিন থেকে তাঁর মৃত্যু হলে তৎপত্নী অংশুরানী মিত্র এর সম্পাদনার ভার নেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত সপ্তম সংখ্যা থেকে এ'টি মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়।

নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক 'বেগম' প্রকাশিত হয় ৩ শ্রাবণ ১৩৫৪। এ'টি মুসলমান নারীদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত ; প্রথম বর্ষের ১২-শ সংখ্যা থেকে নূরজাহানবেগম একাই পত্রিকা-খানি পরিচালনা করতে থাকেন।

'শতাব্দী' মাসিক পত্রটির প্রথম প্রকাশ কাল, আশ্বিন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক মুরারি দে ও সুজাতা ঘটক।

'ললিতা' সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা অরুণা বসু। ১৯৪৭ সালের শেষার্ধে এর একটি মাত্র সংখ্যা বউবাজার, মডার্ণ আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়।

১৯৪৮-এর ২৩-জানুয়ারী মালবিকা দত্তের সম্পাদনায় 'তরুণের স্বপ্ন' সচিত্র সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। পরে এ'টি মাসিকে পরিণত হয়।

১৩৫৫-শ্রাবণ বীণা হালদার ও বেলা ভট্টাচার্য-র সম্পাদনায় ছেলে মেয়ে সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মাত্র তিনটি সংখ্যা (মাঘ ১৩৫৫, শ্রাবণ ১৩৫৬) হয়।

'ঘরে বাইরে' মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাসিক মুখপত্র অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী মঞ্জুশ্রী দেবীর সম্পাদনায় আশ্বিন ১৩৫৫-প্রকাশিত হয়। চার-পাঁচ সংখ্যার পর এ'র প্রচার রহিত হতে বাধ্য হয়।

'একাল' সচিত্র সাপ্তাহিক। সম্পাদিকা শিপ্রা গুহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল

মহলয়া ১৩৫৫ ; মাত্র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'শ্রীমতী'—ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনার এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ হয় ১৩৫৫-র কার্ত্তিক মাসে।

'জয়া' মাসিক পত্রিকাটি ভূতপূর্ব 'ঘরে-বাইরে'র সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রীদেবী ১৩৫৬ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ করেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ' মাসিক পত্রিকা ১৩৫৫-অগ্রহায়ণ কিরণচন্দ্র দে চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ ১৩৫৬-থেকে এর ভার নেন অনুরূপা দেবী।

১৯১৫ সালের ১-অক্টোবর প্রতিভাদেবী ও ইন্দিরাদেবীর সম্পাদনায়, ৬১ নং বৌবাজার স্ট্রীট থেকে আনন্দসঙ্গীত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

১৯১৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মিস কে. এ. ব্লেয়ারের সম্পাদনায়, ৪১নং লোয়ার সার্কুলার রোডের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী কর্তৃক 'মহিলাবান্ধব' প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণভবানী বিশ্বাসের প্রকাশিত 'মাহিষ্যমহিলা' পত্রিকাটি।

মহিলা সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা—

'Kosmos' মাসিক পত্রিকা ১৯১৪-সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে Madam Coulon এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

'India Temperance Record' মাসিক পত্রিকা ১৯১ -সালের জুলাই Miss K. A. Blair-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

'Y.W.C.A. out look' মাসিক পত্রিকাটি ১৯১৫ সালের মে-মাসে 'The Young Woman's Christian Association' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

'Achlkni Rlpeng' মাসিক পত্রিকাটি ১৯১৫ সালের জুন মাসে Miss E. C. Bond এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের মহিলা সম্পাদিত কলকাতার যে সমস্ত পত্রিকা আছে তার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

'মালিনী'—জানুয়ারী ১৯৭৯, সম্পাদিকা মায়া সিদ্ধান্ত, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২।

'সুকন্যা'—১৯৮৪, সম্পাদিকা, গীতা চৌধুরী, ইত্যাদি প্রকাশনী।

'সানন্দা'—১৯৮০, সম্পাদিকা অপর্ণা সেন, ৯, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-১।

'অহল্যা'—সম্পাদিকা, চন্দনা মিত্র, ৩, মতিলাল মিত্র লেন, কলিকাতা-৫৪।

'অঙ্গনা'—সম্পাদিকা, দিপ্তী ভট্টাচার্য, ১২০ বি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯।

'অয়ন'—পরিচালনার ভার 'অল ইণ্ডিয়া ওম্যান এ্যাসোশিয়েশনের' উত্তর কলিকাতা।

'চলার পথে'—সম্পাদিকা কমলা মুখার্জী,১৮৮/২ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

'ঘরে বাইরে'—সম্পাদিকা প্রভাচ্যাটার্জী, ১৮৮/২ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

'মহিলা'—১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬।

'মহিলা বান্ধব'—১১/ডি, অরপুলি লেন, কলকাতা-১২।

'মহিলামহল—১৬ এ ডাফ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

'মহিলা মঙ্গল'—২১ এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬।

'মেয়েদের কাগজ—২৭ এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫।

নারীজগৎ—সম্পাদিকা, হেনা চৌধুরী। ১০৯/২০ হাজরা রোড, কলকাতা-১৫।

'সোভিয়েত নারী—সম্পাদিকা, মায়াসিদ্ধান্ত, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

'একসাথে'—১৯৬৮ সালে (বৈশাখ ১৩৭৫) প্রথম প্রকাশ। সম্পাদিকা, কনক মুখোপাধ্যায়।

এবার আসা যাক্ লেখিকার কথায়। মহিলা বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ। এ-সময় থেকেই কিছু কিছু লেখিকার সন্ধান পাওয়া গেলেও এঁদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম সমাজের। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর এক বড় সংখ্যক মহিলা সাহিত্যচর্চা করতেন ; এঁদের পরিচয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর আলোচনাতে উল্লিখিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ-শতাব্দীর মহিলা কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ পরিচয় স্বল্পপরিসরে রাখলেও সমস্ত কিছুর উল্লেখ করা সম্ভব হবে না। তাই কয়েকজনের উল্লেখ করা হোলো যাঁরা সাহিত্যজগতে জায়গা করে নিয়েছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—(১৮৫৮-১৯২৪)-১৮ই আগষ্ট কলকাতার ভবানীপুরে জন্ম। শৈশবেই কাব্যানুরাগ প্রকাশ পায়। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি আধ আধ ভাষা বলতেন—

আমার নামটি বাবু চাঁদা।
পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা।

দশ বছর বয়সে বিবাহ হয়। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী (১৮৭২), কবিতাহার (কাব্য, ১৮৭৩) 'ভারতকুসুম' (কাব্য, ১৮৮২), 'অশ্রুকণা' (কাব্য, ১৮৮৭), আভাষ (কাব্য, ১৮৯০), 'সন্ন্যাসিনী' (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য, ১৮৯২), 'শিক্ষা' (কাব্য, ১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (কাব্য, ১৯০২), 'স্বদেশিনী' (কাব্য ১৯০৬), 'সিন্ধুগাথা' (কাব্য, ১৯০৭)।

কামিনী রায়—১৮৬৪ সালের ১২-অক্টোবর জন্ম। আট বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রণীত 'আলো ও ছায়া'

প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' পান। ১৯৩০ সালে, ১৯-শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তাঁর রচিত গ্রন্থতালিকা—'নির্মাল্য' (কাব্য, ১৮৯১), পৌরানিকী' (কাব্য ১৮৯৭), 'গুঞ্জন' (শিশুরাজ্যের কবিতা, ১৯০৫), 'ধর্মপুত্র' (গল্প, ১৯০৭), 'অশোকস্মৃতি' (জীবনী, ১৯১৩), 'শ্রাদ্ধিকী' (শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কবিতায় সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ১৯১৩) 'মাল্য ও নির্মাল্য' (কাব্য, ১৯১৩), অশোকসঙ্গীত' (সনেট গুচ্ছ, ১৯১৩), 'অম্বা' (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), 'সিতিমা' (গদ্যনাটিকা, ১৯১৬), 'Some Thoughts on the Education of our women' (1918), 'বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্তমান (নিবন্ধ, ১৯১৮), 'ঠাকুরমার চিঠি' (কবিতা ১৯২৪) 'দীপ ও ধূপ' (কাব্য ১৯২৯), 'জীবনপথে' (সনেট গুচ্ছ, ১৯৩০)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা—নব্যভারত পত্রিকায় [সুপ্তশক্তির জাগরণ (প্রবন্ধ, ১৩৩২), 'ম' (চিত্র, ১৩৩২), 'অশ্বিনীকুমার দত্তের বিশিষ্টতা' (প্রবন্ধ, ১৩৩২], 'প্রবাসী' পত্রিকায় ['কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির' (অভিভাষণ, ১৩৩৭), 'বিদায়ের অর্ঘ্য' (১৩৩৭), 'শ্রীহট্টে প্রদত্ত ভাষণ' (১৩৩৮), 'সাহিত্য ও সুনীতি' (প্রবন্ধ, ১৩৩৯), 'স্বরাট স্বাধীন' (১৩৪০), 'স্থবিরা, নবীনকর্মী' (১৩৪০), 'রবীন্দ্র পরিচয়' (১৩৪০), 'বুলবুলের প্রতি' (১৩৪১)] 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ['স্বর্গীয়া রামসুন্দরী দেবী' (জীবনী, ১৩৩৭), 'আত্মধারা (১৩৩৭), 'আজিকার মত' (১৩৩৭), 'অনির্বাচন, আমার ভাষণ' (১৩৩৭] 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় [ডাঃ কুমারী যামিনী সেন (জীবনী, ১৩৩৯), 'সেবিকা' (১৩৪০), 'বৌকথাকও' (১৩৩৭)]

মানকুমারী বসু—১২৭১ বঙ্গাব্দে জন্ম, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী—'প্রিয় প্রসঙ্গ' (পদ্য, ১৮৮৪), 'বনবাসিনী' (উপন্যাস, ১৮৮৮), বাঙ্গালীরমণীদিগের গৃহকর্ম (সন্দর্ভ, ১৮৯০), কাব্য কুসুমাঞ্জলি (কাব্য ১৮৯৬), 'কণকাঞ্জলি (কাব্য, ১৮৯৬), 'বীরকুমার বধ' (কাব্য, ১৯০৪) 'শুভসাধনা' (গদ্য-পদ্য, ১৯১১), 'বিভূতি' (কাব্য, ১৯২৭), 'সোনার সাথী' (কাব্য ১৯২৭), 'পুরাতন ছবি' (আখ্যায়িকা ১৯৩৬), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ সালে তাঁকেই সর্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক ও ১৯৪১ সালে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তদানীন্তন 'প্রবাসী', অন্তঃপুর', 'ভারতী', 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতিতে বেশ কয়েকজন লেখিকার সন্ধান মেলে।

এঁরা—প্রিয়ম্বদা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, সরলা দেবী, নিস্তারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, সুখলতা রাও, হেমলতা দেবী, হেমন্ত কুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র, সরোজিনী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দেবী, লজ্জাবতী দেবী, কুমুদেন্দু দেবী, প্রসন্নতারা গুপ্তা, মরকত দেবী, পূর্ণশশীদেবী, সরোজিনী বসু, মিসেস আর. এস. হোসেন, প্রমীলাবালা দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী, মনোরমা দেবী, নীরদবাসিনী বসু, বসন্তকুমারী বসু, নিরুপমা দেবী, শান্তিময়ী দেবী, পুষ্পমালা দেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী, মার্তাঙ্গিনী দত্ত মজুমদার, ইন্দুবালা দেবী, কুলদা, দেবী, সুবাসিনী স্নেহানবীশ, ননীবালা দাসী, প্রেমবালা দত্ত, সরলা দত্ত, রাজলক্ষ্মী ঘোষ, কাদম্বিনী দত্ত, সুরুচিবালা দাসগুপ্তা, অসীমাসুন্দরী সেন, মৃণালিনী রাহা, আয়সা খাতুন, সুখদা গুপ্তা, জ্ঞানবালা দেবী, সত্যরানী গুপ্তা, অন্নপূর্ণা দেবী কাঞ্চনমালা দেবী প্রমুখ। বিংশ-শতাব্দীর লেখিকা যথাক্রমে লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, প্রভাবতী দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, শান্তি দেবী, সরলাবালা সরকার, কনক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এ-শতাব্দীতে নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। তাই লেখিকার সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। মোটামুটিভাবে বলা যায় কলেজ পাঠের সময় থেকেই কলকাতার মেয়েরা সাহিত্যচর্চা শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের পাতায় বেশ কিছু ছাত্রীর সাহিত্য জীবনের হাতে খড়ি হয় এবং তাঁরাই ক্রমশঃ ছোট-খাটো, এমনকি দৈনিক, মাসিক পত্রিকায় জায়গা করে নিচ্ছেন। তবে অনেকেই স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন না। এই কারণেই স্বল্পপরিসরে নামোল্লেখ করা সম্ভব হোলো না। তাই এ-বিষয়ে আলোচনার আপাতত পরিসমাপ্তি।

বিধানসভার কথা

১৯৯০ সালে কলকাতার বয়সকাল তিনশো বছর এবং একই সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের বিধানসভার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হলেও সম্পূর্ণভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা গঠিত হয়; সে-সময়ে অবশ্য আমরা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিলাম। সে সময়কাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯৮৭ সালে। অনিবার্য কারণে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান অবশ্য পিছিয়ে পড়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে জনসংখ্যার মাত্র ১৩'৫ শতাংশের ভোটাধিকার ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের আইন পরিষদের ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হতে পারে। এ-ইতিহাস অনেক দিনের; এরসঙ্গে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত আছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের মতে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতশাসন সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করে। ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর ব্রিটেনের তৎকালীন মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাপত্রে ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হলো। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত শাসন আইন পাশ করা হয়। এর দ্বারা ভারতে ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয় এবং সেই সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে।

এই পটভূমিতে ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতশাসন কাজে আইন প্রণয়নের উদ্দেশে Indian Council Act, 1861 অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ আইন পাশ করা হয়। এই আইন দ্বারা প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের যুক্ত করা হয়। ১৮৬২ সালে এই আইনের বলেই 'কাউন্সিল অফ্ দি লেফটেনেণ্ট গভর্নর অফ্ বেঙ্গল' গঠিত হয়। ভারত গভর্নর জেনারেলের মনোনীত বারো জন সদস্যকে নিয়ে প্রথম যে কাউন্সিল গঠিত হয় তার মধ্যে চার জন ছিলেন ভরাতীয়। তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায়, মৌলবী আবদুল লতিফ, বাবু প্রতাপ চাঁদ সিংহ এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। এটিই এ-রাজ্যে প্রথম আইন পরিষদ। এই আইন পরিষদের অধিবেশন বসতো লেফটেনেণ্ট গভর্নরের সরকারী বাসভবন বেল্‌ভিডিয়ারে।

এই শাসন সংস্কার ভারতের জনগণের সচেতন অংশকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৮৭৬ সালে ভারত

সভা ও ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় কংগ্রেস উদার-পন্থী রাজনৈতিক সংস্কার এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সম্প্রসারণ ও গণতন্ত্রীকরণ দাবী করে। এরপর ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে Indian Council Act, 1892 অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ আইন গৃহীত হয়। এই আইনবলে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় কুড়ি। এই কুড়ি জনের মধ্যে সাত জন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা বোর্ড, জমিদার সভা, বণিক সভা এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণের বিধান রাখা হয়। ১৯০৫ সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ফলে দেশময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সত্তর হাজার নাগরিকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাঠানো হয়। এ-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ আইন ১৯০৯ (Indian Council Act, 1909) পাশ করেন। এই আইন মর্লি মিণ্টো সংস্কার নামে বেশি পরিচিত। এই আইনে প্রথথ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নীতি শাসন ক্ষেত্রে গৃহীত হলো।

পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশ। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। পরিষদের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার সূচনা এখান থেকেই। ব্যবস্থাপক পরিষদের ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি পেলেও মূলত প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে আসল ক্ষমতা ছিল। এই শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য দিল্লীতে ১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দরবারে ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী যোগ দেন। এই দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেন যে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো। কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হলো। বিহার উড়িষ্যাকে বাংলা প্রদেশ থেকে পৃথক করা হলো ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল থেকে। লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের পরিবর্তে বঙ্গপ্রদেশের জন্য একটি গভর্নর পদের সৃষ্টি হোলো। পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন হলো।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয় (Government of India Act, 1919)। এই আইনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট করা হোলো। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা (Central Legislative Assembly) এবং রাষ্ট্রপরিষদ (Council of State)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য সংখ্যা করা হোলো একশো চল্লিশ। এই প্রথম পরিষদের কাজ পরিচালনার জন্য সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকে। নবাব স্যার শ্যামশুল হুদা প্রথম সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত

হন। পূর্বেকার বেল্‌ভিডিয়ারের পরিবর্তে পরিষদের অধিবেশন স্থানান্তরিত হোলো টাউন হলে। এই আইন অনুসারে গঠিত প্রথম পরিষদে (১৯২১-২৩ সাল) কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলো না। এই সময়ে পরিষদের অন্যতম সদস্য স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্বায়ত্বশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁরই উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় পরিষদ ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯২৩ আইন পাশ করে।

দ্বিতীয় পরিষদে (১৯২৪-২৬ সাল) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তৃতীয় পরিষদেও (১৯২৭-২৯) স্বরাজ্য দল পরিষদে যোগ দেয়; কিন্তু এ-পরিষদের আয়ু ছিল মাত্র আঠারো মাস। চতুর্থ পরিষদের (১৯২৯-৩৬) এক বড়সংখ্যক সদস্য আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। টাউন হলে দশবছর যাবৎ অধিবেশন চলার পর ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে নতুন পরিষদ ভবনে (বর্তমানে বিধানসভা ভবন) স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩৪ সালের ৩১ জানুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভাপতি রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর উদ্যোগে পরিষদ কক্ষে সভাপতির দণ্ড (Mace) ব্যবহারের প্রথা ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয় এবং ১১-ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ সভাপতির দণ্ড প্রথম ব্যবহৃত হয়।

ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ (Government of India Act, 1935) প্রবর্তিত হয় ১ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে। এই আইনে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এই আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্র স্থাপনের বিধান রাখা হলেও শুধুমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত অংশ চালু হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা আড়াইশোজন সদস্যকে নিয়ে, আর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে আসন সংখ্যা তেষট্টি থেকে পঁয়ষট্টিতে সীমাবদ্ধ হোলো। ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হয় ৭ এপ্রিল, ১৯৩৭। ঐ দিন স্যার আজিজুল হক স্পীকার নির্বাচিত হন। এ. কে ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীত্বে এগারো জনের কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১লা এপ্রিল ১৯৩৭। এই মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ছিল ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

১৯৪১ সালের ১-ডিসেম্বর ফজলুল হক পদত্যাগ করেন এবং ১২ ডিসেম্বর প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার স্থায়িত্বকাল ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ পর্যন্ত। ১৯৪৩-এ ২৪শে এপ্রিল স্যার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এ-মন্ত্রীসভার আয়ুষ্কাল ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। যুদ্ধ অবসানের পর ১৯৪৬ সালে সারা দেশে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুরাবর্দির নেতৃত্বে

বাংলাদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ২৩-এপ্রিল। নতুন আইনসভার নবম অধিবেশন হয় ১৯৪৬ সালের ১৪-মে। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে নুরুল আমিন এবং তফাজুল আলি। কমিউনিষ্ট পার্টির নামে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন ; এঁরা হলেন জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালের নতুন সংবিধান প্রনয়ণের মধ্য-দিয়ে স্বাধীন ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত সদস্যরা কাজ শুরু করে দেন। ১৯৫৪ সালের হিসেব অনুযায়ী ২৩৮ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কলকাতার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বাইশ জন ; এঁদের মধ্যে মহিলা সদস্য হলেন দু'জন—ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্ত এবং কালীঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত হন। এ-সময়ে বিধানসভার শিক্ষাদপ্তরের নারী শিক্ষা শাখার ও ত্রাণ-পুর্নবাসন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন শ্রীমতী পুরবী মুখার্জী। ১৯৫৩ সালের ১৮ নভেম্বর কমিটি অনপিটিশনের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শ্রীমতী আভা মাইতি ছিলেন একজন। ১৯৫৩ সালের ১৯ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের নির্বাচিত বিধান সভা প্রতিনিধি সদস্য ছিলেন শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্তা।

১৯৫৫ সালের ২৪০ জন বিধানসভায় সদস্যদের মধ্যে কলকাতার সদস্য সংখ্যা সাতাশ জন। এর মধ্যে মহিলা সদস্য দু'জন মীরা দত্ত গুপ্তা (ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত)। শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন (কালীঘাট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত)। রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে মহিলা সদস্য ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী শান্তি দাস এবং লাবণ্যপ্রভা দত্ত। কমিটি অব প্রিভিলেজের সদস্যদের মধ্যে মহিলা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী অনিলা দেবী ও শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত। কমিটি অন পিটিশনের সদস্য ছিলেন শ্রীমতী আভা মাইতি। ১৯৫৫ সালের ২-মার্চ কমিটি অন পিটিশনের সদস্য নির্বাচিত হন শ্রীমতী শান্তি দাস। ১৯৫৫-এর ১৯-মার্চ নির্বাচনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বিধানসভার প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত হন শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্তা।

১৯৬৭ সালের হিসেব অনুযায়ী মোট ২৮৪ জন সদস্যর মধ্যে কলকাতার সদস্য সংখ্যা বাইশ জন। এর মধ্যে একমাত্র মহিলা সদস্য শ্রীমতী বীভা মিত্র কালিঘাট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপাল কর্তৃক নির্বাচিত মহিলাদের মধ্যে সদস্য হন যথাক্রমে শ্রীমতী অনিলা দেবী (শিক্ষক কমিটির), শ্রীমতী আভা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী রেবা সেন, এবং ডাঃ সরলা ঘোষ। কমিটি অন্ প্রিভিলেজের এবং কমিটি ইন রুলসের সদস্য নির্বাচিত হন শ্রীমতী

ইলা মিত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্টের রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ।

১৯৬৯ সালের নির্বাচিত ২৮২ জন সদস্যদের মধ্যে কলকাতার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৩ জন। এর মধ্যে মহিলা সদস্য শ্রীমতী ইলা মিত্র (মানিকতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন)। কমিটি অন্ এস্টিমেটের সদস্য মহিলা সদস্য শ্রীমতী আভা মাইতি। রোডস এণ্ড স্পেশাল রোড্স ব্রাঞ্চেস অব দি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্ণ্টমেন্টের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী। স্পোর্টস ব্রাঞ্চ অব এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী।

১৯৭৩ সালের ২৮১ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে কলকাতার সদস্য সংখ্যা ২৩ জন। এর মধ্যে মহিলা সদস্য যথাক্রমে শ্রীমতী ইলা মিত্র (মানিকতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত) এবং শ্রীমতী ইলা রায় (জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত)। শিক্ষা দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী অমলা সেন। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্টের রাজ্য সভার মহিলা সদস্য শ্রীমতী পুরবী মুখার্জী। কমিটি অন এস্টিমেটের মহিলা সদস্য যথাক্রমে শ্রীমতী ইলা মিত্র এবং শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৩ সালের ৯-জানুয়ারীর নির্বাচিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বিধানসভার প্রতিনিধি সদস্য এবং বিজনেস এড্ভাইসরি কমিটির সদস্য ছিলেন শ্রীমতী ইলা মিত্র।

১৯৭৭ সালে নির্বাচিত ২৯৫ জন সদস্যর মধ্যে কলকাতার সদস্য সংখ্যা বাইশ জন এদের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য নেই। সমাজকল্যাণ ও ত্রাণবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জী। রাজ্যের বিভিন্নস্থান থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্টের মহিলা সদস্যদের মধ্যে শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীমতী প্রতিভা বোস, শ্রীমতী পুরবী মুখার্জী,—এঁদের সকলের বাসস্থান কলকাতাতেই।

১৯৮২ সালের নির্বাচিত ২৯৫ জন সদস্যের মধ্যে কলকাতার সদস্যসংখ্যা বাইশজন। এ'র মধ্যে মহিলা সদস্য একজনও নেই। সোসাল এডুকেশন, নন ফরমাল এডুকেশন এণ্ড লাইব্রেরী সারভিস ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন শ্রীমতী ছায়া বেরা। ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জী। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের নির্বাচিত কমিটি অব্ প্রিভিলেজের সদস্য শ্রীমতী মহারানী কোঙার। লাইব্রেরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী অঞ্জু কর। রাজ্য বিধানসভার সদস্যকর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য শ্রীমতী কনক মুখার্জী।

১৯৮৭ সালের নির্বাচিত ২৯৫ জন সদস্যের মধ্যে কলকাতার নির্বাচিত ২২ জন সদস্যর মধ্যে মহিলা একজনও নেই। ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। কমিটি অন সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশনের সদস্য

শ্রীমতী মিনতী ঘোষ, কমিটি অন হেলথ্ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এর সদস্য শ্রীমতী কমল সেনগুপ্তা, কমিটি অন লাইব্রেরীর সদস্যারা যথাক্রমে শ্রীমতী অঞ্জু কর, শ্রীমতী মমতা মুখার্জী, শ্রীমতী মমতাজ বেগম, শ্রীমতী অপরাজিতা গোস্বামী।

এভাবেই বিধানসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বে।

রাজ্যের সবচেয়ে দায়িত্বশীল পদ রাজ্যপাল। এ পদেও সংখ্যায় নগণ্য হলেও মহিলার অংশগ্রহণ হয়েছে এবং এই কলকাতারই রাজভবনে যিনি ১৯৫৭ সালে এ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি হলেন শ্রীমতী পদ্মাজা নাইডু।

আইনের আসরে মেয়েরা

কলকাতার হাইকোর্টের বয়স ১২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯৮৭-র ১লা জুলাই অর্থাৎ আজ ১৯৯০-এ কলকাতার ৩০০ বছর পূর্ণে হাইকোর্টের বয়সকাল ১২৮ বছর। আজ কলকাতার হাইকোর্টে নগরীর বহু মহিলা আইনের পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে ন্যায় বিচারের যুক্তিতর্কের মঞ্চে দাঁড়ায় পুরুষের পাশে। কিন্তু এ-কথা বেশী দিনের নয় তাই কলকাতার হাইকোর্টের জন্ম কর্ম নিয়ে আলোচনার গভীরে যাবার জন্য অতীতের স্মৃতির পাতা ওল্টালে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ইংরেজরাজ এদেশে এসেছিলেন বাণিজ্য করতে, কিন্তু রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা ক্রমশঃ এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে তারা। এরপর প্রবর্তিত হল ইংরেজের প্রসাশন ; উদ্দেশ্য তখন ছিল দুটি বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং ইংরেজ এদেশে তার জায়গাও করে নিয়েছিল। প্রশাসন প্রবর্তনের পূর্বেই ইংরেজ এদেশে তার বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। এই বিবর্তনের ফলশ্রুতি ১৮৬২ সালের ১লা জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের জন্ম। সুতরাং কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাক্ জন্মলগ্নের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যায়। ভারতে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাতের পটভূমিকায় বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে সে বিষয়ে আলোচিত হওয়া দরকার।

ভারতে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাতের ইতিহাসকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম পর্বে ১৭২৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মুঘলদের অধীনে নিজেদের জমিদারীতে কিছু কিছু বিচারকার্য করতেন। সাধারণ আদালতগুলি ছিল মুঘলদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিক সংঘ হলেও সে সময়ে এদেশে প্রচলিত জমিদারী আদলেতের মত কোম্পানীর জমিদারীতে এক ধরনের বিচারালয় ছিল। রাজস্ব আদায় মূল লক্ষ্য হলেও এ-সব আদালত নিজস্ব জমিদারী এলাকায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলা-মোকদ্দমার বিচার করত। কিন্তু আইনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জমিদারী আদালত বিচার ক্ষমতা লাভ করে মুঘল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পূর্বদেশে বাণিজ্যের রাজকীয় সনদ লাভ করলেও তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জমিদারী আদালতগুলোর ফৌজদারী ও দেওয়ানী

বিচার ব্যবস্থার উপর ইংলণ্ডের রাজা বা পার্লামেন্টের কোনও নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব ছিল না। ১৬৯৮ সাল থেকে শুরু করে ১৭২৬ সাল পর্যন্ত এ-অবস্থা চলে। ১৬৯৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করার সাথে সাথেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীর জমিদারী আদালতগুলো সৃষ্টি হয়। সুতরাং একথা বলা যায় যে পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে নিজেদের জমিদারী এলাকায় এক ধরনের বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত করে।

দ্বিতীয় পর্বে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের রাজত্ব কালে ১৭২৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজকীয় সনদের ঘোষণাবলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কলকাতার মেয়র আদালত (Mayor's Court) প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেওয়া হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই আদালত প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয় ভারতে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার অগ্রগতি। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের নীতি অনুসৃত হওয়ার পর ১৭৭৪ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের রাজকীয় ঘোষণা অনুসারে কলকাতায় সুপ্রীম-কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মেয়র আদালতের অবসান হয় এবং এদেশে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৭৫৩ সালের ৮ জানুয়ারীর চার্টার বা রাজা দ্বিতীয় জর্জের রাজকীয় সনদের ঘোষণাবলে কলকাতা মেয়র আদালত ছাড়াও Court of Requests নামক এক দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালতে ছোটোখাটো দেওয়ানী মামলার বিচার হত।

মেয়র আদালত স্থাপিত হলেও কোম্পানীর জমিদারীতে অবস্থিত নিজস্ব আদালতগুলো একেবারে উঠে যায়নি। এই দু'ধরনের আদালতগুলোর বিচার পদ্ধতিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেয়র আদালতের বিচার হত ইংলণ্ডের আইনবিধি অনুসারে আর কোম্পানী আদালতের বিচার হত কোম্পানীর নিজস্ব আইন অনুসারে। কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের এলাকা ও ক্ষমতা এই মেয়র আদালতের এলাকা ও ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত, আর আপীল বিভাগের এবং মফঃস্বল আদালতের এলাকা ও ক্ষমতা কোম্পানীর আদালত থেকে উদ্ভূত।

ইংরেজ এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সুশৃঙ্খল বিচার ব্যবস্থা প্রণয়নে প্রয়াসী হল; কিন্তু মেয়র আদালত ও কোম্পানীর আদালত এই দু' ধরনের আদালতের অস্তিত্ব সুশৃঙ্খল বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। এই অন্তরায় অবশ্য দূর হল পরবর্তীকালে। ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। দেওয়ানী লাভের পর থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ও দেওয়ানী বিচারকার্য পরিচালনা করতেন মুর্শিদাবাদ নিবাসী বাঙ্গালার নায়েব নবাব মহম্মদ রেজা খান

এবং পাটনা নিবাসী বিহারের নায়েব সীতাব রায়। এ'রা বাঙ্গালার নায়েবের অধীনে ছিলেন।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর হয়ে এসে প্রথমেই নায়েব নবাবদের ক্ষমতাচ্যুত করে মফঃস্বলের রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। ইতিমধ্যে সরকারী রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং ১৭৭২ সালের ২১ আগস্ট রাজস্ব আদায় এবং সুনিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে এক পরিকল্পনা রচিত হয়। প্রত্যেক কালেক্টরীতে দেওয়ানী মোকদ্দমার জন্য একটি মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হল কলকাতায়। এর নাম হল সদর দেওয়ানী আদালত। এ-ছাড়া ফৌজদারী বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হল এবং কলকাতায় স্থাপিত হল উধ্বর্তন ফৌজদারী আদালত। এর নাম হল সদর নিজামত আদালত। এর সাথে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন হল।

এর পর শুরু হল ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের তৃতীয় পর্ব। মেয়র আদালতের অব্যবস্থার কথা ক্রমশঃ বিলাতের কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হল। ইতিমধ্যে তাঁরা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ও চিন্তা করছিলেন। এর ফলশ্রুতি হল ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণ আইন। এই রেগুলেটিং অ্যাক্টের বিধান অনুসারে ১৭৭৪ সালে ২৬ মার্চের চার্টারে বা রাজা তৃতীয় জর্জের রাজকীয় সনদের ঘোষণা অনুসারে মেয়র আদালতের বিলোপ সাধন করা হল এবং কলকাতা সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হল।

স্যার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। এ'র প্রদত্ত দণ্ডাদেশবলেই ১৭৭৫ সালে ৫ আগস্ট, শনিবার বেলা ন'টায় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। কলকাতা সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পর মেয়র আদালত বিলুপ্ত হল বটে, তবু কোম্পানী আদালতগুলোর অস্তিত্ব থেকে গেল। এরা নিজেদের আইন কানুন অনুসারে বিচার করতে লাগল। ফলে কোম্পানীর আদালত ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে এলাকা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হল। এর ফলে অনিবার্যভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সীল ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যেও বিরোধ আরম্ভ হল। এই বিরোধ চলল ১৭৭৪ সাল থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত। অবশেষে বৃটিশ পর্লামেন্টে ১৭৮১ সালে "Act of Settlement" পাশ করে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন।

১৭৭৫ সালে নিজামত আদালত অর্থাৎ কোম্পানীর সর্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয় এবং নায়েব নাজিব রূপে মহম্মদ রেজাখানের উপর এর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়।

১৮৬২ সালের জুলাই অর্থাৎ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন পর্যন্ত সময় হল চতুর্থ পর্ব। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হল। ভারতের শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হল। ভারত সচিবের নির্দেশ অনুসারে বড়লাট রাজ প্রতিনিধি রূপে ভারতীয় প্রশাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ নিয়ামক বলে ঘোষিত হলেন। বিচার ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। ১৮৬১ সালের ৬ই আগস্ট কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে এক আইন প্রবর্তন করা হল। এই আইনের কিছু অংশ উপস্থাপিত হ'ল—

"Be is enacted by the Queen's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in the present Parliament assembled and by the authority of the same as follows —

1. It shall be lawful from Her Majesty by letters Patent under the Great Seal of the United Kingdom, to earect and eastablish a High Court of Judicature at Fort William in Bengal for the Bengal Division of the Presidency of Fort William aforesaid, and by like Letters Patent to erect and establish like High Courts at Madras and Bombay, for there Presidencies respectively, such High Courts to be eastablished in the said several Presidencies at such times or respective times as to Her Majesty may deem fit, and the High Court to be eastablished under any such Letters Patent in any of the said Presidencies shall be deemed to be established from and after the Pnblication of such Letters Patent in the same Presidetcy, or such other time as in such Letters Patent may be appointed in this behalf.

2. The High Court of Judicature of Fort Willium in Bengal and at the Presidencies of Madras and Bombay respectively shall consist of a Chief Justice and as many judges not exceeding fifteen, as Her Majesty may from time to time think fit and appoint, who shall be selected from :—

1st Barristers of not less than five years standing, or

2nd, Members of the Covenanted Civil Service of not less than ten years standing, and who shall haue served as Zillah Judge., or shall have exercised the like powers of a Zillah Judge, for at least three years of that period, or

3rd, Persons who have held Judicial Office not inferior to that of Principal Sudder Ameen or Judge of Small Causes Court for a period of not less than five years, or

4th, Persons who have been pleaders of a Sudder Court or High Court of a period of not less than ten years, if such pleaders of Sudder Court shall have been admitted as pleaders of a High Court.

... ...

8. Upon the establishment of such High Court aforesaid in the Presidency of Fort William in Bengal, the Supreme Court and the Court of Sudder Dewanny Adawlat and Sudder Nizamat Adalat at Calcutta in the same Presidency shall be abolished."

এই আইনে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলকে প্রয়োজনবোধে দু' বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের অধিকার দেওয়া হল।

এই আইন অনুসারে ১৮৬২ সালের ১৪ই মে'র Letters Patent দ্বারা হাইকোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট হল। এই Letters Petent দ্বারাই হাইকোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট হত।

১৮৬১ সালের ৬-ই আগস্টের ঘোষণা অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টের জন্ম হল ১৮৬২ সালের ১লা জুলাই। তার আগের দিন ৩০শে জুন থেকেই সুপ্রীম কোর্টের কার্যকাল শেষ হয়ে গেল। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণেস পিকক্ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণস পিকক্ ব্যতীত নিম্নলিখিত বিচারপতিগণ কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারকমণ্ডলী—

(১) মাননীয় মিঃ চার্ল'স রবার্ট—ব্যারিষ্টার।

(২) মাননীয় মিঃ মর্জ্যাণ্ট লাউসন ওয়েলশ—ব্যারিষ্টার।

(৩) মাননীয় মিঃ চার্ল'স্ বিনি ট্রেভার—সিভিল সার্ভিস।

(৪) মাননীয় মিঃ হেনরী টমাস রাইকস—সিভিল সার্ভিস।

(৫) মাননীয় মিঃ জর্জ লক—সিভিল সার্ভিস।

(৬) মাননীয় মিঃ ভিনসেন্ট বেইলী—সিভিল সার্ভিস।
(৭) মাননীয় মিঃ চার্লস স্টিয়ার—সিভিল সার্ভিস।
(৮) মাননীয় মিঃ জন প্যাক্সটন নরম্যান—ব্যারিষ্টার।
(৯) মাননীয় মিঃ ওয়াল্টার মর্গ্যান—ব্যারিষ্টার।
(১০) মাননীয় মিঃ ফ্রান্সিস বারিংকেম্প—ব্যারিষ্টার।
(১১) মাননীয় মিঃ ওয়াল্টার স্কট সেইনকার—সিভিল সার্ভিস।
(১২) মাননীয় মিঃ ষ্টুয়ার্ট জ্যাকসন—সিভিল সার্ভিস।
(১৩) মাননীয় মিঃ এডোয়ার্ড ডিলাটুর—সিভিল সার্ভিস।

১৮৬৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর Letters Patent-এ কলকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা ও এলাকা পুনরায় নূতন করে নির্দিষ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইনে কলকাতা হাইকোর্টের এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। কলকাতা হাইকোর্টের যে সব বিষয় ভারত সরকারের অধীন ছিল সে-সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের অধীন হল। এই আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার স্বীকৃত হলেও কলকাতা হাইকোর্টের ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপার প্রাদেশিক আইনসভার ভোট নিরপেক্ষ করা হল। বর্তমানেও হাইকোর্টের ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপারে রাজ্য বিধানসভার ভোট নিরপেক্ষ।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হল। "The High Court of Judicature at Fort William in Bengal"-এর পরিবর্তে এর নাম হল "High Court at Calcutta" কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা এক সময়ে অনেকটা বিস্তৃত ছিল। দেশ বিভাগ ও বিভিন্ন রাজ্যে নূতন নূতন হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ার ফলে এলাকা কমে গেল। বিচার এলাকা পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হলেও ভারতের বিচার ব্যবস্থা কলকাতা হাইকোর্টের সুনাম ও গুরুত্ব শীর্ষস্থানীয়।

১৮৬২ থেকে ১৯৮৭ সাল অর্থাৎ ১২৫ বছরে হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসদের মধ্যে একজনও মহিলা এ-পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। তবে পিউনি জাস্টিস অর্থাৎ ছোট জজ-এর নামের তালিকার সামান্য হলেও দু-চার জন মহিলার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন যথাক্রমে মাননীয়া মিসেস পদ্মা খাস্তগীর (১৭।৬।১৯৭৭), মাননীয়া মিসেস মঞ্জুলা বসু (১৭।৬।১৯৭৭), মাননীয়া মিসেস জ্যোতির্ময়ী নাগ (৮।১২।১৯৭৭), মাননীয়া মিসেস প্রতিভা ব্যানার্জী (১৩।১।১৯৭৮)।

এবার আসা যাক্ কলকাতার বার কাউন্সিলের কথায় যেখানে আইনজীবিদের পেশা শুরুর প্রথমে নাম এনরোল করাতে হয়। এবং কলকাতা শুধু নয় এ-রাজ্যের সমস্ত আইনজ্ঞদের এখানেই নাম এনরোল করে পরিচিতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

বার কাউন্সিলের বয়সকাল অনেক দিন, ১৮৬১ সাল, এ-সময় এর নাম ছিল কলকাতা বার কাউন্সিল। ইণ্ডিয়ান বার কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯২৬ অনুযায়ী কলকাতা বার কাউন্সিল হাইকোর্টের মধ্যেই ছিল, এখানের পেশাদারদের তালিকায় এড্‌ভোকেট, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার সবাই ছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালের সংশোধিত এড্‌ভোকেট এ্যাক্ট অনুযায়ী বার কাউন্সিলের নাম করা হয় পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল এবং দেশের সমস্ত রাজ্যেই একটি করে রাজ্য কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সব প্রাদেশিক বার কাউন্সিলগুলির নিয়ন্ত্রণকারী হল দিল্লীর বার কাউন্সিল। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচনের কাজ শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকেই কিন্তু এ-পর্যন্তও একজন মহিলাকে এ-পদে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়নি।

অবশ্য এ-রাজ্যের কলকাতায় অবস্থিত যে বার কাউন্সিল সেখানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও তাদের নাম এনরোল করছেন এবং বিভিন্ন কোর্টে প্রাক্‌টিস করছেন। এঁদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম মহিলা এল. এল. বি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হলেন জ্যোতির্ময়ী নাগ ; এঁর নাম এনরোলমেণ্টের তারিখ ৫ জানুয়ারী ১৯৪৯ সাল। তবে কর্ণেলিয়াস সোরাবজীর নাম করা যেতে পারে যিনি সম্ভবত প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। এঁর নাম এনরোলমেণ্ট তারিখ ২ জুলাই ১৯২৮ সাল। এছাড়া, পদ্মা খাস্তাগীরের নাম করা যেতে পারে যিনি পুরোনো আইনজ্ঞ এবং পরবর্তীকালে ছোট জজ হন ; এঁর নাম এনরোলমেণ্টের তারিখ মে ১৯৫৭ সাল।

এ-পর্বের আলোচনার ইতি টানবার চেষ্টা করছি বর্তমানের কয়েকটি বছরের মহিলা এডভোকেটের নাম এনরোলমেণ্টের সংখ্যা তালিকার উপস্থাপনের পরই। এ-বিষয়ে দপ্তরের সাহায্যে যে সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাই উপস্থাপিত হল।

১৯৮০	সালের	মহিলা	এড্‌ভোকেটের	সংখ্যা	৯৯	জন
১৯৮১	„	„	„	„	১৫২	„
১৯৮২	„	„	„	„	১১৪	„
১৯৮৩	„	„	„	„	১১৩	„
১৯৮৪	„	„	„	„	১১৪	„
১৯৮৫	„	„	„	,	১৬৫	„
১৯৮৬	„	„	„	„	১৪৯	„
১৯৮৭	„	„	„	„	১১০	„
১৯৮৮	„	„	„	„	১২৩	„
১৯৮৯	„	„	„	„	৬৭	„

(জুন মাস সর্যন্ত)

সমাজে যারা অবহেলিত থাকে

কলকাতা সবার জন্যই খুলে রেখেছে তার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এখানে ধনী দরিদ্রের সহবাস, ধার্মিক অধার্মিক পাশাপাশি পথচলা, সবই আছে। তাই তো বৃহৎ অট্টালিকার পাশে কুঁড়েঘর। মোটরের ধুলোয় জর্জরিত ফুটপাতবাসী, রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা ঝুপড়ির বস্তিবাসী। এ ছাড়াও আছে উদ্বাস্তু, যারা দেশ ভাগের ফলে আশ্রয় নিয়েছে এ-পশ্চিমবঙ্গে এবং এদের একটা বড় অংশ আছেন যারা কলকাতা এসেছে রুটি-রুজির আসায়। জুটিয়েও নিয়েছে কিছু একটা। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাস্তুজমির অংশীদার হয়েছেন,—এ'রা হলেন শরণার্থী'।

একটু ভাল অবস্থা থেকেই শুরু করা যাক্। স্বাধীনতা উত্তরকালের সব থেকে বেদনাদায়ক সমস্যা হলো শরণার্থীর সমস্যা। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে ভারতে শরণার্থীর আগমন ঘটে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সরকার 'সেণ্ট্রাল ক্লেইমস্ অরগ্যানাইশেন' স্থাপন করে ঐ সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত বহুসংখ্যক শরণার্থীকে তাদের বহুবিধলগ্নি, জমা প্রভিডেণ্টফাণ্ড, বেতন, বৃত্তি, ডিভিডেণ্ড, শেয়ার, পেনসন, স্থানান্তরিত করা হয়নি এমন ব্যাঙ্ক আমানত, ডাকবীমা ইত্যাদির জন্য কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন যদিও পূর্বপাকিস্থান থেকে আগত শরণার্থীরা সকলে এসব সুবিধা পান নি। কিন্তু এরফলে শরণার্থীদের যে প্রাথমিক সমস্যা একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই তার বিশেষ ব্যবস্থা হল না। শরণার্থীরা চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার হলেন। তাদের একটা অংশ বাঁচার তাগিদে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পরিত্যক্ত, জলা নীচু ও জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে জবরদখলকারী হিসাবে কলোনী স্থাপন করে বাস করতে থাকেন।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে দেশের সরকার এক ঘোষণায় জানান যে, ইজারা ভিত্তিতে শরণার্থীদের জবর দখল জমির মালিকানা দেওয়া হবে। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০-নভেম্বর রাজ্য সরকার নিজস্ব জমিতে অবস্থিত জবরদখল কলোনীতে শরণার্থীদের নিঃশর্ত দলিল দেবার কথা এক আদেশবলে ঘোষণা করেন। এইসব শরণার্থী একটা বড় সংখ্যার চাপ এসে পড়ে কলকাতায়। জনবহুল কলকাতা হয়ে ওঠে আরও বেশি চঞ্চল। কলকাতায় মাটিতে পা দিতেই এইসব শরণার্থীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আরও বেশী করে—মাথা গোঁজবার মত একটু বাস চাই ; আর জনপ্রবাদ অনুসারে, কোনো কাজ নিশ্চয়ই মিলবে এই কলকাতায়। তাই কলকাতার শরণার্থীর সংখ্যা নেহাত কম নয়।

মানুষই তো নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে, তাই কলকাতায় এসে পড়া এই উদ্বৃত্ত মানুষগুলোকে পাঠানো হোলো কলকাতার আবাণিজ্যিক, অব্যবহৃত হয়ে

পড়ে থাকা জমিগুলিতে। তারা এখানেই জবর দখল করে বসবাস শুরু করলেন। গড়ে উঠলো কলোনী। দক্ষিণ কলকাতাতেই গড়ে উঠেছে শরণার্থীদের জবর-দখল কলোনী। এই সব জবর দখল কলোনী গুলিকে বেশির ভাগ পরবর্তী সময়ে স্বীকৃতি দেবার কথা ওঠে এবং এদেরকে নিঃশর্ত দলিল বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ-কাজ চলতেও থাকে, তবে ধীর গতিতে।

এই যে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু পরিবার এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এইসব পরিবারের মহিলারা সংখ্যাও কম নয়। শহরের বুকে এরা মূলতঃ নিঃস্ব অবস্থায় এসেছে, সহায়সম্বলহীন এইসব পরিবারের মেয়েদের সামনে প্রথমেই যে প্রশ্নটা এসে দাঁড়ায় তা হ'ল আব্রু রক্ষার। বলতে গেলে পর্দানসীন এই মেয়েরা আর পর্দার আড়ালে এক হাত ঘোমটার আড়ালে থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এইসব পরিবারের মেয়েরা নেমে পড়ে পথে রুজির তাগিদে। এ-ঘটনা অবশ্য ধীর গতিতেই চলে। এরই পাশাপাশি প্রয়োজনের তাগিদেই তারা শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ অনুভব করে। বর্তমানে এইসব পরিবারের মেয়েরা "শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত কিম্বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এরা স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করছে, ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে এমনকি সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানেও চাকুরী করছে—কেউবা কেরানী, কেউ বা মাষ্টারী। জীবনযুদ্ধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য এরা পুরুষের পাশাপাশি চলবার চেষ্টা করছে; একই সঙ্গে ঘর গৃহস্থের কাজও এদের সামলাতে হচ্ছে। তবুও সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার সাথী হয়ে এরা এগিয়ে চলেছে শহরের বুকে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দশকের পর দশক, আর বিংশ শতাব্দীকে শেষ করে একবিংশ শতাব্দীকে।

এবার আসা যাক্ ঝুপড়ির কলকাতার কথায়। ঝুপড়ি অর্থাৎ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে, স্টেশনের রেল লাইনের ধারে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় বস্তি যার বাসিন্দারা ছিন্নমূল। এরা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্থানই নয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও এসে আশ্রয় নিয়েছে এই কলকাতায়। আর্থিক দৈন্যের জন্যই তারা গড়ে তুলেছে এই ঝুপড়ি। কলকাতায় এরকম বস্তির সংখ্যা বেশ কয়েকটি —মানিকতলা, কসবা, উল্টোডাঙা, বেলেঘাটা, ট্যাংরা তপসিয়া, কেষ্টপুর, টালিগঞ্জের নালার ধার, বাগমারির খাল পাড়, টালিগঞ্জ স্টেশন, লেকগাডেনস্ ষ্টেশন প্রভৃতি জায়গায় দুর্গন্ধযুক্ত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে উঠেছে এইসব ঝুপড়ি। এইসব বস্তির মেয়েদের জীবনযাত্রার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা বারবার মনে পড়ে যায় যে, চলচিত্রের পর্দায় পরিচালকের হাতে এরা কোনো কোনো সময়ে সমাদৃত হলেও জীবন যাত্রার কঠিন সংগ্রামে এরা জর্জরিত। জীবিকার মধ্যে এরা বেছে নিয়েছে বাবুদের বাড়ীতে বাসনমাজা। রান্নার কাজ, শহরতলীয় ছোট ছোট কারখানায় স্বল্প বেতনের কাজ। এখানেই শেষ নয় রাতের অন্ধকারে

এদের মধ্যে অনেক কুমারী যুবতী মেয়েকেই নেমে পড়তে হয় রাস্তায় পতিতালয়ে না বাস করেও। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কলগার্লের কাজ করবার তাগিদে। কলকাতা আজ তিনশো বছরে পা দিয়েছে। কিন্তু মেয়েদের আব্রু রক্ষায় কি সক্ষম হতে পেরেছে সে। তবে এরই পাশাপাশি দেখা যায়, কিছু মেয়ে সংখ্যায় তারা কম হলেও অল্পবিস্তর পড়াশুনা শিখবার চেষ্টা করে, হাতের কাজশিখে যেমন সেলাই মেশিন চালিয়ে দু'টো পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে। কারণ, কয়েক দশক ধরে সরকারী সাহায্যও তারা পাচ্ছে অল্পবিস্তর।

এবার আসা যাক্ ফুটপাথবাসীর কথায়। সি. এম. ডি.-এ অঞ্চলে ফুটপাত বাসীর সংখ্যা জানা যায়নি, এ-ব্যাপারে বর্তমান রাজ্যপাল প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন, কিন্তু ফুটপাথবাসীরা পুরোপুরি স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ায় এ-সংখ্যা পাননি রাজ্যপাল। কলকাতা এবং বৃহত্তরকলকাতার ফুটপাথবাসীর সঠিক সংখ্যা চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। কলকাতা ফুটপাথবাসীর মানুষের সংখ্যা পুরসভা থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ৬৩ হাজার। কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যপাল ৪০টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি এইসব সংগঠনের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন, কলকাতা ফুটপাথবাসীদের অবস্থার বিষয়ে অবহিত হয়ে সাহায্য করবার। মহিলা সংগঠনগুলির কাছে রাজ্য পাল অনুরোধ জানান, কাশী, বৃন্দাবন ও মথুরা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে সে সমস্ত বাঙালী বৃদ্ধা মহিলা দৈহিক ও মানসিক ভাবে অবসাদ গ্রস্থ তাদের খুঁজে বার করা এবং সাহায্য করা।

এই তো গেল, কলকাতার তিনশো বছর পূর্তির উপলক্ষে সরকারী পদক্ষেপ। এইসব ফুটপাথবাসীর প্রকৃত চেহারাটা কি সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক্। শীতে, বর্ষায়, কাঠফাটা রৌদ্রে বছরের পর বছর ফুটপাথেই এইসব নারী-পুরুষ অতিবাহিত করে। জীবিকার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিটাই প্রধান। তবে বর্তমানে কিছু কিছু মেয়ে বাবুদের বাড়িতে বাসনমাজার কাজ করে থাকে। উল্লিখিত সংখ্যার প্রায় অর্ধেক মেয়ে। এরা সারাদিন পুরুষের মতই ভিক্ষাবৃত্তি করে। বাসনমাজার কাজ, প্রভৃতি করে সন্ধ্যায় ফিরে আসে তাদের আস্তানায়; এখানেই খড়কুটো জ্বালিয়ে চলে খাবার তৈরির প্রস্তুতি। চলে ফুটপাথেই তাদের সংসারের নিত্য কাজ।

কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যপাল অবশ্য বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বস্তি ও ফুটপাতবাসীদের জামাকাপড়, চটি জুতো, ছাতা এবং কমিউনিটি টি. ভি. সেট দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বস্তির মহিলাদের সেলাই মেশিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিছু, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। এ-ছাড়া Calcutta Improvement Trust-এর মাধ্যমেই বস্তিগুলির সংস্কার সাধনেরও প্রচেষ্টা চলছে।

রাইটার্সের কথা

রাজ্য শাসনের কেন্দ্রবিন্দু এই কোলকাতাতেই অবস্থিত। এটি হোলো মহাকরণ অর্থাৎ যার পূর্ববর্তী নাম রাইটার্স বিল্ডিং। এখানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রাজ্য প্রসাশনে একজন মহিলা মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা এবং ৩২,৫০০ জন মহিলা সরকারী কর্মী আছেন। মহিলা সরকারী কর্মীদের মধ্যে ১৮ জন আই. সি. এস.। এ-ছাড়া ১,০৩৫ জন মহিলা হোমগার্ড কর্মী।

রাইটার্সের অভ্যন্তরে কর্মীদের সংখ্যা উপস্থাপনের পর যে দায়িত্ব থেকে যায় তা হোলো রাইটার্সের কিছু কথা আলোচনা করা। আর সেই কারণেই সংক্ষেপে কিছু বলছি। রাইটার্স বিল্ডিংসের আধুনিক নাম মহাকরণ। বর্তমান মহাকরণকে রাইটার্সের তৃতীয় সংস্করণ বলা চলে। জব চার্ণক যখন আধুনিক কলকাতার গোড়া পত্তন করেন, সেই ১৬৯০ সালেই রাইটার্স বিল্ডিংসের প্রতিষ্ঠা। তখনকার রাইটার্স ছিল কলকাতার পুরানো কেল্লার ভিতর। কলকাতার বড় ডাকঘর আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাগোয়া অঞ্চলে পুরানো কেল্লা ছিল। তার মধ্যে নিরাপদ স্থানে হোগলা পাতার ছাউনি, বাঁশ খড় আর মাটি দিয়ে তৈরী হয় রাইটার্স বিল্ডিং। তখন এটি ছিল একটা মেসবাড়ি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরে যেসব সাহেব কলকাতায় আসত, তারা ঐ বাড়িতে থাকতো। কোম্পানীর ভাষার কেরানীকে বলা হত রাইটার। এতএব এদের বসবাসের বাড়ী হিসেবে এর নাম রাইটার্স বিল্ডিং।

১৬৯৫ সালের ২৫ জুন কলকাতার প্রচণ্ড ঝড়ে 'রাইটার্স বিল্ডিংসের কাঁচা বাড়ি ভেঙ্গে পড়লে জোড়া তালি দিয়ে কয়েক বছর চালাবার পর ১৭১৬ সালে রাইটার্সের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। এবং পাকা তিনতলা বাড়ি গড়ে তোলা হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনো রাইটার্সের স্মৃতিচিহ্নই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং, একসময় সেখানে ছিল জংলা পতিত জমি। ১৭৭৬ সালে কলকাতার কালেক্টর টমাস লায়নসকে এই রাইটার্স বিল্ডিংস তৈরী করবার জন্য ষোল বিঘা, সতেরো কাঠা আট ছটাক জমি লিজ দেন। ১৭৮০ সাল নাগাদ 'রাইটার্স বিল্ডিংস' তৈরীর কাজ শেষ হয়। এই ভবনে বিশাল আকারের মোট ঊনিশটা ঘর ছিল। এই ঘরগুলির জন্য টমাস সাহেব মাসে মোট তিন হাজার আটশো টাকা ভাড়া পেতেন। বছর পাঁচেক পর এ-বাড়ীর নতুন মালিক হন রিচার্ড বারওয়েল। বারওয়েল সাহেবের উদ্যোগে রাইটার্স বিল্ডিংস নবরূপ পায়। কিন্তু বারওয়েলের মৃত্যুর কিছুদিন

পর রাইটার্স বিল্ডিংস মেসবাড়ি থেকে বারোয়ারী ব্যবসা-কেন্দ্রের রূপ নেয়। Calcutta Past & Present গ্রন্থে শ্রীমতী ব্লেশিনডেনের বিবরণেও রাইটার্সের একটা ছবি পাওয়া যায় ; —The costly Champagne Suppers' of Writers' Buildings were famous and long did the walls echo to the joyous Song and low rehearsing tallyhoes' of many generations of writers······at least writers were no longer provided with quarters. For same years Writers Building remained deserted, then the sets of apartments were let to private individuals or for office.

১৭৮০ সালে রাইটার্সের মেইন ব্লকের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ১৮৩৬ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসার পর রাইটার্স বিল্ডিংসের ঘরগুলো বড় বড় ব্যবসায়ীদের অফিস করার জন্য ভাড়া দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে রাইটার্স বিল্ডিং মেসবাড়ির অপবাদ ঘুচিয়ে অফিসের সিরোপা পায়। ১৮৮০ সালে ইডেন সাহেব একে সরকারি দপ্তরে পরিণত করেন। তার পর থেকেই রাইটার্স ছিল বৃটিশ ভারতের প্রধান শাসন কেন্দ্র। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করলে রাইটার্স হয় বাংলার প্রশাসন কেন্দ্র এবং 'মহাকরণ' পরিচয় পত্র নেন—এই নামের পরিবর্তণে সময় লেগেছে তিন শতক। মহাকরণে এখন বড় ঘরের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এছাড়া ছোটোখাটো খুপরি বা কক্ষেরও অভাব নেই। মহাকরণের মেইনব্লকের দোতলা-তিনতলার সামনের দিকটার পুরোটাই সংরক্ষিত এলাকা—মন্ত্রী, পদস্থ অফিসাররা বসেন।

মহাকরণের যে গ্রন্থাগারটি আছে তার বয়স বর্তমানে একশ পার হয়ে গিয়েছে। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী'। পাঠাগারটিতে আছে এক লক্ষেরও বেশি বই। মহাফেজখানায় আছে তিন শতকের ইতিহাস আর প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ। ১৮৫৭ সালের আগেকার (১৭৩৮ থেকে ১৮৫৭) সমস্ত রেকর্ড বাঁধিয়ে বই এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এগার হাজার। আর খুচরো নথিপত্রের বাণ্ডিলের সংখ্যাও দশ হাজারের মত। ১৮৫৭ সালের পরের একশো বছরের রেকর্ড বিভিন্নভাবে বাঁধিয়ে বই এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত হাজারের মত।

মহানগরীর পথের ও পরিবহণের কথা

জব চর্ণকের সুতানুটিতে পদর্পণ এবং সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরকে নিয়ে গড়ে ওঠা শহর কলকাতার বয়স আজ তিনশো বছর। এই তিনশো বছরে কলকাতার আয়তন যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে জনসংখ্যা। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দানের জন্য নানান ব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তাঘাট যানবাহনের ব্যবস্থা। কলকাতা পথঘাটের বিষয় কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হয়েছে, বর্তমানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। এ-ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে কলকাতার নক্শার বিষয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

পুরানো কলকাতার প্রথম নক্শা প্রস্তুত করা হয় ১৭৫৩ সালে। নক্শাটি প্রস্তুত করেছিলেন লেফটেন্যাণ্ট ওয়েলস নামে জনৈক সৈনিক। তিনি তাঁর অঙ্কিত নক্শাটির নামকরণ করেছিলেন—প্ল্যান অব ফোর্ট উইলিয়ম অ্যাণ্ড পার্ট অব দি সিটি অব কলকাতা। এই নক্শাটিতে কেবলমাত্র পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলটুকুর নক্শা আঁকা ছিল। এছাড়া আর কোন রাস্তার উল্লেখ ছিল না। ওয়েলসের এই নক্শা আঁকার প্রায় বত্রিশ বছর পরে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল মার্ক উড নামে জনৈক সার্ভেয়ার নতুন করে কলকাতার নক্শা আঁকেন। তিনি কলকাতার নক্শাটি এঁকেছিলেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের কাজের সুবিধার জন্য। এ নকশাটি ছিল ডব্লু ওয়েলসের চেয়ে আরও উন্নতমানের।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই নক্শাটি ১৭৮৫ সালে আঁকা হলেও এটি প্রকাশ হয়েছিল ১৭৯২ সালে। মার্ক উড এর এই নক্শাটিতে সর্বপ্রথম কলকাতার কয়েকটি পরিচিত রাস্তার নাম পাওয়া যায়। এই নক্শাটিতে সর্বপ্রথম বৈঠকখানা স্ট্রীট, বহুবাজার স্ট্রীটের নাম উল্লেখ ছিল। এই নক্শাটি প্রকাশিত হবার দেড় বছর পরে ১৭৯৫ সালের ২-এপ্রিল আরেকজন ইংরেজ সাহেব আপজন একটি নক্শা প্রকাশ করেন। গবেষকদের মতে এটিই অষ্টাদশ শতকের কলকাতার শেষ নক্শা। এই নক্শাটিতে গঙ্গার ওপারের হাওড়ার কিছু অংশও দেখানো হয়েছে অনেক বেশি। তাই নক্শাটিতে রাস্তা ও গলিগুলো ঘিজিঘিজি। এই নক্শাতে কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ড রোড-এর কোন নাম উল্লেখ নেই। প্রাচীন তথ্য ঘেঁটে জানা যায়, ১৮১৭ সালের পর থেকে কলকাতার অধিকাংশ রাস্তার নির্মাণ কার্য শুরু হয়। এগুলি তৈরি করার জন্য বৃটিশ সরকারের তত্ত্বধানে একটি লটারী কমিটি তৈরী হয়। শুধু তাই নয় ১৭৬৬ সালে বৃটিশ সরকার কলকাতাতেই সর্বপ্রথম একটি

সার্ভেয়ার অব বোর্ডস নিযুক্ত করেন। ১৮১৭ সালের আদমসুমারীর পর যে নক্‌শা উপস্থিত করা হয় তাতেই সর্বপ্রথম কলেজস্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোডের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কলকাতায় একসময় বাবু শ্রেণীর লোকছিলেন, যাঁরা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং সামাজিক নানা ব্যাপারে অংশ নিতেন। এ'দের নামে রাস্তার নাম হয়—ছাতুবাবু লেন, খেলাতবাবু লেন, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট প্রভৃতি। পদবী অনুযায়ী রায় পাড়া লেন, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, দত্ত পাড়া লেন প্রভৃতি। কলকাতায় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস, সেই কারণে রাস্তার নামে দেখা যায়—সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল স্ট্রীট, শীতলাতলা লেন, ষষ্ঠীতলা স্ট্রীট, রাধাকান্ত জিউ লেন, সর্বমঙ্গলা লেন, মন্দির স্ট্রীট, মসজিদস্ট্রীট, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, পার্সি বাগান লেন, চার্চ লেন, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, চীনাবাজার স্ট্রীট, ক্যাথিড্রাল স্ট্রীট। বাজারের পরিচিতিতে পাওয়া যায় চেতলা হাট রোড, মার্কেট স্ট্রীট, বাগবাজার স্ট্রীট, রাসমণি বাজার রোড, রাধাবাজার রোড/লেন, পামার বাজার রোড, মুনশী বাজার রোড প্রভৃতি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বহু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের নামাঙ্কিত রাস্তার নাম পাল্টে দেশীয় বিপ্লবী দেশপ্রেমিক, মনীষীর নামে রূপান্তরিত করা হয়। ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট—আবদুল হামিদ স্ট্রীট। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট—বিধান সরণী ; ব্রাবোর্ণ রোড—বিপ্লবী ত্রৈলক্য মহারাজ লেন ; রিপন স্ট্রীট—মুজাফর আহমেদ সরণি ; লিণ্ডসে স্ট্রীট—নেলী সেনগুপ্ত সরণি।

কলকাতার বেশ কিছু রাস্তার নামকরণের মধ্য দিয়ে এই শহরের আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে ; বিশ্বের বিরল ব্যক্তিত্বের নামে—যেমন থিয়েটার রোড হয়েছে শেক্সপীয়ার সরণি, হাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রীট হয়েছে পিকাসোবীথি, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড পরিবর্তিত হয়েছে কালমার্কস সরণীতে ; ধর্মতলা স্ট্রীট হয়েছে লেনিন সরণি ; হ্যারিংটন সিটি হো চি-মিন সরণি।

সবশেষে মহিলাদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য তাদের নামে রাস্তার উল্লেখ করে আলোচনাকে গুটিয়ে নিয়ে আসব। ৭নং ওয়ার্ডের দক্ষিণের রাস্তা ৮ নং ওয়ার্ডের উত্তরের রাস্তা নিবেদিতা লেন। ২৯ নং ওয়ার্ডের উত্তর এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশ মতিলাল শীল ও দেয়ান দেবী খান্না রোড। ৪৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশ নেলী সেনগুপ্তা সরণি ও আউট্রাম রোড, এছাড়া, ৬৩নং ওয়ার্ডের উত্তর অংশ নেলী সেনগুপ্তা সরণির মধ্যে পড়ে। ৪৬নং ওয়ার্ডের পূর্ব রানী রাসমণি রোড। ৫২নং ওয়ার্ডের পশ্চিমঅংশ মির্জা গালিব স্ট্রীট ও রানীরাসমণি রোড। ৭১নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ এবং ৭৩নং ওয়ার্ডের উত্তর অংশের নাম সুহাসিনি গাঙ্গুলী সরণি।

মহানগরীর পথের কথা আপাতত শেষ, এখন আসব পরিবহণের কথায়।

নগরীর সেকালের পরিবহণ বলতে একবাক্যে বলতে হয় ঘোড়ার গাড়ী। সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে বসতেন বাবুরা। এরই পাশাপাশি অন্যতর বাহনটি ছিল পাল্কী। সেকালে পাল্কী প্রধানত অল্প বেতনের অনেক কেরানী বাবু যাতায়াতের কাজে ব্যবহার করতেন। মহিলাদের যাতায়তের জন্য পাল্কীর ব্যবহার অনিবার্য ছিল, দু-পা চলতে গেলেই পাল্কীই মহিলাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। পাল্কী বাড়ীর ভিতরের বা অন্তঃপুরের ফটকে রাখা হত। পাল্কীতে চড়বার পর উভয়পাশের দরজা বন্ধ করে তার সর্বাঙ্গে ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত করা হোতো। এর উদ্দেশ্য, বাইরের লোক মহিলাকে দেখতে পাবে না এবং মহিলাও বাইরের লোককে দেখতে পাবে না। সঙ্গে একজন পরিচারিকা থাকত। পুরানো দাসী হলে পরণে থাকবে সাধারণত কোন ক্রিয়াকর্মে প্রাপ্ত তসরের শাড়ী, পাল্কীর একপাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলবে। অপর পাশে বাড়ীর কোনো পুরানো চাকর যথোপযুক্ত পোষাক পরে ছুটে চলবে। এবং পাল্কীর সামনে চুড়িদার পায়জামা ও চাপরাশধারী একজন পুরানো দারোয়ান মথায় তকমা বিশিষ্ট শামলা পাগড়ী পরে আগে আগে ছুটে চলবে। এত কাণ্ডের পর তবে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা হয়েছে বলে বিবেচিত হোতো। ধীবে ধীরে রিক্সা গাড়ীর প্রচলন হলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মহিলা চড়তে থাকেন। এর কারণ ভাড়া সস্তা।

মোটরগাড়ির আবির্ভাবে মহিলারা তা ব্যবহার করতেন। মেয়েরা স্কুলে যাবার সময় মোটরগাড়ি চড়ে যেত, তবে এ-ব্যাপারে হিন্দু মেয়েদের আব্রু রক্ষায় বাধা পায় সেই কারণে ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারা মোটর গাড়ী চড়তেন স্বাধীনভাবেই। কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয় ১৮৬৪ সালে, এরপর অবশ্য ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চালু হয়। ট্রাম চড়বার ব্যাপারেও মেয়েদের আব্রু রক্ষার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। তবে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা ট্রামেও চড়ত। এখন বাস, অটো, সবই চালু হয়েছে। তাই আজ আর মেয়েদের পথ চলতেও বাধা নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নারী ছিল সম্পূর্ণ পর্দানসীন ; বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত আব্রুর সীমা ছাড়িয়ে সে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আর পাল্কি চড়ে মেয়েদের পথে বেরোতে হয় না। আজ নারীরা এ-ব্যাপারে অন্তত অনেক স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করবার সুযোগ পাচ্ছেন।

খেলার মাঠে মেয়েরা

নবজাগরণের-শতাব্দী হোলো ঊনবিংশ শতাব্দী। মূলতঃ এ-সময় থেকেই তদানীন্তন কয়েকজন সমাজ-সংস্কারকের প্রচেষ্টায় দেশ জুড়ে চলে নারী জাগরণের প্রচেষ্টা, যথা,—সতীদাহ প্রথা বন্ধ, বিধবা বিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ বন্ধ আইন করে কার্যকরী হয়। এ-সঙ্গেই নারীশিক্ষার কাজটা চলতে থাকে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। এ-ভাবেই কখন যেন ঊনবিংশ শতাব্দী বিদায় নিয়ে আগমন ঘোষণা করল বিংশ শতাব্দীর। এ-শতাব্দীর প্রথম দু-এক দশকের পর থেকেই নারী জাগরণের নদীতে জোয়ার আসতে থাকে, অবশ্য বেশ ধীর গতিতেই। নারী এবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এ'ল একেবারে খোলা আকাশের নীচে। শুরু হ'ল মেয়েদের খেলাধূলা।

কলকাতার বয়স যদিও তিনশো বছর কিন্তু খেলার মাঠে কলকাতার মেয়েদের দেখা যেতে থাকে বিংশ-শতাব্দীর-দু-তিন দশক অথবা তার পর থেকেই। তবে তা খুবই নগণ্য সংখ্যার এবং বর্তমানে দু-তিন দশক সময় ধরেই খেলার মাঠে মেয়েদের অনুপ্রবেশের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। প্রধানত, যে সমস্ত বিভাগের খেলায় কলকাতার মেয়েদের প্রবেশ ঘটেছে সেগুলি হোলো যথাক্রমে—ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যাণ্ডবল, ব্যাটমিণ্টন, লনটেনিস, টেবিলটেনিস, রোইং, সাইকেলিং, খোখো, কাবাডি, জিমনাস্টিকস্‌, অ্যাথেলেটিকস্‌, ক্রিকেট, হকি, সুইমিং, ওয়টোর পোলো, ডাইভিং। এছাড়া তীরন্দাজ, রাইফেল শুটিং-এর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু মেয়েদের দেখা যায়। উক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার জন্য সাহায্য নিতে হবে এ-সব বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান এবং কয়েকজন খেলোয়াড়ের। স্বল্পপরিসরে সমস্ত বিষয়ের বিষদ আলোচনা সম্ভব নয়, তাই মোটামুটিভাবে কিছু বলছি।

ফুটবল—কলকাতায় মেয়েদের ফুটবলের ইতিহাস আলোচনা করতে গেল প্রথমেই যে কথাটা মনে হয় তা হোলো, সার্বিকভাবে এ রাজ্যের মেয়েরা খেলা-ধূলার ব্যাপারে পিছিয়ে, কলকাতার মেয়েরা তো আরো পিছনে পড়ে। ১৯৭৫ সালের মে মাসে কলকাতায় আরতি ব্যানার্জীর প্রচেষ্টায় প্রথম গড়ে ওঠে ফুটবল এ্যাসোশিয়েশন। এ-বছরই কোচ সুশীল ভট্টাচার্য কালীঘাট মাঠে আনুমানিক ১০-১৫ টি মেয়েকে নিয়ে ফুটবল প্র্যাকটিস শুরু করান। এদের মধ্যে কলকাতায় অবস্থানকারী মেয়েরসংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশী হবে না। এ'রা হলেন শান্তি মল্লিক, মিনতি রায়, রমা দাস, প্রতিমা বিশ্বাস,—বাকীরা শহরতলী এলাকার। এদের সবাই তখন স্কুলের ছাত্রী। খেলোয়াড়দের তৈরী করে জুলাইয়ে মেয়েদের

প্রথম জাতীয় ফুটবলে লীগ-কাম-নক্-আউট খেলা হয়। মোট প্রতিযোগী ১১টি রাজ্য। বাংলা লীগে ৩-টি ম্যাচে ৬ পয়েণ্ট পেয়ে নক-আউটে যায় এবং ফাইনালে শান্তিমল্লিক দু' গোলে বিদর্ভকে হারায়। সংখ্যায় অল্প হলেও এই কলকাতার মেয়ে শান্তি মল্লিকই কিন্তু প্রথম অর্জুন পুরস্কার পায়। অবশ্য এর-পর কিছু নতুন মেয়ে আসে এবং ১৯৮১ সালে তাইওয়ানে অনুষ্ঠানে বিশ্বকাপে শান্তিমল্লিক, মিনতি রায়, কুন্তলা ঘোষ, রমা দাস, শুক্লা নাগ অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে ২৫-৩০ জন মেয়ে জুনিয়ার, সাব জুনিয়ার-এ প্র্যাকটিস্ করছে। যেহেতু মহিলা ফুটবল এ্যাসোশিয়েশনের নিজস্ব মাঠ নেই, কোনো ক্লাব নেই তাই মেয়েদেরকে কখনও ইষ্টান রেলওয়ের মাঠে, কখনও অন্য কোথাও অর্থাৎ যাযাবরের মতো প্র্যাকটিস্ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ওম্যান ফুটবল এ্যাসোশিয়েশনের সেক্রেটারী কলকাতারই মহিলা আরতি ব্যানার্জী।

ভলিবল—ভলিবলে কলকাতার মেয়েদের প্রবেশ বেশীদিনের নয় অর্থাৎ ১৯৬৭ সাল। মূলতঃ সত্তরের দশকেই কিছুটা কৃতিত্ব লাভ সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত, অনিমা ব্যানার্জীর কথা উল্লেখ্য,—১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রতিবারই তিনি রাজ্যদলে নির্বাচিত হয়েছেন; উত্তরাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবলে কলকাতার চ্যাম্পিয়নশিপেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বর্তমানে কলকাতার প্রায় ১০০ জন মেয়ে প্র্যাকটিস্ করছে। এ'দের মধ্যে মীরা সরকার, তপতী চক্রবর্ত্তী, মিত্রা রায়, শুভ্রা বোস, স্বপ্না দাসের নাম করা যেতে পারে। এইসব কলকাতার মেয়েরা শহরতলীর মেয়েদের সঙ্গে টালীগঞ্জ সুভাষ সংঘ, সুরুচি সংঘ, চেতলা সেণ্টার, বিজয়ী সংঘ, প্রভৃতি ক্লাবে প্র্যাকটিস্ করছে।

বাস্কেটবল—বাস্কেটবলের ইতিহাস কলকাতার ক্ষেত্রে বহু পুরানো। ১৯৩০ সালে এ-খেলা প্রথম শুরু হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা বাস্কেটবল'—সংস্থার মাধ্যমে এ'রা খেলতে থাকেন। শুরুতেই কলকাতার মেয়ে মিসেস সোনিয়া জন এর কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথম দিকে খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মূলতঃই ছিল কলকাতার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা। ক্রমশঃ বাঙালী মেয়েরা অংশ নিতে থাকে। বর্তমানে বাঙালী মেয়েদের সংখ্যা প্রায় আশি শতাংশ; তবে এখনও এটি কলকাতা শহরভিত্তিক এবং কিছুটা শহরতলীভিত্তিকই হ'য়ে আছে। বর্তমানে জুনিয়ার বাস্কেটবলে এবং সিনিয়ার বাস্কেটবলে রেজিষ্টার ইউনিট যথাক্রমে ৮টি এবং ৬টি দল। বর্তমানে যেসব ক্লাবগুলির মাধ্যমে মেয়েরা খেলছে সেগুলি হ'ল—ক্যালকাটা-রেঞ্জার ক্লাব, ক্যালকাটা পার্সিক্লাব, ইষ্টান রেলওয়ে, ক্যালকাটা গুড কাউন্সেল, এণ্টালী এ. সি., রাখীসংঘ, বরিষাক্লাব। এ-সব ক্লাবে অনুশীলন প্রাপ্ত, মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। বাস্কেটবলে কলকাতার মেয়েরা ভালই খেলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য; লিণ্ডা ফার্টাডোর নাম—১৯৬৮ সালে 'অলষ্টার'

নেমেছে। ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত এ-খেলায় অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এ'দের মধ্যে প্রেম পরাশরের নাম করা যেতে পারে যিনি বাংলার হয়ে খেলেছিলেন। বর্তমানে এ্যাসোসিয়েশনের মেয়েদের সংখ্যা ৫০০ জন ; এর মধ্যে কলকাতার মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। বর্তমানে যে সমস্ত কলকাতার মেয়েরা বাংলার হয়ে খেলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী, সোনালী ব্যানার্জী, বিপাশা সেঠ, মৌসুমী নন্দী, বৈশাখী মুস্তাফী, সংগিতা চক্রবর্তী, সুজয়া মুখার্জী। রাজ্য চ্যাম্পিয়নে ১৯৪০-৪১ সাল থেকে যে সমস্ত মেয়েরা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তাঁদের একটা তালিকা রাখা হলো—

১৯৪০-৪১—মিস পি. কুক।
১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৪৪-৪৫—পর্যন্ত কোন টুর্নামেণ্ট হয়নি।
১৯৪৫-৪৬—মিস প্রীতি বোস।
১৯৪৬-৪৭—মিস শীলা ভার্মা।
১৯৪৭-৪৮—মিস শেলী আগের (এ'র সময় ফাইনাল খেলার খেলোয়াড় ঠিক হয়েও খেলা হয়নি)।
১৯৪৮-৪৯—মিস এম্মা সীয়াস।
১৯৪৯-৫০—মিস পি. ঘোষ।
১৯৫০-৫১—মিস ডুরেন ষ্টিভেনস্।
১৯৫১-৫২—মিস ওয়াই মার্টান।
১৯৫২-৫৩—মিস ডরীন ষ্টিভেনস্।
১৯৫৩-৫৪—মিসেস পি. পরাশর।
১৯৫৪-৫৫—মিস ভি. উইলিয়ামসন্।
১৯৫৫-৫৬—মিস মিরা দাস।
১৯৫৬-৫৭—কোনো টুর্নামেণ্ট হয়নি।
১৯৫৭-৫৮—মিস নীলিমা দাস।
১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫—এ দু'বারেই দীপা চ্যাটার্জী।
১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৭-৬৮—সুনন্দা দে।
১৯৬৯-৭০—তুলসী ব্যানার্জী।
১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৮৯—মধুমিতা গোস্বামী।
১৯৮৯-৮০—কোনো টুর্নামেণ্ট হয়নি।
১৯৮০-৮১—থেকে ১৯৮২-৮৩ পর্যন্ত—মধুমিতা গোস্বামী।
১৯৮৩-৮৪—কোনো টুর্নামেণ্ট হয়নি।
১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬—কৃষ্ণা দাস।

১৯৮৬-৮৭—কেয়াবর্মণ।

১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯—কৃষ্ণা দাস।

টেবিল-টেনিস—প্রথম এ নগরীতে এ-খেলা শুরু হয় ১৯৩৪ সালে। তখন এ-খেলায় মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে ধীরে ধীরে মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে। চল্লিশের দশকে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে অর্পিতা ঘোষ, উষা আয়েঙ্গার, কৃষ্ণা মুখার্জী, ডঃ তপতী মিত্র, শকুন্তলা সেন, রবীনা রায় প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে যে সমস্ত মেয়েরা আছেন তাঁরা হলেন রূপালী মুখার্জী, ইন্দুপুরী, পারুল ঘোষ, কল্পনা তেওয়ারী, করবী ঘোষ প্রমুখ। সত্তর এবং আশির দশকের খেলোয়াড়দের মধ্যে দেবযানী বাকচী, শান্তি ঘোষ, কাকলী ভট্টাচার্য, সবিতা পাত্র প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে যে সমস্ত মেয়েরা কলকাতায় খেলছেন সম্ভবত অধ্যবসায়ের অভাবে তাঁরা সামনের সারিতে আসতে পারছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জুনিয়ার, সাব-জুনিয়ার, গার্লস, ওম্যানস্ এ-চারটি বিভাগের মেয়েদের মধ্যে কলকাতা অপেক্ষা অন্য জেলার মেয়েরা ভাল খেলছেন। আর সেই কারণেই ন্যাশানালে কলকাতার মেয়েদের প্রবেশ বলতে গেলে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে এ-এ্যাসোসিয়েশনের কলকাতাবাসী মেয়ের সদস্য সংখ্যা মাত্র ২৮ জন।

এ্যাথেলেটিকস্—পঞ্চাশ বছর ধরে কলকাতায় এ্যাথেলেটিকস্ এ্যাসোসিয়েশন মেয়েদের খেলা পরিচালনা দায়িত্ব নিয়েই করছে। পঞ্চাশ দশকের আগে মূলতঃ কলকাতার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা এ-খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। এ'দের মধ্যে মৌরিন হোল্ডার, এ্যান রিচর্ডসান এর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। পববর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বাঙালী মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে অংশগ্রহণকারী বাঙালী মেয়ে হিসাবে অনিতা মুখার্জীর নাম করা যেতে পারে। তার এ্যাথেলেটিকস্-এ কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির মেয়েদের অংশগ্রহণই বেশী। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী এ্যাথেলেটিক এ্যাসোসিয়েশনের মেয়েদের মোট রাজ্য সদস্য সংখ্যা প্রায় হাজার জনের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশও নয় কলকাতার মেয়ে। তথ্যানুযায়ী ষাটের পরবর্তী সময়ের মেয়েরা হলেন সুব্রতা দেবনাথ, নীলিমা দেশপাণ্ডে, শোভা রায়। বর্তমানে এ'রা কোচ। ১৯৭৫-৭৬-এর মেয়েরা—সুব্রজা ঘোষাল, ঝর্ণা দাস, শর্বরী দাস, শ্যামলী মজুমদার, রেবা দাস, তৃপ্তি দাস প্রমুখ। ১৯৮০-৮১ খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রভাতী শীলের নামোল্লোখ করা যায় যিনি ১৯৮২-র এশিয়ান গেমসের প্রতিনিধি এবং ১৯৮৮-তে ষ্টেটের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বুলা চন্দ (১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ) ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রীতা সেন এশিয়ার হয়ে বিশ্বের প্রতিযোগিতায় (২০০ মিঃ, ৪০০ মিঃ) অংশ নিয়েছেন এবং বহুবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব

করেছেন। বর্তমানে তিনি এন. আই. এস. এর কোচ। স্বাগতা রায় (১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ) বেঙ্গলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালের আগের মেয়েরা—সোনালী ব্যানার্জী, সন্ধ্যা রায়, স্মৃতি মণ্ডল, শেলী দত্ত, বীণা সরকার, রুবী ভৌমিক, রূপা নস্কর, তনুজা দাস, অঞ্জু পালিত, বীথিকা দাস (রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন), রচনা মুখার্জী, শিখা মণ্ডল, ইলা কর্মকার প্রমুখ। ১৯৮৪-৮৫ সালের পরে, চিন্ময়ী দাসগুপ্তা (লং ডিসটেন্সে খেলেন এবং রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন) রীনা দাস, লুইসা ডি. কোস্টা, সাধনা দাস, রীতা দাস, সঞ্চু আইচ, রেবা কর্মকার, কল্যাণী বণিক, সুমিত্রা মজুমদার, নবনীতা রায়, অপরাজিতা ভট্টাচার্য, রীতা বাগ, রিনি ঘোষ, অপর্ণা দত্ত, মিলি দাস, অঞ্জলী সাঁতরা, প্রতিমা দাস, স্বাগতা সরকার, রূপা মজুমদার। ১৯৮৬-৮৭ সালের পর থেকে,—শম্পা, দে, শর্বানী ঘোষ, রীতা পাল, শিল্পী ঘোষ, ভারতী পাল জুলিয়া বিশ্বাস, জবা দাস (লং ডিস্টেন্স রাণার ১৮৮৯ সালে ন্যাশানালে প্রথম হলেন), উমা ঘোষ, রীতা শর্মা, শম্পা বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী বালু, ঝুমা বিশ্বাস, মুক্তি দাস (শর্টপাট থ্রো করেন, ১৯৮৯-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ভাল খেলে ১৯৭৪ এর রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন)। কাকলী দত্ত, সোমা গুহ, অনিতা গুপ্তা, সুখেলা খাতুন, রঞ্জু লাহিড়ী, প্রচিয়ন মেহেতা, রিঙ্কু মজুমদার, দেবযানী পাঠক, মিতা রায়, মিতা সাহা, রেখা সামন্ত, হেমলতা সিং। এই সব মেয়েরা হোলেন এ-রাজ্যের অ্যাথেলেটিকস্ অ্যাসোসিয়েশনের মোট একহাজার সদস্যার মধ্যে কলকাতার মাত্র এক থেকে দেড় শতাংশ মেয়ে।

ক্রিকেট—কলকাতায় ক্রিকেট-খেলা শুরু হয় ১৯৬৯-৭০ সালে কালীঘাট ক্লাবে, উদ্যোক্তা নতু কোলে, কোচ সুনীল দাসগুপ্ত। এ সময় থেকে যেসব মেয়েরা খেলার মাঠে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরতি ব্যানার্জী, কুমকুম দে, শেফালী বসু, রমা চৌধুরী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। এঁরা সবাই কলকাতার মেয়ে। পরবর্তী সময়ে যাঁরা ধীরে ধীরে ক্রিকেটের মাঠ জমিয়ে রাখতেন তাঁরা হলেন বনশ্রী দাস, রমা বোস, সন্ধ্যা মজুমদার, চন্দ্রিমা সাহা, শ্রীরূপা বোস, সিরিন কিয়াস্, ইলা পাল চৌধুরী প্রমুখ। ওম্যান ক্রিকেট ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ কিছু অসুবিধার জন্য মাঝে কিছু দিন খেলা বন্ধ হয়ে যায়, বর্তমানে অবশ্য আবার খেলা শুরু হয়েছে উদ্যোমের সঙ্গে। এরই এক ফাঁকে প্রায় দশবছর বাংলার ক্রিকেট জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপের কাজ করেছে। তবে কলকাতার মেয়েদের যাঁরা মোট রাজ্য সদস্যের আশি শতাংশ, তাঁদের প্র্যাকটিস করবার সুযোগ খুবই কম। শুধুমাত্র কলকাতার হোয়াইট বোর্ডার ক্লাব ও অবসর ক্লাব মেয়েদের প্র্যাকটিস করবার সুযোগ দিচ্ছে। বর্তমানে ওম্যান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শেফালী বসু। এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৩ ; এবং

এ-বছরই এ-রাজ্যে ক্রিকেট সরকারী স্বীকৃতি পায়। তবে নানান অসুবিধার মধ্যে থেকেও ১৯৭৫-এ কলকাতায় দ্বিতীয় জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার চ্যাম্পিয়ন হয় এই মেয়েরাই।

হকি—কলকাতায় হকি খেলার সূচনাকাল পঞ্চাশ পার করে এসেছে। শুধু কলকাতাতেই নয়, ভারতবর্ষে এ-খেলা সবচেয়ে পুরানো খেলা। মূলতঃ সূচনাকাল থেকেই মেয়েরা হকিতে অংশগ্রহণ করে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল কলকাতা পার্কস্ট্রীট আভিজাত্য অঞ্চলের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা। এ-সময়ই ওয়েষ্টবেঙ্গল ওম্যান হকি এ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়; এ-সংস্থা বহুবার ভেঙ্গেছে ও গড়েছে। সূচনা কালে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস লুইস্, সোহিয়াজন প্রমুখ। ধীরে ধীরে বাঙালী মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বর্তমানে এ-সংস্থায় বাঙালী মেয়ের সংখ্যাই বেশী। কলকাতায় সাতটি ক্লাবের মেয়েরা হকি খেলছে। এগুলি হোলো—

(১) ক্যালকাটা রেঞ্জারস্ ক্লাব।
(২) ইষ্টান রেলওয়ে।
(৩) ক্যালকাটা গুড্ কাউন্সিল।
(৪) ইয়াং ষ্টার ক্লাব।
(৫) সাইনিং ক্লাব।
(৬) আদর্শ হিন্দি হাই স্কুল।
(৭) খালসা ব্লুজ।

বর্তমানে এ-শহরে মহিলা হকি খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় একশত। এদের মধ্যে উল্লেখ্য—কৃষ্ণা বোস, শিখা দাশগুপ্তা, মিনতি রায়, শান্তি মল্লিক, রেবা ব্যানার্জী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৯৬৯-তে কলকাতায় তেইশতম জাতীয় হকিতে বিভিন্ন রাজ্যের উনিশটি টিমে মাত্র চারটি বাঙালী মেয়ের মধ্যে অনিতা নন্দী ছিলো একমাত্র কলকাতার মেয়ে।

জিমন্যাস্টিক্স—এ-খেলায় মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটে ষাটের দশকে। কিন্তু সাফল্যও ঘটে। এ-নগরীর মেয়েরা মূলতঃ বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি, চেতলার মহাবীর ব্যায়াম সমিতিতে জিম্ন্যাসটিক্স অনুশীলন করে থাকে। খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখ্য—গোপা চক্রবর্তী (১৯৭৬-এ স্বর্ণপদক পান), মধুমিতা মুখার্জী, অম্বালিকা মজুমদার (টোকিওতে প্রথম এশিয় জুনিয়র জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতায় অংশ নেন)।

সুইমিং, ডাইভিং, ওয়াটার পোলো—এই তিনটিই জলের খেলা এবং কলকাতার যে সমস্ত ক্লাবগুলি এ-খেলা প্র্যাক্‌টিস করায় তারা বেশীর ভাগই এই তিনটি খেলাই একসঙ্গে প্র্যাকটিস করায়। খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশীর ভাগই

একই সঙ্গে তিনটি খেলাতেই কমবেশী দক্ষতা লাভ করে। সব খেলাই বলতে গেলে কলকাতার পুরানো খেলা এবং কলকাতার মেয়েরা মূলতঃ ষাট-সত্তরের দশক থেকেই কমবেশী অংশগ্রহণ করতে থাকে। কলকাতার যে-সব ক্লাবগুলিতে এ-সব খেলার প্রশিক্ষণ চলে সেগুলো হোলো—

(১) ন্যাশান্যাল সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন।
(২) সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব।
(৩) মহিলা সমিতি।
(৪) হাটখোলা সুইমিং ক্লাব।
(৫) বাগবাজার সুইমিং ক্লাব।
(৬) ওয়াই. এম. সি. এ.।
(৭) বৌবাজার ডাইভিং ক্লাব।
(৮) কলেজ স্কোয়ার ডাইভিং ক্লাব।
(৯) শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল।
(১০) সেলফ্ কালচার।
(১১) পি. ওয়াই. এম. সুইমিং ক্লাব।
(১২) ক্যালকাটা স্পোরস্ (টালিগঞ্জ লেক)।
(১৩) ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি।
(১৪) এণ্ডারসন ক্লাব।

এ-সব ক্লাবে যে-সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্র্যাকটিস করে তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যায় হবে প্রায় কুড়ি শতাংশ। খেলার বয়সকাল পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে হবে। উত্তর কলকাতার মেয়ে আরতি গুপ্ত প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন। শুরুতে অবশ্য মেয়েদের সংখ্যায় দুই শতাংশের বেশি ছিল না। কলকাতার ক্লাবগুলিতে মূলতঃ আশি শতাংশ মেয়ে আসে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। দশ শতাংশ উচ্চবিত্ত এবং বাকী দশ শতাংশ নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবার থেকে। বর্তমানে যে সমস্ত মেয়েরা ডাইভিং, সুইমিং, ওয়াটার পোলো খেলায় অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য—শতাব্দী দাস (১৯৭৭-এর বিজয়ী), মথুরা বিশ্বাস (১৯৮৩ সর্বভারতীয় ডাইভিং-এ সেকেণ্ড পজিশন), ঈশানী ঘোষ, ডালিয়া দত্ত, ববি মুখার্জী, ববি গুপ্তা, সুদীপ্তা গুপ্তা, কাকলী মণ্ডল, অনন্যা সেন, এছাড়া আরতি সাহা, ভারতী সাহা, সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, অনুরাধা গুহঠাকুরতা, অপু ব্যানার্জী, গীতা দে প্রভৃতি পুরোবর্তিনীরা সবাই সুনাম কুড়িয়েছেন দীর্ঘদিনের সাধনা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১-এ আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরে ন্যাশান্যাল সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় পাল্লা টানতে এসেই ২০০ মিটার মেডলিতে রেকর্ড হোল্ডার গীতা দে-কে হারিয়ে নাফিসা আলি ভিক্টর স্ট্যাণ্ড

আলো করে দাঁড়ান। চন্দনা সরকার (১৯৭৮-১৯৮৩ পর্যন্ত ডাইভিং-এ টানা চ্যাম্পিয়ন হন)। ওয়াটার পোলোর মেয়েরাও কলকাতার সুইমিং ক্লাবগুলিতে অনুশীলন করে থাকেন এবং এদের মধ্যে ঈশানী ঘোষ, শতাব্দী দাস, সুদীপ্তা গুপ্তা, কাকলী মণ্ডল প্রমুখের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

স্পেক্‌তাকরো—১৯৮৯ এর জুলাই মাসে কলকাতার নেতাজী ইনডোর-স্টেডিয়ামে চতুর্থ স্পেক্‌তাকরো খেলা অনুষ্ঠিত হয় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। মহিলা বিভাগে যোগ দেয় পাঁচটি দল—রাজস্থান, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র; এছাড়া বাংলার তিনটি দল (এ. বি. সি.) সহ মোট আটটি দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। জাতীয় আসরে এই প্রথম মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় এ-রাজ্যে ১৯৮৯-র ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই মেয়েরা অনুশীলন শুরু করেন এবং জুলাই মাসে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ভাল ফলও পান। ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়েই শুরু হয় এ-খেলার অনুশীলন। শুক্লা দত্ত, শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার প্রমুখরা নতুন একটা খেলার আকর্ষণে স্পেক্‌তাকরোর প্রতি আগ্রহী হন। এর মধ্যে শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার কলকাতারই মেয়ে। এছাড়া যেসব মেয়েরা এ-খেলায় অংশগ্রহণ করেন এঁদের মধ্যে কলকাতা-বাসী হলেন—দিপালী দাস, পুষ্প দাস, স্বপ্না সাহা, চৈতালী কর, অনিতা সরকার প্রমুখ। ১৯৮৯-এ প্রথম খেলার আসরে নেমে তারা ভাল ফল দেখিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল খেলবে আশা করা যায়।

সাইক্লিং—কলকাতার সাইক্লিস্টদের মূল সমস্যা কোনো প্র্যাক্‌টিস ট্রাক নেই। এরই সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। এ-কারণেই নগরীর মেয়েরা এ-ধরনের খেলার দিকে একেবারেই ঝুঁকছেন না। এ-ছাড়া কলকাতার যানবাহনের বিরম্বনা নতুন করে মেয়েদের একেবারেই উৎসাহিত করে না। রাজ্যের সাইক্লিস্টদের মধ্যে তাই বেশীর ভাগ মেয়েই শহরতলী এলাকার ও অন্য জেলার। কলকাতার মেয়ে শিখা সেনের নামটিই সর্বপ্রথমে মনে পড়ে। সর্বভারতীয় রেসে শিখা ষোলোটি স্বর্ণপদক পায়। এছাড়া শিপ্রা সেন, বাণী ঘোষের দক্ষতাও প্রশংসার দাবী রাখে।

খো খো—কলকাতার মেয়েদের এ-খেলায় অনুশীলন করবার সুযোগ কম এবং অংশগ্রহণও অন্য জেলাগুলির তুলনায় নগণ্য। কখনও ময়দানে, কখনও বা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের এক কোণে মধুসূদন মূর্তির পাশে; ড্রেস চেঞ্জ করবার জন্য কখনও যেতে হয় রেঞ্জার্স টেন্টে, কখনও বাস্কেটবল টেন্টে, আবার কখনও বিশ্ববিদ্যালয় টেন্টে! তবে এর মধ্যেও কলকাতার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন গত তিনবার ধরে। যদিও এ-খেলার বয়স কম তবুও সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে

মেয়েরা প্রথম তিনদলের (বংলার) মধ্যে থাকে। খেলোয়াড় হিসাবে প্রসঙ্গতঃ পলি লাহিড়ীর নাম করা যেতে পারে।

কবাডি—যদিও কবাডিতে বাংলার মেয়েরা মর্যাদার আসন পেয়েছেন কিন্তু মূলতঃ এতে শহরতলী এলাকার অন্য জেলার মেয়েদের অংশগ্রহণই প্রশংসার দাবী করে। তবে ১৯৭৩-এ কলকাতায় মেয়েদের ফাইনালে মণিকা নাথ-এর কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে।

রাইফেল শ্যুটিং—বেলগাছিয়া ভিলাতে এই ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব প্রায় চার পাঁচ দশক ধরে ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। তবে এ-ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা নগণ্যই বলা যায়। প্রসঙ্গত, রীতা সিংহ-এর নাম করা যেতে পারে যিনি এ-নগণ্য সংখ্যার মধ্যেও নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তীরন্দাজী—ক্যালকাটা আচারীতে প্র্যাক্‌টিস করে মেয়েরা। এক্ষেত্রেও মেয়েদের সংখ্যা কম। প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণা দাস, নন্দা মজুমদার, তপতী দাস, ঝুমা দে, মালা মুখার্জী, কাবেরী দাস এর নামোল্লেখ করা যায়।

স্বল্প-পরিসরে বিষদ আলোচনা করা সম্ভব হল না।

ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্দোলনের মধ্যে নারী

তিনশো বছরের এই নগরী প্রাচীনত্বের গরিমাতেই শুধুমাত্র গরিমান্বিত নয়; আধুনিক ভারতের গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্রও এই নগরী। এ-ঐতিহ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছে এ-নগরী। এযুগ গঠনের নিয়ামক হিসাবে রয়েছে দু'টি শ্রেণী— শিল্প-মালিক ও শিল্প-শ্রমিক অর্থাৎ বুর্জোয়া ও শ্রমিক। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়ে কিছু ইতিহাস থাকলেও কলকাতার শ্রমিক আন্দোলনের একান্ত কোন ইতিহাস সম্ভবতঃ নেই। সর্বোপরি বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের যে-সব ইতিহাস রয়েছে তা' পুরোপুরি ধারাবাহিকতা সম্পন্ন নয়। বর্তমানে সীমাবদ্ধ পরিসরে সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। কিন্তু তিনশো বছরের এ-নগরী গঠনের প্রক্রিয়াতে, কলকাতার শ্রমজীবীদের যে প্রথমাবধি অন্যতম প্রধান অবদান ছিল সেটাকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে। সূতানুটি, গোবিন্দপুর, কালীঘাট, চৌরঙ্গী, বেহালা প্রভৃতি গ্রামগুলি থেকে ক্রমে আরও ছড়িয়ে এলাকা জুড়ে যে মহানগরীর পত্তন ঘটে, সেই নাগরিক সভ্যতার কোন অংশই শ্রমজীবীদের ছাড়া সম্ভব হত না, হয়ও নি।

কলকাতা নগরী পত্তনের মধ্যেই শ্রমজীবীদের আগমন বা উদ্ভব ও বিকাশের কাল শুরু। ১৭১৭ বাদশাহ ফারুকশিয়রের কাছ থেকে ফরমান পাবার আগেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তার কেল্লা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই ব্যাপক শ্রমিক আমদানির সূত্রপাত করে। ১৭৪০-এ সময় কালে বর্গীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মারাঠা খাল খননের কাজে আরও বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের আমদানি ঘটে। ১৭৫৭-তে পলাশীযুদ্ধের শেষে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার পত্তনের পর কলকাতার উত্থান আরও দ্রুতগতি লাভ করে। এ-সময় থেকেই কলকাতা কেবল বাংলা নয়, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সমর্থক হয়ে যায়। ১৭৭২-এর পর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে আর নতুন করে জাহাজ তৈরী করার অনুমতি না পাওয়ায়, এ-দশকের শেষ থেকেই কলকাতায় সমুদ্রগামী বড় জাহাজ নির্মাণ শুরু হয়। ফলে এ-কাজে বেশ কিছু শ্রমিকের সংখ্যা দেখা দেয়। তথ্যানুযায়ী ১৭৫৭-এ কলকাতায় ১২,০০০ কূপ খননকারী ও ৪-৫ হাজার অন্যান্য মজুরের দরকার হয়েছিল। ১৭৬১-তে কেল্লার কাজে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ১৭৫৭-এ ১৩-জুন প্রসিডিংসে, দুর্গ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত কুলিদের কাছ থেকে দেশীয় বেনিয়ারা টাকা কেটে রাখায় শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে পালিয়ে যেতে শুরু করে বলে উল্লেখ করা হয় (ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রসিডিংস

থেকে)। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় কোম্পানী কলকাতা শহরে ব্যক্তিগত কাজে কুলি নিয়োগ রদ করে আদেশ জারী করে ৩রা জানুয়ারী, ১৭৫৮। এতেও অবস্থা সামাল দিতে না পারায় গ্রাম থেকে ৮ হাজার কুলি ধরে আনার জন্য কোম্পানী পরোয়ানা জারী করে ১০ মার্চ, ১৭৬০। ১৩-জুন, ১৭৯৭-এ কাউন্সিলের প্রসিডিংসে আছে, কুলিদের মজুরী থেকে বেনিয়ারা টাকা কেটে রাখায় কেল্লার কুলিদের সঙ্গে প্রায়ই তুমুল গণ্ডগোল চলে।

অষ্টাদশ শতক জুড়েই কলকাতা ক্রীতদাস ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে ইউরোপীয়দের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩০-ডিসেম্বর ১৭৬৩ ইংলণ্ডস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা, ফোর্ট উইলিয়ামকে গোলামব্যবসা ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়ে যে পত্র দেয়, তা দলিলে পাওয়া যায়। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে কলকাতায় বিক্রী করা ছাড়াও, ভারতের বাইরে এখান থেকে দাস চালান দেওয়া হত। ১৮০৭-এ দাস-ব্যবসা এবং ১৮৩৩-এ দাসপ্রথা ইংলণ্ডে বিলোপ হওয়ায়, কলকাতাতেও এ-ব্যবসা বন্ধ হয়।

১৮২৭-এ কলকাতার ওড়িয়া-পাল্কীবাহকদের ধর্মঘটই সম্ভবতঃ মহানগরীর প্রথম ধর্মঘট। কলকাতায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অথচ সবচাইতে চাঞ্চল্যকর আন্দোলনটির সুনির্দিষ্ট সময়কালটি আজও অনির্দেশিত। তবে সেটি সংঘটিত হয় লর্ড বেণ্টিংকের সময়কালে অর্থাৎ ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে। "লবণ-শ্রমিকেরা তাঁদের ২৪-পরগনার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কলকাতার গভর্নর জেনারেলের ভবনের সামনে এসে দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ...৪ জন প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেলের সাথে দেখা করে জানান যে, লবণের দাম ১০ আনা প্রতি মণ ধার্য করা হলেও তাঁদের দেওয়া হয় কম ; তাঁরা নুন তৈরীর জন্য সরকারী দাদনের টাকা পান না,......প্রতি মণ নুন উৎপাদনের পর একটি করে মাটির হাঁড়িতে 'ঠাকুর-বাবু'-র জন্য নুন রেখে দিতে হয়। এই ঠাকুরবাবু হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, যিনি 'বোর্ড অব কাস্টমস্' সল্ট এণ্ড ওপিয়ামের দেওয়ান ছিলেন।" আসলে দুর্নীতির সমগ্র অভিযোগগুলিই ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার জন্য তদানীন্তন ২৪-পরগনার জেলাশাসক ডব্লু. সি. এম. প্লাউডেনকে শাস্তিমূলক অবসর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চাকরী থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে দ্বারকানাথের জীবনীকারের মূল্যায়ন থেকে এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে দ্বারকানাথ চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ১-আগস্ট ১৮৩৪। সুতরাং আন্দোলনটি ১৮৩৪-এর শুরুতেই ঘটে থাকবে।

১৮৩৩-এ 'চার্টার এ্যাক্ট' পুনর্নবীকরণের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার রায়ের কাছে যে সাক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাতে তিনি ভারতের শ্রমিকদের মজুরী, খাদ্যের পরিমাণ ও পুষ্টি, বসত ও পরিধেয় সম্পর্কে যে বক্তব্য বলেন তার মধ্য দিয়ে দুর্দশার বাস্তব

রূপ ছাড়াও, তার সহানুভূতির মনোভাবকেও স্পষ্ট করে দেন। শ্রমজীবীদের সমর্থনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের পরোক্ষ সমর্থনের প্রথম ঘটনা ছিল এটি। ব্রিটেনে দাসব্যবস্থা বিলোপ হবার ফলে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ ও উদীয়মান শিল্প-পুঁজিবাদের উৎপাদন বিকাশের সামনে শ্রমিক, বিশেষতঃ সুলভ শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দেয়। আরও বিশেষতঃ কলোনীগুলিতে। তাতে কোম্পানীর সরকার ১৮৩৮ সাল থেকে সংগঠিতভাবে এখান থেকে ব্যাপকভাবে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রহ করে জাহাজে করে কলোনীগুলিতে পাঠাতে শুরু করে। আড়কাঠির মাধ্যমে প্রতারিত ও প্রলোভিত করে দরিদ্র মানুষদের সংগ্রহ করে এবং জবরদস্তি করে জাহাজে করে প্রেরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা। এর বিরুদ্ধে কলকাতায় ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয় ৯-জুন ১৮৩৮, কলকাতার টাউন হলে যে নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাই সম্ভবতঃ সারাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রমজীবীদের সমর্থনে সভা।

শিল্প বহির্ভূত শ্রমিকদের পর পর ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এই কলকাতা শহরে। সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটি তদানীন্তন জনজীবনের অতি প্রয়োজনীয় অংশ হওয়ায় গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিল। সেগুলির অন্যতম ছিল: ১৮৪৯-র জুন মাসে গরুর গাড়ীর ওপর কর্পোরেশন ট্যাকস্ বসানোর প্রতিবাদে গাড়োয়ানদের ধর্মঘট—যা'তে হাজার হাজার কুলিও যোগ দেয় ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে। ১৮৫১-তেও তাঁরা ধর্মঘট করেন। পুনর্বার করেন ১৮৬২-তে। ১৮৫৬-এর ডিসেম্বরে ভাড়া স্থির করে দেবার প্রতিবাদে গঙ্গার নৌকার মাল্লারা ধর্মঘট করেন। ১৮৫৬-এর আগস্টে ধোলাই-এর হার বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করেন ধোপারা। এই সব ধর্মঘটীরা কলকাতা ময়দানে সভা করতেন বলেও জানা যায়।

আলোচনাকে এবার নিয়ে আসা যাক্ কলকাতার শ্রমিকদের সংঘটিত করার প্রথম উদ্যোগের কথায়। ১৮৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে নানান ঘটনার কথা আছে। এরই পাশাপাশি কলকাতার শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গে উদ্যোগের নতুন ঘটনা ও লক্ষণ চোখে পড়ে। যদিও শিল্প শ্রমিক আন্দোলন তখনও দূরঅস্ত। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন এ-সময়ে যে নতুন মোড় নেয়, তার বৃত্তের মধ্যে এসে পড়ে শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গও। 'তবে এক্ষেত্রে উদ্যোগী সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবতাবাদী এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে। 'প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলন শ্রম-আইন, শ্রমিকদের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরবার পর শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রাথমিক), কারিগরি শিক্ষা, মদ্যপান বন্ধ, সুলভে পত্রিকাপাঠের সুযোগ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এক পয়সা মূল্যের সুলভ সমাচার প্রকাশ শুরু করেন।

১লা আগস্ট, ১৮৭০-এ 'শ্রমজীবী সমিতি' তথা 'ওয়ার্কিংমেন্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত

হয় ; এখানে শ্রমিকরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। ৪ঠা নভেম্বর, ১৮৭১-এ শ্রমিকদের আর্থিক সঞ্চয় নিশ্চিত করার জন্য 'আনা ব্যাঙ্ক' (তদানীন্তন সময়ে বিলেতে শ্রমিক আন্দোলনে পেনিব্যাঙ্কের ন্যায়) প্রতিষ্ঠা করেন শশীপদ বন্দোপাধ্যায়। তিনি এদেশে সর্বপ্রথম শ্রমজীবীদের মুখপত্র—প্রথমে 'বরাহনগর সমাচার' (১৮৭৩) ও পরে 'ভারত শ্রমজীবী' (১৮৭৪) প্রকাশ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকার শ্রমিক-আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্য মহানগরীর জনজীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে,—ঘুসুরী কটন মিলে ১৮৮১ সালে ১০ দিন, ১৮৯০ সালে ৩ দিন, বজবজ জুট মিলে ১৮৯৫ সালে, জুন—১৮৯৬ সালে, ১৯০০ সালে দু'বার ব্যাপক ও বিপুল শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ সালে কলকাতাতেই 'মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন অব কাঁকিনাড়া' নামে সংগঠনের পত্তন হয়। ধর্মীয় আবরণে বা ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে গঠিত এই সংগঠনটি শিল্প শ্রমিকদের সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে একটি কথা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণী-ভিত্তি গ্রহণের পরিবর্তে জাতপাত বা ধর্মের ভ্রান্ত পথে বিক্ষোভ প্রকাশের রাস্তা খোঁজে।

কলকাতার বিংশ-শতাব্দীর সূচনা হয় 'বঙ্গ-ভঙ্গ' বিরোধী ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কলকাতা তথা বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক মনোভাবের প্রসার, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষী, এবং প্রাথমিক শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম উন্মেষ ঘটে এই কাল পর্বেই। তার সাথে রাশিয়ার ১৯০৫-০৭ ব্যাপী বিপ্লব, এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে শ্বেতজাতিকে পরাস্ত করা সম্ভব ও এশিয়াবাসী জাপানের সাফল্যে শ্রমিক আন্দোলনেও যথেষ্ট নতুন আস্থা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে 'সমাজতন্ত্র' নিয়ে এই সময় থেকেই নানান ধরনের আলোচনা আরো ব্যাপক আকার লাভ করে।

১৯০৫ সাল থেকে শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটের প্রবণতা দেখা যায় ব্যাপকভাবে। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ তারিখে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে হরতালের ডাকে কলকাতার শ্রমিকশ্রেণী বিপুলভাবে সাড়া দেন। প্রায় ৭০-টি মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। ১৯০৬-এ বেঙ্গলী পত্রিকায় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। আগষ্টে কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গররা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করেন। ১৯০৮ সালে খিদিরপুর রয়াল ইণ্ডিয়ান ডকইয়ার্ডে সুবিশাল শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যালকাটা টেলিগ্রাফ ডেলিভারী পিওনরা ধর্মঘট করেন। এপ্রিলে ধর্মঘট করেন টেলিগ্রাম সিগন্যালরা। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। 'ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ এ্যাসোসিয়েশন' ও কিছুকাল পর 'পোষ্ঠাললীগ'। ১৯১৪-১৮

সাল ব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাবলীর ফলে কলকাতার শ্রমিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে শিল্পে বিপুল মন্দা, শ্রমিক ছাঁটাই এবং মজুরী হ্রাসের ফলে আবার শ্রমিক আন্দোলনে নতুন উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯২০ সালের শেষ ছ'মাসে কলকাতা ও নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে ৮৯-টি ধর্মঘটের রিপোর্ট পাওয়া যায়।

১৯২০ সালে রাশিয়ার 'তাসখন্দে' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রয়াস চলতে থাকে। পূর্বভারতে মুজফ্ফর আহমেদ, আবদুল হালিম প্রমুখের নেতৃত্বে কলকাতা ও এর উপকণ্ঠ জুড়ে বিভিন্ন অংশের শ্রমিকদের মধ্যে ১৯২৩-২৪ সাল থেকেই কমিউনিস্টরা কাজ করতে শুরু করেন। এ. আই. টি. ইউ. সি-র রাজ্য শাখার আনুষ্ঠানিক পত্তন হওয়ার পূর্বেই এরা শ্রমিকদের মধ্যে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ-দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষতঃ ধর্মঘটগুলির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এঁরাই। ১৯২৪ সালে কলকাতায় এ. আই. টি. ইউ. সি.-র চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে শ্রমজীবীদের স্বার্থকে তুলে ধরে মুজফ্ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রকাশিত প্রথমে লাঙ্গল ও পরে গণবানী। শ্রমিক সমস্যা নিয়ে প্রথম নাটক— কে. সি. রায়চৌধুরীর 'ধর্মঘট' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্কসার্কাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কলকাতার শ্রমিকরা বিশাল মিছিল করে।

১৯২৯ সালে বামপন্থী ও সংস্কারপন্থীদের বিরোধে এ. আই. টি. ইউ. সি. দ্বিধাবিভক্ত হলে কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংস্কার পন্থীদের 'ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে' যোগ না দিয়ে এ. আই. টি. ইউ. সি.-তেই থাকেন। কিন্তু আদর্শগত বিরোধ না থামায় ১৯৩১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ. আই. টি. ইউ. সি.-র একাদশ অধিবেশনে তা তীব্র আকার নেয়। বামপন্থীরা এ-থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করলেন 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।' কলকাতার শ্রমিক আন্দোলনের আদিম যুগে সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র ছিল অসচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। কিন্তু এ-শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ শাসকরা রাজনৈতিক লক্ষ্য 'ভেদ সৃষ্টি ও শাসনের' কৌশল গ্রহণ করার পর তিরিশের দশকে তা শ্রমিক আন্দোলনেও অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালের গোড়াতে গান্ধীজীর সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর সংঘাতের প্রতিফলন বাংলার রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলনে পড়ে। ১৯৩৯-এর শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে প্রাধান্যকে বজায় রাখবার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি মনোযোগী হন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে

পূর্ণ সমর্থন দেন। কিন্তু ১৯৪০ সালের শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্রকে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি দখল বা ভাঙবার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এমনকি অতীতে মে দিবস পালনের প্রস্তুতির জন্য বি. পি. টি. ইউ. সি.-র নেতৃত্বে সব ট্রেড ইউনিয়নগুলির মিলিত উদ্যোগে যে ব্যবস্থা হত, তিনি তাও উপেক্ষা করলেন। বি. পি. টি. ইউ. সি. ঐক্যবদ্ধভাবে মে দিবস পালনের আহ্বান জানালেও, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণামে কলকাতাতে দু'টি স্বতন্ত্র মে দিবস পালিত হয়। ১৯৪১ সালের মে দিবস কংগ্রেস ও বি. পি. টি. ইউ. সি.-র যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালে কলকাতার উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলনগুলির মধ্যে ট্রাম শ্রমিকদের (১৯৪২) ধর্মঘট, পোর্ট কমিশনার্স কর্মচারী ধর্মঘট, কলকাতা কর্পোরেশনের ৮ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্যাসীবাদের পরাজয় কলকাতা তথা ভারতে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে তুঙ্গে তুলল। কলকাতা শহরে শ্রমিক-ছাত্র-যুব মহিলা প্রভৃতি অংশের মানুষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এই সময়ে মধ্যবিত্ত কর্মচারী বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও নতুনভাবে সংগঠিত হতে থাকে। কলকাতার উপকণ্ঠে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট এই সময় তীব্র হয়ে ওঠে।

কলকাতার ই. আই. আর. প্রেস শ্রমিকদের ধর্মঘট (অক্টোবর ১৯৪৫), দমকল কর্মীদের ১১ দিনের লাগাতর ধর্মঘট (এপ্রিল ১৯৪৬), ডাক-তার কর্মীদের ১২-ই জুলাই ১৯৪৬ থেকে লাগাতর ধর্মঘট, এবং এই ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯শে জুলাই সর্বাত্মক হরতাল, সরকারী ড্রাইভারদের একাংশের ধর্মঘট, মেডিক্যাল কলেজ কম্পাউণ্ডারদের ধর্মঘট প্রভৃতি পরিস্থিতিতেই কলকাতা তখন প্রকৃতই অগ্নিগর্ভ। এত মিলিত সংগ্রাম সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হল না। মুসলিম লীগ-এর ডাইরেকট এ্যাকশান-ডে'তে ১৯৪৬-এ কলকাতার মাটি হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লাল হয়ে গেল। সবচাইতে বেশী আক্রান্ত ও ভয়াবহ-ভাবে আহত-নিহত হলেন শ্রমিকরাই, সর্বাধিক বিধ্বস্ত হল কলকাতার দরিদ্র শ্রমিকদের এলাকা ও বস্তিগুলি। এইভাবে ঘটনাবলীর এক বিচিত্র বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ১৫ই আগস্ট ৪৭ স্বাধীনতা এল।

স্বাধীনতার পর ৪২ বছর কেটে গেল। কলকাতার শ্রমিক শ্রেণীর বিন্যাসে নানান পরিবর্তন ঘটেছে, সংগ্রাম-আন্দোলনের ধারারও প্রগতি ঘটে চলেছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মঞ্চে এসে জড়ো হয়েছে নানান ছোট-বড় সংগঠন— এ. আই. টি. ইউ. সি. থেকে বেরিয়ে এসেছে সি. আই. টি. ইউ. ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমানে যার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে। এছাড়া আই. এন. টি. ইউ. সি.

এবং আরো কিছু দলীয় সংগঠন, শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে সরকারী, আধা সরকারী কর্মচারী সংগঠন। এত কর্মকাণ্ডের মধ্যে কিন্তু নারীরাও আছেন। সংখ্যায় পুরুষের সমকক্ষ হতে না পারলেও তাঁরা আজ পর্দা থেকে বেরিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন তাদের অধিকার—মজুরীর, কর্মরত থাকাকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই এ-আলোচনার শেষ পর্যায়ে কিছু কথা রাখবার চেষ্টা হবে। এক্ষণে নারী আন্দোলনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা ৩৩, ০৫, ০৩৬; এরমধ্যে নারীসংখ্যা ১৩, ৭৪, ৬৮৬ জন। এই নারীদের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী কাজে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা ১৬-২০ শতাংশের মত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে কলকাতা যখন তিনশো বছর বয়স নিয়ে নাবী প্রগতির কথা বলছে তখন খুব কম সংখ্যায় নারীই ঘরের বাইরে বেরিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছেন। মহানগরীর বুকে প্রতিদিন যদিও বহু মানুষের ভিড় দেখা যায়, কিন্তু তাদের সবাই মহানগরীর-বাসিন্দা নয়। রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে কলকাতার নারীরা কতটা অগ্রণী এ-বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। তাই কিছু আগে ফিরে যাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী নারীরা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তাই নারীদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজ্যে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের গণসংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন—'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন', 'ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন', 'সারাভারত মহিলা সমিতি'। এই সময় থেকে সমস্ত গণ-আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষজনের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনেব মধ্যে ক্রমশঃ নারী বেশি বেশি সংখ্যায় অংশ-গ্রহণ করতে থাকে। জাতীয কংগ্রেস প্রথম থেকেই নারীর ভোটাধিকারের দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছে, নারীদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছে। নারী জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হতে থাকে এ-শতাব্দী থেকেই, এবং কর্মে নিযুক্ত নারীদের শ্রমিক সংগঠনগুলিও তাদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হবার আহ্বান জানিয়েছে। আজ তাই নারীশ্রমিকরা সম-মজুরী ভোগ করছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে নারীর আইনগত সমান অধিকারের স্বীকৃতির যে তাৎপর্য ছিল, এখন আর সে তাৎপর্য নেই। কারণ সময় অনেকটা এগিয়ে এসেছে। তখনকার ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের প্রগতিশীল ধারা এখন ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল বদ্ধ জলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে একদিন বুর্জোয়ারা যে প্রগতিশীল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিল, আজ তার দিন

শেষ হয়ে গেছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উত্তরণের মাধ্যমে সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এ-প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বলেছে—"ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী খুবই বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে। তারা যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে···।" এই কারণেই নারীদের আইনগত অধিবেশনগুলি স্বীকৃতি লাভের আন্দোলনকেই নারী আন্দোলনের মুখ্য বিষয় করে তুলেছে, এ-স্তর অবশ্য নারী আন্দোলন পার করে এসেছে। তাই বর্তমানে নারী আন্দোলনের ধারার গতি হচ্ছে আইনগত অধিকারগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা।

নারী আন্দোলনের আশুলক্ষ্য—নারীরা প্রথমত সমগ্র সমাজের জনগণের অর্ধেক অংশ এবং পুরুষ শাষিত সমাজে শোষিত, দ্বিতীয়ত, সন্তানের জন্মদাত্রী হিসাবে তাঁদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। কারণ সমাজের ভবিষ্যৎ, সন্তানদের লালন করার, যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদের। তৃতীয়ত, সমাজের সমগ্র শ্রমজীবী জনগণেরও তাঁরা অংশ। শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত মেহনতী জনগণের অংশ হিসেবে তাঁরা সমাজ গঠনের জন্য, সমাজের অগ্রগতির জন্য শ্রম করে। চতুর্থত, নারীরাও পুরুষদের মতো একইভাবে সমাজের অধিবাসী বা নাগরিক। সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক চেতনার উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী জনগণের অংশ হিসেবে সমাজ সচেতন অগ্রণী নারীদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাই বিশেষত নারীর আইনগত অধিকারের দাবি, নারীশিক্ষা প্রসারের দাবি, নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকারের দাবি, পণ-যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য সমাজের সর্বস্তরের নারীরাই সভা সমিতি মিছিল করেন।

শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে প্রথমেই যে সংগ্রামের সঙ্গে নারীদের অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় সে হল তাঁদের কাজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। নারী-পুরুষের মধ্যে মজুরীর বৈষম্য দূর করার লড়াই নারী আন্দোলনের বিষয়। সত্তর ভাগের উপর নারী নিরক্ষর। কলে-কারখানায়, বিভিন্নক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের বিশেষ দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য নারী তাই ক্রমশই সচেতন হতে থাকে। নারী শ্রমিকদের প্রতি যাতে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয় তা অবশ্যই দেখা দরকার। সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্পে আধুনিকীকরণের নামে নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই বন্ধ করা, সর্বক্ষেত্রে কর্মরত নারী পুরুষের সমকাজে সমবেতন আইন, নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধা আইন, চিকিৎসাভাতা, শিশুদের জন্য রক্ষণাগার—এ সবের জন্য আজ তাই

পুরুষের পাশাপাশি নারীও আন্দোলন করছেন ; শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার উপযোগী হয়ে নারীদের তৈরী হতে হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের দাবিদাওয়াগুলি যেমন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাধারণ দাবি-দাওয়ার অন্তর্ভুক্ত তেমনি সেগুলি গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ১৯২১ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে লেনিন বলেন—

'সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে জনগণের মুক্তি, ধনতন্ত্রের কবল থেকে পুরুষ ও ও নারী শ্রমিকদের মুক্তি এগিয়ে চলেছে দুর্নিবার গতিতে। এই লক্ষ্যের পথে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী শ্রমিক ···।'

১৯৭৫ সালে জাতি সংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে' সরকার পক্ষথেকে সারা বিশ্বের কাছে এখানের নারীসমাজের জন্য তাদের কার্যাবলীর কাহিনী প্রচার করেছে। কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক সমান-অধীকারের কথা নারীদের মধ্যে কখনো আশারও সঞ্চার করেছে। ১৯৬৯-৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে যে বিপুল উদ্যোগ ও অগ্রগতি দেখা যায়, তার মধ্যে শহরের গরিব ও মধ্যবিত্ত নারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে। নারীদের যে রাজনৈতিক সংগঠন তার মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে মহিলাসমিতির ভাঙ্গন ধরে। ১৯৭০ সালে সংশোধনবাদীরা পৃথক সমিতি সংগঠিত করে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সূচনা হয়। ১৯৭০-৭১ সালে পুলিশ, সি. আর. পি. ও রাজনৈতিক কারণে নারীদেরও উপর অত্যাচার হয়। কলকাতার রাইবালা দাস (কাশিপুর), কল্যাণী গুহ (যাদবপুর), শিপ্রা সাহা (বেলেঘাটা), রুক্মিনী দাস (বিক্রমগড়) এই অত্যাচারের বলি হন। ১৯৭১-এর শেষের দিকে ও ১৯৭২-এর প্রথমে কলকাতার মিঞাবাগান, কাঁকুরগাছি, নারকেলবাগান, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, প্রায় সর্বত্রই পুলিস, সি. আর. পি. ও রাজনৈতিক গোলো-যোগের কারণে যে আক্রমণ চলে তার বিরুদ্ধে মেয়েরা বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন। গ্রেপ্তার, অত্যাচার, বোমা ও রাইফেলের আক্রমণ উপেক্ষা করে রাতের পর রাত জেগে তারা পল্লী রক্ষা করেছেন ; এমনকি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকাতে ব্যারিকেড রচনা করে প্রতিপক্ষের অভিযান তাঁরা ব্যর্থ করে দেন। দলবদ্ধভাবে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে উদ্ধার করেছেন কর্মীদের। এরই সঙ্গে সন্ত্রাস ও দমননীতির প্রতিবাদে মহিলা সমিতির নেতৃত্বে সভা মিছিল ও সংগঠিত হয়েছেন মহিলারা। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিত মহিলা সমিতি মহিলাদের বর্তমানে এ-রাজ্যে বড় সংগঠন। এ-সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সূচনা যৌথভাবে ১৯৪৪ সালে। এর সদস্য সংখ্যার একটা তথ্য উপস্থাপিত হচ্ছে—

১৯৮৬	১,০৫,০১০.	১৯৮৮	১,৩১,৯৩২
১৯৮৭	১,১৬,৮২৩	১৯৮৯	১,৬১,২৪৯

শ্রমিকরা তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সফলতাস্বরূপ বিভিন্ন অধিকার ফিরে পেয়েছেন। সাধারণ শ্রমিকদের অর্জিত ৮.৩৬ শতাংশ বোনাস চালু হয়েছে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে মূলতঃ দু'টি সংগঠন বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে যাচ্ছে। এ-দু'টি সংগঠন হ'ল সি. আই. টি. ইউ., আই. এন. টি. ইউ. সি.। এছাড়া, আরো কিছু দলীয় সংগঠন আছে। এবং আই. এন. টি, ইউ. সি.-র সদস্য মহিলারা অপেক্ষা সি. আই. টি. ইউ.-র সদস্য মহিলারা সক্রিয়। এই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বেও মহিলারা আছেন। বর্তমানে কলকাতা জেলার সি. আই. টি. ইউ. জেলা কমিটিতে এবং রাজ্য কমিটি এ-জেলার যে সমস্ত মহিলা কর্মীরা আছেন তাঁরা হলেন শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্তা, শিবানী সেনগুপ্তা (পরিবহণ সংস্থা), লীলা দাস (বেঙ্গল ল্যাম্প), গার্গী মুখার্জী (ফিলিপস্)। অন্যান্য জেলার তুলনায় কলকাতার মহিলা কর্মীরা অনেক বেশী সক্রিয় হলেও সংখ্যার দিকদিয়ে তা মোটেই বেশী নয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী সংস্থার কর্মরত মহিলারাও ভাল সংখ্যায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন। তবে এক্ষেত্রে সংক্রিয় অংশগ্রহণের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

নারী আন্দোলনের কথা স্বল্পপরিসরে বলা সম্ভব নয়। তাই অনেক প্রসঙ্গই উপস্থাপিত হ'ল না। তবে বিশ শতাব্দীর কলকাতার নারীরা রাজনৈতিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন বেশ ভাল পরিমাণে, সক্রিয় অংশগ্রহণের সংখ্যা অবশ্য কম।

রূপালী পর্দায় নগরীর অভিনেত্রী

বাংলা সিনেমার প্রযোজনা মূলতঃ কলকাতা ভিত্তিক। সেই কারণে কলকাতার সিনেমা বলতে বাংলা সিনেমার কথাই মনে হবে। দু'একটি ভিন্নভাষার ছবি যে হয়নি তা নয়। তবে মূলতঃ কলকাতার ছবি বলতে বাংলা ছবিই। তাই বাংলা ছবির বিষয়ে আলোচনা করলে কলকাতার ছবি পাড়ায় খবর মিলবে। বাংলা ছবির বর্তমান বয়স ৭৫ বছর। অর্থাৎ বাংলা ছবির সূচনা কাল বিশের দশক। তবে এর আগের কথা কিছু আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

কলকাতায় ষ্টার থিয়েটার মিঃ ষ্টিফেন ১৮৯৬ সালে প্রথম কিছু ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এর পরেই সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফাউন (Father Lafaun) তাঁর ছাত্রদের জন্য কিছু ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা তদানীন্তন কয়েকজন বাঙালী ভদ্রোলোককে আকৃষ্ট করে এবং হীরালাল সেন এ'দের সাহায্যে বাইরে থেকে কিছু ছবি এনে দেখাবার ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৩ সালে জে. এফ, মদন কলকাতার ময়দানে বায়োস্কোপ দেখাবার জন্য তাঁবু পাতলেন। হীরালাল সেন 'আলিবাবা' 'সীতারাম' প্রভৃতি নাটক গুলিকে ফিল্ম করা শুরু করলেন। তবে এগুলি সবই ছিল শুধু ছবি। সিনেমায় তখনও সরাসরি কথা বলার ব্যবহার হয়নি। ১৯৭০ সালে মিঃ জে. এফ. মদন স্থায়ী সিনেমা হল তৈরী করলেন, 'এলফিনৃষ্টোন পিকচার প্যালেস' —বর্তমানে এটিই মিনার্ভা নতুন নামকরণ চ্যাপলিন হল। মিঃ মদন-এর প্রযোজনায় এবং রুস্তমজী দোতিওয়ালার পরিচালনায় ১৯১৯ সালে ৮-ই নভেম্বর প্রথম মুক্তি পেল বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল'।

মিঃ মদনের পর আরো বেশ কয়েকজন প্রযোজক সিনেমা জগতে আসেন। ১৯১৪-১৫ সালে অনাদীনাথ বসু তৈরী করেন অরোরা সিনেমা কোম্পানী এবং তাঁর প্রযোজনায় ১৯২১ সালে তৈরী হয় 'দস্যু-রত্নাকর' ছবিখানি। এছাড়া যে সব ফিল্ম কোম্পানী তৈরী হয়েছিল সেগুলি হল নীতিশ লাহিড়ী এবং ধীরেন গাঙ্গুলীর তৈরী ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী, এই কোম্পানীর প্রযোজিত প্রথম ছবি 'বিলেতফেরত' ১৯২১ সালে মুক্তি পায়। মিঃ মদন প্রায় ১২৭টি ছবি প্রযোজনার কাজ করেন বিশের দশকে। এই দশকে যে সব ছবি পরিচালকের দেখা মেলে তাঁদের মধ্যে মতীশ ব্যানার্জী, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, শিশির কুমার ভাদুড়ী, মধু বোস, নরেশ মিত্র প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বিশের দশকের অহিন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ীর মত অভিনেতাদের পাশাপাশি যে সমস্ত অভিনেত্রীর দেখা মেলে তাঁদের নাম—সবিতা দেবী, মিস্ লাইট, শ্রীমতী রাধা।

বাংলা সিনেমার এই সময়ের অবস্থার পরিচয় পাবার জন্য ১৯২৯ সালে ২৬-নভেম্বর মুরারী ভাদুড়ীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করছি—

"উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বাতন্ত্রের সাধনা, কলাতন্ত্রেও তাই।… …

… .. … … … … … … …

ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়,……

… … … … … …।"

এরপর আসা যাক্ ত্রিশের দশকের আলোচনায়। এই দশকের প্রথম দিকেই সিনেমায় শব্দের ব্যবহার আসে এবং বাংলা সিনেমাতেও আসে বৈচিত্র্য। ১৯৩১ সালের ১৯-শে ফেব্রুয়ারী মদন কোম্পানীর প্রযোজনায় সিনেমায় মুন্নী বাঈ-এর গান, বাংলা সিনেমায় এনে দিল বৈচিত্র্য। ১৯৩১-এর ১১-এপ্রিল মুক্তি পায় এ ছবি। অমর চৌধুরীর পরিচালনায় এই প্রথম সরাসরি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কথা বললেন 'জামাই ষষ্ঠী' ছবিতে ; ছবিটির প্রযোজক মদন কোম্পানী। ছবিতে সরাসবি শব্দের ব্যবহার অভ্যন্তরীণ ষ্টুডিও তৈরীর প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিল। ফলে বেশ কিছু নতুন ষ্টুডিও তৈরী হতে থাকল। এগুলির মধ্যে,—বি. এন. সরকারের 'নিউ থিয়েটার' বাবুলাল চৌহানেব 'শ্রী ভারত লক্ষ্মী পিক্চার", ফিল্ম করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া', 'রাধাফিল্ম', এবং 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম'। ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে প্লে-ব্যাক ব্যবস্থা শুরু হয়। 'নিউ থিয়েটার' ষ্টুডিও-তে 'ভাগ্যচক্র' ছবির সুটিং-এর সময় সরাসরি গানের রেকর্ডিং হয়। বেশীর ভাগ ছবির পরিচালকই এইসময় সরাসরি গানের রেকর্ডিং করেন তাঁর ছবিতে। এই সময়কার ছবি পরিচালকদের মধ্যে যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া (বাংলা সিনেমার ষ্টার), দেবকী বসু, প্রফুল্ল রায়, চারু রায়। এই সময়কার অভিনেত্রীদের মধ্যে চন্দ্রাবতীদেবী, কাননদেবী, ছায়াদেবী, উমাশশী, মেনকাদেবী, যমুনাদেবী, মলিনাদেবী, প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এইসময়কালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে বেশ কিছু ছবি তৈরী হয়।

চল্লিশের দশকে এল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ। একই সঙ্গে এ'ল স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার। বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে', হেমেন গুপ্তর 'ফরটি টু' ছবিতে ফুটে ওঠে সময়কালের ছবি। এইসময়কালেই প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের পাশাপাশি চলে ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার' আন্দোলন। এর সুবাস ছড়িয়েও পড়ে কিছু ছবি পরিচালকের ছবিতে। ফলে ছবিতে আঙ্গিক এবং বিষয়সূচীর পরিবর্তন

লক্ষ্য করা যায়। বাংলা চলচ্চিত্র বাজারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশী অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, সুতরাং হাতছাড়া। নিউ থিয়েটারের দ্বিভাষিক হিন্দি-বাংলা ছবি এক সময় জোয়ার এনেছিল, কিন্তু দুর্দিনে বিমল রায়, নীতিন বসু, কেদার শর্মা, প্রমুখ অনেকেই কলকাতা ছেড়ে বোম্বের পথে পাড়ি দিলেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪) ছবিটি পরিচালনা ক'রে বিমল রায় তখন খ্যাতির শীর্ষে। রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বিনতা রায় অভিনীত ছবিটি বিষয় বৈচিত্র্যে সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিউ থিয়েটার্সের যুদ্ধ পরবর্তী দ্বিভাষিক ছবি, যেমন 'অঞ্জনগড়' (১৯৪৮), 'মঞ্জুর' (১৯৪৯), সেই সাফল্য ধরে রাখতে পারল না। এই সময় বাংলা চলচ্চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাসের মত অভিনেতার পাশাপাশি সুমিত্রাদেবী, শিপ্রাদেবী, মঞ্জু দে প্রমুখ অভিনেত্রীরাও অভিনয় করে চলেছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করে —'ভুলিনাই' (১৯৪৮), দেবকী বসু পরিচালিত অনুভা গুপ্তা ও রবীন মজুমদার অভিনীত 'কবি' (১৯৪৯)। সত্যেনবসু পরিচালিত 'পরিবর্তন' ছবিটি জাতীয় শিশু চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি লাভ করে। তবু সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির অবস্থা ভাল ছিল বলা যাবে না।

স্বাধীনতার লাভের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও সত্যজিৎ রায়। দুজনেই ছিলেন লণ্ডনের প্রচার সংস্থা ডি. জে কোমার-এর কলকাতা শাখায় কর্মরত। সেই সময়ে চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেই দেখা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াসই লক্ষ্য করা গেছে। ব্যতিক্রম যে কিছু ছিল না তা নয়; তবে চলচ্চিত্রকে শিল্পস্বার্থে ব্যবহারের কোন সচেতন প্রয়াস ছিল বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের কাছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রের প্রদর্শন এবং তা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য। লক্ষ ছিল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ও শিল্পমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে একটা সচেতণতা সৃষ্টি করা। এই প্রয়াসের ফলেই চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসাবে দেখা এবং বিচার করার একটা সচেতন প্রয়াস একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হল।

পঞ্চাশের দশকে, ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব। এই প্রয়াস সিনেমা জগতে এনে দিল নতুন দিগন্ত। সত্যজিৎ রায় প্রথম যিনি চলচ্চিত্রকে দেখলেন টকী হিসাবে নয়, সিনেমা হিসাবে। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়নের জন্য বেছে নিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি। দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় মুক্তি পেল ১৯৫৫ সালে। কোনো সরকারের পক্ষে কোন কাহিনী

চিত্রের প্রযোজনা ভারতবর্ষে এই প্রথম। কানে চলচ্চিত্রোৎসবে 'বেস্ট হিউমান ডকুমেণ্ট' পুরস্কার পেল 'পথের পাঁচালী। ১৯৫১ সালে ফিল্মসোসাইটি অবশ্য কিছু ছবি করেছে যার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। মঞ্জুদে, বিকাশ রায় অভিনীত 'বিয়াল্লিশ'; কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ও বসন্ত চৌধুরী, অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা অভিনীত 'মহাপ্রস্থানের পথে'; সত্যেন বসু পরিচালিত ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ অভিনীত 'বরযাত্রী'; সুধীর মুখোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্যবন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীভ 'পাশের বাড়ি'। ১৯৫১ সালেই হঠাৎ দেখা যায় বিদ্যুতের চমক, মুক্তি পেল 'ছিন্নমূল'—ওপার বাংলার বাস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এপার বাংলায় চলে আসা মানুষের জীবনকাহিনী। পরিচালক নিমাই ঘোষ।

১৯৫৪ সালে অগ্রদূত পরিচালিত ও উত্তম-সুচিত্রা, মলিনা দেবী অভিনীত 'সাড়ে চুয়াত্তর'—বাংলা সিনেমায় দেখা গেল নতুন নায়িকা সুচিত্রা সেনকে। ১৯৫৫ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'পথের পাঁচলী'-তে পাই করুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃদ্ধা চুনীবালা, কিশোরী উমা দাশগুপ্তা প্রমুখ অভিনেত্রীকে। ১৯৫৫ সালে বোম্বের রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের অবস্থা নিরূপণের জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত হয়। এতে জানা যায় যে কিছু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও পরিচালকের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল হলেও অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা কর্মীরা। ১৯৪৭ সালের পরে অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি। সেই সময় সাধারণ মেয়ে শিল্পীদের গড়ে মাসিক উপার্জন ১৬ টাকা এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের ১২০ টাকার বেশী ছিল না। কর্মচ্যুত ও অনাহারের ভয়ে অনেক মেয়েকেই ঠিকদারদের অন্যায় ও অপমানকর শর্ত মেনে নিয়ে চলতে হত।

বিশ্বচলচ্চিত্রের মানচিত্রে 'পথের পাঁচালী' ভারতের একটি স্থান চিহ্নিত করে দেওয়ায় সরকারী মহলের একাংশ স্বাভাবিক কারণেই খুশি হলেন, কিন্তু অপর এক অংশ এর বিরোধিতা করলেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে ভারতের দারিদ্র প্রদর্শন করিয়ে সত্যজিৎ রায় বিদেশীদের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ঠ করছেন। এর পরে এঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে সেন্সরসীপ আইন চালু হল এবং একই সঙ্গে নতুন একটি ধারা সংযোজন করে বলা হল যে ছবিতে বিরক্তকর দারিদ্র প্রদর্শন ছাড়পত্র পাবে কিনা তাও সেন্সরশীপের বিচার্য বিষয় থাকবে। এসব সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রযোজনা করবার ক্ষেত্রে কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে এল। অরোরা ফিল্মের প্রযোজনায় সত্যজিৎ রায়ের দ্বিতীয় ছবি মুক্তি পেল 'অপরাজিতা' এবং ১৯১৭ সালে ছবিটি স্বর্ণ সিংহ অর্থাৎ প্রথম পুরস্কার পেল। ১৯৫৮ সালে মুক্তি পেল সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর'।

সত্যাজিৎ রায়ের পাশাপাশি বাংলা চিত্রজগতে এলেন আরো বেশ কয়েকজন পরিচালক যাঁরা চলচ্চিত্রকে ব্যবসায়িক স্বার্থে না দেখে দেখেছেন শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে। তপন সিংহের পরিচালনায় 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৬)। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় 'নাগরিক' (১৯৫২), 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৭), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯)। মৃণাল সেন যিনি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁর প্রথম ছবি 'রাত ভোর' (১৯৫৬), 'নীল আকাশের নীচে' (১৯৫৯)। এছাড়া, অসিত সেন, অজয় কর প্রমুখ পরিচালকের ছবিতে সামাজিক চিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। এসময়কার অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখ্য সুচিত্রা সেন, মঞ্জু দে, শর্মিলা ঠাকুর (অপুর সংসারের নায়িকা, ১৯৫৯). চারুবালা দেবী, মাধবী মুখার্জী প্রমুখ।

কলকাতা অঞ্চলের নির্মিত ছবির কিছু সংখ্যাতত্ত্ব উপস্থিত করছি—

	বোম্বাই	কলকাতা
১৯৪৬	৭৭%	১১%
১৯৪৯	৬০%	১১%
১৯৫৪	৫০%	৩১%
১৯৫৯	৩৮%	৪৬%

ষাটের দশকে বাংলা সিনেমায় এল প্রাণের জোয়ার। সত্যজিৎ রায় একাধারে বেশকিছু ছবি করলেন—'কাঞ্চনজঙ্ঘা' 'মহানগর', 'চারুলতা' (১৯৬৪), 'নায়ক' (১৯৬৬), 'গুপীগাইন বাঘা বাইন'। ঋত্তিক ঘটকের 'সুবর্ণ রেখা'য় (১৯৬৫) পাই নায়িকা হিসাবে মাধবী মুখার্জীকে। তপন সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৬০) -এর অভিনেত্রী অরুন্ধতী দেবী। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমলগান্ধার ও 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়িকা সুপ্রিয়াদেবী। মৃণাল সেনের পরিচালনায় ছবিগুলি 'পুনশ্চ', 'প্রতিনিধি', 'আকাশ কুসুম'। রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা'।

ভারতবর্ষে ১৯৫২ সালের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব (International Film Festival) অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে এবং ১৯৭০ সাল থেকে এই উৎসব বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৬১ সালে পুনাতে প্রতিষ্ঠিত 'ফিল্ম ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়া' হওয়ায় বেশ কয়েকজন নতুন ভাল অভিনেত্রীকে সিনেমার পর্দায় দেখা যায়। এ'রা যদিও বাংলা হিন্দি উভয় ছবিরই অভিনেত্রী তবে বাংলা ছবিতে কম হলেও ভাল অভিনয় দেখিয়েছেন—শাবানা আজমী, জয়া ভাদুরী প্রমুখ। ষাটের দশক থেকেই কর্মাসিয়াল ছবি করবার দিকে পরিচালকদের প্রবণতা একটু একটু করে ঝুঁকতে থাকে। এই দশকের

অভিনেত্রীরা—অরুন্ধতী মুখার্জী, সন্ধ্যা রায় ('গঙ্গা', ১৯৬০, রাজেন তরফদার), সুপ্রিয়াদেবী (মেঘে ঢাকা তারা, ১৯৬০, ঋত্বিক ঘটক), তন্দ্রাবর্মন ('নীশিথে',), অপর্না সেন ('তিনকন্যা', ১৯৬১, সত্যজিৎ রায় এবং 'আকাশ কুসুম', ১৯৬৫, মৃনাল সেন), সুচিত্রা সেন ('সপ্তপদী', ১৯৬১, অজয় কর এবং 'সাত পাকে বাধা' ১৯৬৩, অজয় কর), ওয়াদিয়া রহমান ('অভিমান', ১৯৬২, সত্যজিৎ রায়), শর্মিলা ঠাকুর ('বাইশে শ্রাবণ', ১৯৬০, মৃণাল সেন), এবং 'নির্জন সৈকতে', ১৯৬৩, তপন সিনহা), মাধবী মুখার্জী ('চারুলতা', ১৯৬৪, সত্যজিৎ রায়)।

সত্তরের দশকে এসে দেখা যায়, বাংলা ছবিতে হিন্দি ছবির ছোঁয়া লেগেছে। বাস্তবের কোন নারী-পুরুষের পরস্পরকে ভাললাগা ও ভালবাসাকে কেন্দ্র করে কিছু ছবি তৈরী হতে থাকে। কিন্তু এরই পাশাপাশি বেশ কিছু ছবি তৈরী হ'ল যার বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক কথাবার্তা প্রকাশ পেয়েছে। এমনি কিছু ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে—সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০), 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩, এখানে বাংলাদেশের নায়িকা ববিতা)। মৃণাল সেন পরিচালিত ছবি, 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা, ৭১', 'পদাতিক' 'কোরাস'। ছবির সংখ্যা স্বল্প হলেও রাজেন তরফদারের ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'পলাতক' তাঁর পরিচালিত ১৯৭৫ সালের ছবি, নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যা রায়।

উল্লিখিত পরিচলেকদের পথ অনুসরণ করে সত্তর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের প্রথম দিকে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এসেছেন গৌতম ঘোষ, বিপ্লব রায় চৌধুরী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী পূর্ণেন্দু পত্রী, নবেন্দু চ্যাটার্জী, রাজা মিত্র, অপর্ণা সেন প্রমুখ। ১৯৮৫ সালে কলকাতায় চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং চলচ্চিত্রের আরো উন্নতি সাধনের গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে তৈরী হ'ল রাজ্য সরকারের ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশণের প্রচেষ্টায় 'নন্দন' প্রেক্ষাগৃহ, উদ্বোধন করলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৮৬ সালে কলকাতায় প্রথম রঙীন সিনেমার ল্যাবটারির ব্যবস্থা হ'ল। এই সময়কার কিছু ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'দূরত্ব', ১৯৭৮, পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর ; মমতা শঙ্কর এ-সময়কালের অভিনেত্রী,—১৯৮১ সালে তৈরী হয় 'দখল' ছবি, এ ছবিতেও তিনি নায়িকা, ছবিটির পরিচালক গৌতম ঘোষ। 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮১, পরিচালক মৃণাল সেন,)। 'পরমা' ছবিটি অপর্ণা সেনের দ্বিতীয় ছবি, এ-ছবিতে অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জীকে দেখা যাবে। অপর্ণা সেনের আগে মহিলা পরিচালক হিসাবে আর মাত্র একজনের নাম করা যেতে পারে, ইনি হলেন অরুন্ধতী দেবী, তাঁর পরিচালিত ১৯৬৬ র ছবিটি হ'ল 'ছুটি'। অপর্ণা সেনের পরিচালনায় প্রথম ছবিটি হোলো 'থার্টি সিক্স

চৌরঙ্গী লেন'। ১৯৮৯-৯০ সালে তাঁর পরিচালিত টেলিফিল্ম 'পিকনিকে'-এ পাই শাবানা আজমী, শ্রীলা মজুমদার প্রমুখ অভিনেত্রীকে। ১৯৯০ সালে অর্থাৎ নব্বই-এর দশকের শুরুতেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে তাঁর ছবি 'সতী'—দর্শকের সামনে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে, এ-ছবিতে নায়িকা চরিত্রে দেখা যাবে শাবানা আজমীকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ন্যাশনাল ফিল্ম পলিসি প্রস্তাব দিয়েছিল চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমী গঠনের। এই অ্যাকাডেমী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করবে যেখানে ভাল ছবি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প পরিবেশন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, আদুর গোপাল কৃষ্ণম, শ্যাম বেনেগল, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ পরিচালকগণ অনুরোধ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু গত নয় বছরে কিছুই হয়নি। সম্প্রতি রাজ্য সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স চালু করবার কথা ঘোষণা করেছেন। এ নিয়ে অবশ্য কাগজপত্রে বিতর্কও হয়েছে বেশ কিছু।

১৯৯০ সালে আর একজন নতুন মহিলা পরিচালকের নাম করা যেতে পারে—মিঠু মুখার্জী (ছবি 'আশ্রিতা')। কলকাতার সিনেমায় মহিলা অর্থাৎ অভিনেত্রীদের পরিচয়ের সাথে সাথে দীর্ঘ ৭৫ বছরের বাংলা সিনেমার আলোচনা করতে করতে যে কথাগুলি মনে হয়, তা হোলো এই কলকাতার মাটিতেই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে বিশের দশকে অভিনেতাদের পাশাপাশি কয়েকজন অভিনেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কিছু চলচিত্র প্রেমী পরিচালক যে নিছক জুটি তৈরীর সূচনা করেছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে অর্থাৎ নব্বই-এর দশকের দ্বারদেশে এসে সেই চলচ্চিত্র জগতের বৃক্ষটি ফলভারে একেবারে শায়িত না হলেও বিকশিত বলতে দ্বিধা করলে চলবে না। নব্বই-এর দশকের শুরুতেই তাই আমরা সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালকের ছবি 'গণশত্রু'-র (১৯৯০) উপস্থিতি দেখতে পাই। এ-ছবিতে অভিনেত্রী হিসাবে পাই মমতা শঙ্কর, রুমাগুহ ঠাকুরতা প্রমুখকে। তবে আলোচনা যখন উঠলই তখন বলা যেতে পারে যে, শুরুতে ছবি যেভাবে দর্শকের সামনে মনোরঞ্জনের পাশাপাশি ক্রমশঃ শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল সত্তরের দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকে এসে সেখানে তার অনুপস্থিতি যেন নজরে পড়তে থাকে। এ-সময়ে ছবিতে সেক্স, ভায়োলেন্সের উপস্থিতি যেন ক্রমশঃই বাংলা ছবির মর্যাদাকে খাটো করতে থাকে। তবে এরই মধ্যে কয়েকটি ভাল ছবি কলকাতার দর্শককে নাড়া দিয়েছেন তার উল্লেখতো করাই হয়েছে। কলকাতার সিনেমাতে অভিনেত্রীদের বিষয়ে আলোচনার যবনিকা টানবার আগে

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একটা অভিনেত্রী তালিকা রেখেই আমার আলোচনার ইতি টানব।

৭৫ বছরের চলচ্চিত্র জগতে একধর্মী অত্যুচ্চমানের অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন—চন্দ্রাবতী, কাননবালা, রাণীবালা, পদ্মাবতী, ভারতী, সন্ধ্যারাণী, রাজলক্ষ্মী (বড়) সুমিত্রাদেবী, সুনন্দা ব্যানার্জী, শোভা সেন, সুপ্রভা মুখার্জী, সাধনা বসু, সাবেত্রী চাটার্জী, রমলা, সুচিত্রা সেন, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, কাবেরী বসু, অরুন্ধতী দেবী, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখার্জী, শর্মিলা ঠাকুর, তনুজা, মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায়, শ্রীলা মজুমদার, কাজল গুপ্ত, প্রণতি ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, দীপ্তি রায়, মমতা শঙ্কর, নন্দিনী মালিয়া।

অন্যান্য অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন, উমাশশী, যমুনা বড়ুয়া, জ্যোৎস্না গুপ্তা, শান্তি গুপ্তা, মেনকা, দেববালা, নিভাননী, প্রভা, সবিতা বসু, সুমিতা সান্যাল, মালা সিন্হা, শিপ্রা মিত্র, বাণী গাঙ্গুলী, তপতী ঘোষ, শর্মিতা বিশ্বাস, লিলি চক্রবর্তী, অঞ্জনা ভৌমিক, সুলতা চৌধুরী, রত্না ঘোষাল, রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী, মুনমুন সেন, আলপনা গোস্বামী, সংঘমিত্রা ব্যানার্জী, স্বাস্তনা বসু।

কৌতুকাভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে।—ত্রিশদশকদের হরিসুন্দরী (ব্ল্যাক)—'প্রভাস মিলন', তরুণী, 'প্রফুল্ল', 'তরুবালা' ছবিতে অভিনয় করেন। কমেডিয়ান উমাবতী (পটল)—'খাসদখল', 'বেজায় রগড়' ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকাশমণি কমেডিয়ান চরিত্রের অভিনেত্রী 'তরুণী', 'হারানিধি', 'কচিসংবাদ' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

ঠিক পঁচিশ বছর আগে ঋত্বিক ঘটক লিখেছিলেন, এদেশের ছবি করনেওয়ালারা সমালোচকদের কাছ থেকে কোনো রকম সৃষ্টিশীল সাহায্য পাচ্ছেন না। বাংলা নাটকের মতোই বাংলা ছবির জগতে শিশু চলচ্চিত্রের দিকটি ভীষণভাবে অবহেলিত। ফিল্ম সোসাইটি বছরে দু' তিনটি প্রযোজনা, একবার শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ছাড়া কিছুই করে না। এক্ষেত্রে শিশু শিল্পী (মেয়ে ও ছেলে উভয়ই) তৈরীর প্রকোষ্ঠ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দু'-তরফেরই পরিকল্পনা নিয়ে করবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

এভাবেই কলকাতার চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীরা চলচ্চিত্র জগতে কাজ করে চলেছেন। ভবিষ্যতে আরো ক্ষমতা সম্পন্ন অভিনেত্রীকে কলকাতার চলচ্চিত্র দর্শক পাবে এ আশায় রয়েছে।

সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে মেয়েরা

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে কলকাতার সংস্কৃতি কেমন ছিল, কেমনই বা ছিল তার নাট্যশালা, এ-বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কলকাতার প্রথম বাংলা নাট্যশালা বলতে ১৭৭৫-এ প্রতিষ্ঠিত হেরাসিম লেবেদফের নাট্যশালাকেই বুঝতে হয়। যেখানে শুরু হযেছিল 'দ্য ডিসগাইজ' এবং 'লাভ ইজ দ্য বেষ্ট ডক্টর-নাটক দু'টির বাংলা রূপান্তর। কিন্তু এর আগেও সাহেবরা কলকাতায় ইংরেজী নাটক করতেন। ১৭৮৩ সালে এরকম একটা খবর পাওয়া যায় উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথায় আছে ফ্রান্সিস রাণ্ডেল নামে একজন কোম্পানীর অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেন হয়ে কলকাতায় আসেন। ইংলণ্ডে অ্যামেচার মহলের অনেক থিয়েটারে বেশ সুনাম করে তিনি এদেশে আসেন। রাণ্ডেল যখন কলকাতায় আসেন তখনও শহরে বেশ বড়সড় একটি পাবলিক থিয়েটার ছিল এবং সেটা সকলে মিলে চাঁদা দিয়েই চালাতেন।

লেবেদফের আত্মকথা থেকে জানা যায় কলকাতায় একটি থিয়েটার ছিল যাকে তিনি কোম্পানীর থিয়েটার বলে উল্লেখ করেছেন। শোনা যায় তার নাম ছিল নিউ প্লে-হাউস ওরফে ক্যালকাটা থিয়েটার। কলকাতায় ইংরেজদের থিয়েটার বলতে দি চৌরঙ্গী থিয়েটার, সাঁসুসি থিয়েটার এই ধারাকেই মেনে চলছিল। রাণ্ডেলের পরিচালনায় পাবলিক থিয়েটার কলকাতার এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ভঙ্গি ও মঞ্চশিল্প দুয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সেই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে অভিনেত্রী আনানোর কৃতিত্বও তাঁর।

উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে কলকাতার বাঙালী জীবনের ওপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। আমোদপ্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, হাফ্‌আখড়াই নিয়েই ছিল তাঁর সন্তুষ্টি। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের (হিন্দুকলেজ ১৮১৭) সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী কাব্যনাটকের সাথে পরিচয়ের সুবাদে নাট্যশালা সম্পর্কে বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করে। স্বভাবতই এর ফলে সম্ভ্রান্ত ও ধনীরা আকৃষ্ট হন। ১৮৩১-এ প্রসন্নঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে শেকস্‌পীয়রের জুলিয়াস সিজারের অংশাবিশেষ এবং ভবভূতির উত্তর রাম চরিত ইংরেজীতে প্রদর্শিত হয়। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু ১৮৩৫-এ নাট্যশালা স্থাপন করে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করান। নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় রাধামনি অভিনয় করেন। ১৮৫৭-এ কলকাতার সিমলা অঞ্চলে আশুতোষ দেবের বাড়ি 'শকুন্তলার' অভিনয়ে একটি নতুন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানে টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিটে রামজয় বসাকের বাড়ি প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ন তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব'। ক্রমে বেলগাছিয়া

নাট্যশালা (১৮৫৮), বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৭ পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৫), শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫), জোড়াসাঁকো নাট্যশালায়, (১৮৬৮) নাটক মঞ্চস্থ হতে শুরু করে। ১৮৬০-এ আহিরীটোলায় রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হলেও ক্ষেত্র তৈরী হলো, তৈরী হল নাটক, নাট্যকার বাঙালী অভিনেতা এবং দর্শক।

সংবাদ প্রভাকর, ২৫ মার্চ, ১৮৫৮—

বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধূমধাম।
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম ॥

বাগবাজার অ্যামেচার শুরু করল সধবার একাদশী, লীলাবতী শুরু হলো সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পণা। ১৮৭২, ৭-ই ডিসেম্বর শুরু হলো নীলদর্পন। কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির বাইরের উঠোনে মঞ্চস্থ করলেন সে নাটক। কলকাতা পেয়ে গেল থিয়েটারের উপযোগী সব। নট-নটী, পরিচালক, মঞ্চাধক্ষ্য, নাট্যাচার্য এবং নাট্যকারও, আর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৮৭৫-এর ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে মোট ৩৮-টি অভিনয় হয়। এরপর এই থিয়েটার ভেঙে যায় এবং হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ও পরে আবার ন্যাশনাল থিয়েটার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ রঙ্গালয় আমাদের দিয়েছে বিনোদিনী, তারাসুন্দরী-র মতো অভিনেত্রী।

১৮৫৩ থেকে ১৯৪০ সময়ে বাঙলা নাটকের ও অভিনয়ের গতিমান ধারা গণনাট্য আন্দোলন, গণনাট্য সংঘ ও নবান্নরও জন্মদাতৃ। ১৯৩৯-৪০-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ইউথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট। এই সংগঠনের অধিকাংশ সদস্যরাই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী। ১৯৪২ সালে জন্ম নিল গণনাট্য সংঘ। ১৯৪৩-সালের 'নবান্ন' নাটকের সময় থেকেই বলতে গেলে কলকাতায় গণনাট্য সংঘের পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে গ্রুপ-থিয়েটার। ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন শিল্পী এবং নতুন নতুন গ্রুপ তৈরী করেন। শম্ভুমিত্রের 'বহুরূপী', বিজন ভট্টাচার্যের 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। গণনাট্যের পাশাপাশি মূলতঃ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অভিনেতার সঙ্গে অভিনেত্রীরাও গ্রুপথিয়েটারে অভিনয় করতে থাকেন।

প্রথমত—কেউ কেউ অভিনয় করতে থাকেন একটা আদর্শের দায়বোধ থেকে এবং পরবর্তী সময়ে পেশা হিসেবেই অভিনয়কে গ্রহণ করেন। এপর্যায়ের অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র, সাধনা রায়চৌধুরী, শোভা সেন, সীতা মুখার্জী প্রমুখ।

দ্বিতীয়ত—কেউবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন অভিনয় করতে এবং পরবর্তী সময়ে অভিনয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি রাজনীতির কাজে যুক্ত হয়ে যান। এ-পর্যায়ের অভিনেত্রীর মধ্যে মণিকুন্তলা সেন, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটারে বেশ কিছু নতুন মহিলা আসতে থাকেন। এঁরা গ্রুপের পাশাপাশি অফিস ক্লাবেও অভিনয় করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে চন্দ্রা ঘোষ দস্তিদার, মণিদীপা রায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, আরতি মৈত্র, গীতা ভট্টাচার্য, কাজল মুখার্জী, কাজল চৌধুরী, ছন্দা চ্যাটার্জী, নীলিমা দাস, কল্যাণী রায়, মাধবী চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এ-সব নাট্যদলের সঙ্গেই সাধারণ রঙ্গালয় শ্রীরঙ্গম (বর্তমান নাম বিশ্বরূপা), রঙ্গমহল, ষ্টার, মিনার্ভা, প্রতাপ, রঙ্গনা, বিজন, সারকারিনা, মুক্তাঙ্গন—প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের অভিনয় চলে আসছে। ১৯৩৯-৪২-র (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে) সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা কিছুটা খারাপ অবস্থায় এলে ১৯৫২ সালে দেবনারায়ণ গুপ্ত ষ্টার থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করবার জন্য শ্যামলী উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন এবং শ্যামলীর ভূমিকায় সাবিত্রী চ্যাটার্জী অভিনয় করেন। এ-সময় থেকেই রূপালী পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদানের মধ্য দিয়ে রঙ্গালয়ের উন্নতি ঘটাতে থাকে। ধীরে ধীরে রঙমহল, বিশ্বরূপাতে এবং অন্যান্য রঙ্গালয়ে চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী দেখা যায়।

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে বড় মাপের দল আছে বাইশ-তেইশটি। এগুলি হলো—বহুরূপী, পি. এল. টি, ইউনিট থিয়েটার, চার্বাক, থিয়েটার কমিউন, থিয়েটার ওর্য়াকশপ, অন্যথিয়েটার, নান্দীকার, নান্দীমুখ, চেনামুখ, চেতনা, রঙ্গকর্মী (উমা গাঙ্গুলীর গ্রুপ), ক্যালকাটা থিয়েটার, সমীক্ষণ, থিয়েটার সেণ্টার, থিয়েটার ক্যাম্প, গান্ধার, সায়ক, শৌভনিক, মাস থিয়েটার, পঞ্চমবৈদিক (শাওলীমিত্রের গ্রুপ), সুন্দরম, থিয়েটার আনসেম্বল (শ্রীমতী সোহাগসেনের গ্রুপ)। মাঝারি মাপের দলগুলি হোলো—নাট্যরঙ্গ, সংলাপ, অনীক, রূপদক্ষ, ভার্গব, পি. এ. টি, রঙ্গরূপ, রূপ ও রঙ্গ, রঙ্গন, নিউ থিয়েটার গ্রুপ, নাট্যাগ্র, ঋত্বিক, রঙ্গলোক।

কলকাতার গ্রুপথিয়েটার অভিনয় করে এরকম মহিলা শিল্পীর সংখ্যা প্রায় একশো। এঁদের মধ্যে অনেকেই অভিনয় করেন। এছাড়া শুধুমাত্র অফিস ক্লাবে অভিনয় করেন এ-রকম অভিনেত্রীর সংখ্যাও প্রায় একশো। গণনাট্য সংঘে কলকাতার বেশ কয়েকটি শাখায় শিল্প প্রচারের কাজে যুক্ত আছেন মহিলা কর্মীর সংখ্যা প্রায় একশো।

শিল্প কলার মধ্যে সঙ্গীত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা। জন্মকাল থেকে আজ

পর্যন্ত সঙ্গীত নানারূপে বিকশিত হয়ে চলেছে। অতীত কলকাতার রাজপরিবার ও জমিদারের বৈঠকখানায় যে সঙ্গীতের জায়গা ছিল তা হল, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল, ইত্যাদি, ধীরে ধীরে সঙ্গীত এলো সর্বজনের মাঝে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ও সুরের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগে স্বদেশী গান মানুষজনের সংগ্রামী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, ডি. এল. রায়., অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, মুকুন্দদাস, নজরুল প্রমুখের কলমে স্থান পায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। এর পাশাপাশি চলচ্চিত্রে স্থান পেল কিছু আধুনিক গান। আজ পর্যন্ত এ-ধারা বহমান। ১৯৩৯ সালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন এক সঙ্গীতের জন্ম হল—গণসঙ্গীত। গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা আজও গণসঙ্গীতের ধারা অক্ষুন্ন রেখে চলেছেন।

কলকাতার চলচ্চিত্রে এবং রেডিও-তে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন মহিলা সঙ্গীত শিল্পীর উল্লেখ করা হোলো। এ'রা হলেন—উমাশশী, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া, মলিনা, ছায়াদেবী, কাননদেবী, শৈলদেবী, সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধুতীহোম চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন, রাজেশ্বরী দত্ত' পুরবী দত্ত, প্রমুখ। গণসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে গীতা চৌধুরী, পুরবী মুখার্জী', রত্না ভট্টাচার্য, সীমা বন্দোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ।

কলকাতা সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে মেয়েরা এ আলোচনা স্বল্প পরিসরে করা খুবই অসুবিধাজনক। তাই অনেক শিল্পীর উল্লেখ করা সম্ভব হল না। আলোচনাকে গুটিয়ে আনবার জন্য কলকাতার অভিনেত্রীদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখা হোলো।

শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী—উনবিংস শতকের অভিনেত্রী। বিংশ শতকের প্রথম দু'একটি দশক পর্যন্ত অভিনয় করেন কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে। এগুলি হোলো স্টার, বীণা, এমারেল্ড, সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনুর, ন্যাশানাল, থেস্পীয়ান টেম্পল। বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন, যেমন—মীরাবাঈ, সধবার একাদশী, নন্দ বিদায়, বিদ্যাসুন্দর, রাসলীলা, চৈতন্যলীলা, সরলা, ম্যাকবেথ, মুকুলমুঞ্জরা, আবুহোসেন, সপ্তমীতে বিসর্জন, জনা, বড়দিনের বকশিশ, স্বপ্নের ফুল, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, সভ্যতার পাণ্ডা, করমেতিবাঈ, ফণীর মণি, পাঁচকনে, প্রফুল্ল, সীতার বনবাস, বিল্বমঙ্গল, পাণ্ডবগৌরব, সীতারাম, নন্দদুলাল, জেরিণা, কপালকুণ্ডলা, রাজকেতা, প্রভাস যজ্ঞ, নবীন তপস্বিনী, হীরার ফুল, অভিমন্যু বধ, ভ্রান্তি, নীলদর্পণ, প্রতাপাদিত্য, সিরাজদৌল্লা, দুর্গেশনন্দিনী, মীরকাসিম, দুর্গাদাস,

চাঁদবিবি, ছত্রপতি, রাজা অশোক, ভারত গৌরব, য্যায়সা-কা ত্যায়সা, তপোবল, দেবীচৌধুরানী, নুরমহল, বাদলজাদী, বাপ্পারাও, সাজাহান প্রভৃতি।

বিনোদিনী—ঊনবিংশ শতকের অভিনেত্রী। গ্রেট্ ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল, ষ্টার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে এক যুগেরও বেশী সময়কাল অভিনয় করেন। বেশকিছু নাটক যেমন—শত্রুসংহার, নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, হেমলতা, সধবার একাদশী, মুস্তফী সাহেবের পাক্কা তামাশা, প্রকৃতবন্ধু, সরোজিনী, আদর্শ সতী, চোরের উপর বাটপাড়ি, মেঘনাধ বধ, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, পলাশীর যুদ্ধ, দোললীলা, বিষবৃক্ষ, কামিনীকুঞ্জ, হামির, মায়াতরু, মাধবীকঙ্কণ, মোহিনী প্রতিমা, আলাদীন, আনন্দরহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, আগমণী, রামের বনবাস, সীতা হরণ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, চৈতন্যলীলা, শ্রীবৎস চিন্তা, প্রহ্লাদ চরিত্র, নিমাই সন্ন্যাস, প্রভাসযজ্ঞ, বুদ্ধদেব চরিত্র, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতিতে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন।

তারাসুন্দরী—ঊনবিংশ শতকের অভিনেত্রী। ষ্টার, ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব, মিনার্ভা, ক্লাসিক, অরোরা, ইউনিক, ন্যাশানাল, কোহিনুর প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকে অভিনয করে যান। তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হোলো চৈতন্যলীলা, নসীরাম, সরলা, প্রফুল্ল, হাবানিধি, চণ্ড, বিল্বমঙ্গল, মলিনা, বিকাশ, মহাপূজা, তাজ্জব ব্যাপার, তরুবালা, নলদময়ন্তী, পলাশীর যুদ্ধ, নরমেধ যজ্ঞ, বুদ্ধদেব চরিত, বিলাপ, ধ্রুবচরিত্র, লায়লা-মজনু, বনবীর, কৃষ্ণবিলাস—হিন্দী, বাবু, অন্নদামঙ্গল, চন্দ্রশেখর, বৃটেনিয়া, করমেতিবাঈ, দেবীচৌধুরানী, বেল্লিকবাজার, তারাবাঈ, সীতারাম, হরগৌরী, বলিদান, রাণাপ্রতাপ, সিরাজদ্দৌলা, দুর্গেশনন্দিনী, চাঁদবিবি, ভীষ্ম, ভাগ্যচক্র, ক্লিওপেট্রা, সিংহল বিজয়, শুভদৃষ্টি, বঙ্গনারী, রামানুজ, বঙ্গে রাঠোর, কিন্নরী, ওথেলো, উর্বশী, পল্লীসমাজ প্রভৃতি শতাধিক নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন।

সীতা মুখার্জী—বিংশ শতাব্দীর অভিনেত্রী। 'শ্রীকৃষ্ণলীলা'য় রাধার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৪২ সালে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে অংশ নেন। ৭০-এর দশকে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। গণনাট্য সংঘ, ক্যালকাটা থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটাব, গণনাট্য-প্রান্তিক, মহিলা শিল্পী মহল প্রভৃতি নাট্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত থেকে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন।

সাধনা রায়চৌধুরী—বিংশ শতাব্দীর অভিনেত্রী। গণনাট্য সংঘ, অ্যান্টি-ফাসিস্ট লেখক ও শিল্পী সংঘ, থিয়েটার ইউনিট প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে এন্দনাগাড়ে কাজ করেন এবং বর্তমানে থিয়েটার ইউনিটে অভিনয় করেছেন। ইনি চল্লিশের দশক থেকে শুরু করেন তার শিল্পী জীবন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট শিল্পী। স্বাধীনোত্তর কালে সাধারণ রঙ্গালয়ের যখন মুমূর্ষু রিক্ত অবস্থা তখন 'শ্যামলী' নাটকে মূক চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। পেশাদারী বাণিজ্যিক নাটকে স্বপ্রতিভায় ভাস্বরিত হয়ে বহুসার্থক চরিত্র রূপায়ণের বিরল অভিনেত্রী রূপে প্রশংসিত হন।

শোভা সেন—গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় থেকে শুরু অভিনেত্রী জীবন। পাঁচদশকের অভিনেত্রী জীবনে শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করা সহ ৫০ টি নাটকের বিভিন্ন সময়ের লাগাতার প্রদর্শনে কম করে কয়েক সহস্র রজনী মঞ্চে উঠেছেন। পি. এল. টি.-র সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সরযূবালা দেবী—১৯২৭ সালে পেশাদারি অভিনয়ে যোগ দেন ১৪ বছর বয়সে। ১৯৮৪ তে রঙ্গনায় রাজদ্রোহী নাটকে শেষ অভিনয়। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে (বউবাজার সৌখিন থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার, মনমোহন থিয়েটার, শ্রীরঙ্গম, ষ্টার) অভিনয় করেন।

তৃপ্তি মিত্র—১৯৪৮-এ গণনাট্য সংঘের অভিনীত 'নবান্ন' নাটকের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজে পান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮০-র ১৩-ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বহুরূপীর শিল্পী তথা পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের প্রথম নিঃশ্বাসে উচ্চারিত অভিনেত্রী। ১৯৬২-তে সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার, ১৯৭১-এ পদ্মশ্রী, ১৯৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত হন। বেশ কয়েকটি নাটকে নির্দেশনার কাজ করেছেন। এছাড়া বহু বেতার নাটক ও দূরদর্শন নাটকে অভিনয় করেন।

যে সমস্ত অভিনেত্রীরা বিংশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে অভিনয় করে যাচ্ছেন গণনাট্য সংঘ, গ্রুপথিয়েটারের বিভিন্ন দলে, অফিস ক্লাবে, এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁদের সবার পরিচয় বিস্তারিত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এ'দের কয়েকজনার উল্লেখ করা হলো।

অঞ্জনা বসু (লোকায়ত, গণকৃষ্টি নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত)। অপর্ণা সেন (প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী, মঞ্চের সফল অভিনেত্রী, ষাটের দশকে লিটল থিয়েটার গ্রুপে উৎপল দত্তের নির্দেশনায় মঞ্চে প্রথম প্রবেশ)। অর্পিতা ঘোষ (১৯৬২ সালে, জেডবকা মোটর অফিসক্লাবের সিরাজদ্দৌলা নাটকে প্রথম অভিনয়; রঙ্গন, ঋত্বিক, অফিসক্লাবে নিয়মিত অভিনয় করেন) অলকা গাঙ্গুলি (ষাটের দশক থেকে অপেশাদার নাট্যদল এবং পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের সুপরিচিত অভিনেত্রী)। আশা সেন (১৯৬২ সাল থেকে অভিনয় জীবন শুরু ; লিটল গ্রুপ থিয়েটার, নান্দীকার, শিল্পায়ন, সায়ক, ইক্ষণিক, চারণদল, প্রভৃতি নাট্যদলে অভিনয় করে থাকেন)। ইন্দ্রানী মৈত্র (থিয়েটার কমিউন,

কলিকাতা নাট্য কেন্দ্র)। কল্পনা মুখোপাধ্যায় (অভিনেত্রী সংঘ, ষ্টার থিয়েটার ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট, রঙ্গমহল, রঙ্গনা, কাশী বিশ্বনাথ, থিয়েটারগিল্ড প্রভৃতি রঙ্গালয়ে অভিনয় করে থাকেন, ১৯৬৮ সালে দিশারী পুরস্কার লাভ করেন)। কল্যাণী রায় (গণনাট্য, পি. এল. টি.-র সঙ্গে জড়িত)। কাজল চৌধুরী (গন্ধর্ব, নাট্যচক্র, রঙ্গসভা, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট, পি. এল. টি, সমীক্ষণ, ক্যালকাটা গ্রুপথিয়েটার প্রভৃতি নাট্যদলের সঙ্গে কাজ করেন)। কাজল মুখার্জী (পঞ্চাশের দশক থেকে বহু নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন)। কাবেরী বসু (ঋত্বিক)। গীতা ভট্টাচার্য (ষাটের ও সত্তরের দশকে গণনাট্য সংঘ, গন্ধর্ব, আঙ্গিক, মার্সথিয়েটার্স, লোকায়ন প্রভৃতি নাট্য-গোষ্ঠীতে অভিনয় করেন)। গীতা দে (চলচ্চিত্র এবং মঞ্চের সফল চরিত্রাভিনেত্রী, সাধারণ রঙ্গালয়ে বহু নাটকে বিগত তিনদশক ধরে অভিনয় করছেন)। চন্দ্রা দস্তিদার (পঞ্চাশের দশক থেকে অভিনয় করছেন, চার্বাক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত আছেন)। চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইণ্ডিয়ান কালচার ফোরাম, চেতনা, শৌভনিক, চার্বাক, পি. এল. টি. নাট্যগোষ্ঠী ছাড়াও অফিসক্লাব, বেতার দূরদর্শনে অভিনয় করেন)। ছন্দা চ্যাটার্জি (পি.এল.টি)। তপতী চক্রবর্তী। দীপাদাশগুপ্ত (বহুরূপী)। দীপ্তি সেনগুপ্ত (রূপান্তরী, সৌখীন নাট্যদল, সায়ক)। দেবী মুখোপাধ্যায় (বিভিন্ন অফিসক্লাব)। পাপীয়া অধিকারী (মার্সথিয়েটার)। লিলি চক্রবর্তী (প্রায় তিনদশক ধরে চলচ্চিত্রের সাথে সাথে পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করেছেন)। মণিদীপা রায় (নাট্যরঙ্গম, লোকনাট্যম, মহিলা নাট্যসংস্থা, থিয়েটার কমিউন, নাট্যরঙ্গ)। মলি গোস্বামী (ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার)। মল্লিকা চক্রবর্তী, মাধবী চক্রবর্তী (চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর অভিনয় জীবনের সূত্রপাত নাটক দিয়ে, চিত্রাভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাধারণ রঙ্গালয়ের বিভিন্ন নাটকে অবতীর্ণ হন)। মানসী রায় (নাট্যরঙ্গ, ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার, নক্ষত্র)। মায়াকুণ্ডু (এপিক)। মায়া ঘোষ (থিয়েটার ওয়ার্কশপ, নান্দনিক)। মীনাক্ষী গোস্বামী (পি. এল. টি)। রাজলক্ষীদেবী (পাঁচবছরে মির্নাভার 'আত্মদর্শনে' শিশুশিল্পী হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ; পরে ষ্টার, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গম, ভ্রাম্যমান দল)। রাণী চক্রবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার একজন শিল্পী)। রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্যালকাটা থিয়েটার, থিয়েটার ক্যাম্প, নাট্যরঙ্গ)। রুণু বন্দ্যোপাধ্যায় (গণনাট্য সংঘ,)। রেখা সরকার (১৯০১ সাল থেকে ক্লাস থিয়েটারে অভিনয় শুরু, অফিসক্লাবে, অভিনয় করে থাকেন)। রেনু মুখোপাধ্যায় (পঞ্চাশের দশক থেকে গণনাট্য সংঘে অভিনয় করেছেন)। অনসূয়া মজুমদার (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি প্রদত্ত ১৯৮৭-র শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার প্রাপক, বহুরূপী, চেনামুখ, দূরদর্শনের অভিনেত্রী)। ঊষা গাঙ্গুলী (১৯৭৭-এ নতুন

নাট্যসংস্থা গড়েন রঙ্গ কর্মী নামে)। নীলিমা দাস (১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন, ১৯৫৯-এ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু করেন, সাধারণ রঙ্গালয়ের নানা নাটকে অভিনয় করেন)। বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত (পি. এল. টি.)। মমতা চট্টোপাধ্যায় (ষাটের দশকে গণনাট্য সংঘে আসেন, এর পর ক্লাস থিয়েটারে অভিনয় করেন)। মায়া রায়, রত্না গোস্বামী, রত্না ঘোষাল, লতিকা বসু, এরা সবাই ষাটের দশকের থেকে অভিনয় করছেন। শাওলী মিত্র (পঞ্চমবৈদিক-এর প্রযোজনায় এর 'নাথবতী অনাথবৎ' অবিস্মরণীয়)। স্বল্পপরিসরে সকলকে উপস্থাপিত করা সম্ভব হল না এবং বিস্তারিত বর্ণনাও দেওয়া গেল না।

শেষ কথা

তৃতীয় বিশ্বের মানুষজন আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে আর, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে এসেছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষজনের সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর নারীরাও আজ একবিংশ শতাব্দীকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ব্যাকুল। এ-শতাব্দী কি বার্তা বহন করে আনবে তা আমাদের জানা নেই, তবে তিনশো বছরের এ-নগরীর নারীরা নিশ্চয়ই অগ্রগতির পথে চলবে এ-বিশ্বাস বিশ্বের মানুষেব কাছে দৃঢ।

আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে মনে হয়, নগবীর নারীদের কাছে যা পাবার আশা ছিল তা বোধ হয় পূর্ণ হয়নি। কারণ, আজও নগরীর অর্ধাংশ নারী শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নারীকে করে রেখেছে বঞ্চিত, অবহেলিত। আজও নগরীর পথে ঘাটে, ফুটপাথে অর্ধনগ্ন, বুভুক্ষু নারী-পুরুষের মিছিল ; এরই পাশাপাশি আছে নগরীর প্রাচীরের গায়ে সাঁটা নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারীর প্রতিচ্ছবি যারা শুধুমাত্র মডেল হয়েই নগরীর সুস্থ রুচিকে আঘাত হানে।

অবশ্য এরই পাশাপাশি আরও একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় নগরীর বুকে, তা হলো দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি।—কলে-কারখানায়, মাঠে ময়দানে মৃদঙ্গের ধ্বনি। মিছিল নগরীর পথে ন্যায্য অধিকারের পক্ষে পা মিলিয়ে চলছে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও।

নগরীর বয়স এখন তিনশো। সময়ের সাথে সাথে নিজেকেও আধুনিক করে সাজিয়েছে সে। তাইতো নগরীর প্রতিটি প্রান্তে, কানায় কানায় সুসজ্জিত হয়ে আছে নানান সব সৌন্দর্য্য—নগরীর অন্ধকারকে মুছে ফেলবার জন্য সুস্থ-সংস্কৃতি, শালীন রুচিবোধ, সংগ্রামের মঞ্চ, শিক্ষাব আলোকে ছড়িয়ে দেবার প্রচণ্ড ব্যগ্রতার কারণে স্বাক্ষরতা অভিযান। নগরীর অসুস্থ মানুষজনকে সুস্থ করবার জন্য রক্তদান। এ সবই যেন সমান তালেই বহন করে নিয়ে চলেছে নগরীর নারী-পুরুষ। তাই তো নগরীর নারী কথার এখানেই শেষ নয়। এখনও অনেক পথ এগিয়ে চলতে হবে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছোবার তাগিদেই।

সাহায্যকারী পুস্তকাবলী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ—উমর বদরুদ্দীন।
আচার ব্যবহার কলিকাতা ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
আদিম কলিকাতা ও বঙ্গসমাজ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
সমাজ কলকাতা—ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়।
কলকাতার মানুষ—গোপাল হালদার।
কলিকাতা নামের উৎপত্তি—অঘোরনাথ দত্ত।
কলিকাতার নুকোচুরি—টেকচাঁদ ঠাকুর।
কলিকাতার সমাজ জীবন—নির্মলকুমার বসু।
নবীন ও প্রাচীন—নির্মলকুমার বসু।
কুলকলঙ্গিনী বা কলিকাতার গুপ্তকথা—পঞ্চানন রায়চৌধুরী।
জবচার্ণকের কলকাতা—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।
রাতের কলকাতা—নন্দগোপাল রায়চৌধুরী।
বাংলার বিদুষী—অনিলচন্দ্র ঘোষ।
সেকালের বেথুন কলেজ ও স্কুল—বাসন্তী চক্রবর্ত্তী।
পলাশীর যুদ্ধ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
অন্য আর এক সমাজ—নকুল চট্টোপাধ্যায়।
কলকাতার আমোদ-প্রমোদ—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
স্ত্রীশিক্ষা ও চিত্তবিলাসিনী—দীপককুমার দত্ত।
সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু।
বাংলা সাহিত্যে কলকাতা—ভবানী মুখোপাধ্যায়।
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার।
সতীদাহ—কুমুদনাথ মল্লিক।
বাংলার সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।
সতীদাহপ্রথা—স্বপন বসু।
টাউন কলকাতার করচা—বিনয় ঘোষ।
মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ—বিনয় ঘোষ।
সেকাল থেকে একাল—বিষ্ণু দে।
কলিকাতায় বিদ্যাসাগর—রাধারমন মিত্র।
কল্লোলিনী তিলোত্তমা—জয়ন্ত জোয়ারদার।

রেনেসাঁসের রঙ্গমঞ্চে—দীপ্তি ত্রিপাঠী।
জবচার্ণকের বিবি—প্রতাপচন্দ্র চন্দ।
হা-রে-কলকাতা—ফনিভূষণ ভট্টাচার্য।
কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—অতুলকৃষ্ণ রায়।
সাহেব বিবি গোলাম—বিমল মিত্র।
কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন—উপেন্দ্রনাথ বসু।
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত—চিরঞ্জীব শর্মা।
প্রাচীন কলকাতা—নিশীথরঞ্জন রায়।
বাংলার চলচ্চিত্র—আবদুল জব্বার।
জনপদ জীবন—আবদুল জব্বার।
চৌরঙ্গী—শঙ্কর।
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়—অনল মিত্র।
শরৎচন্দ্রের নারীসমাজ ও সেকালের একালের বারবণিতা—অমরেন্দ্র দাস।
চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।
জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
কলকাতা প্রতিদিন—অশোক মিত্র।
বিধবাবিবাহ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
ঠাকুরবাড়ির আত্মকথা—চিত্রাদেব।
অন্তঃপুরের আত্মকথা—চিত্রাদেব।
দুইশতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার নারী আন্দোলন—ছবি রায়।
হিন্দুআইনে বিবাহ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়—দর্শন চৌধুরী।
বাংলার পুরনারী—দীনেশচন্দ্র সেন।
সেকালের নাট্যচর্চা, বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
একশ বছরের বাংলা থিয়েটার—শিশির বসু।
পুরানো কলকাতার কথাচিত্র—পূর্ণেন্দু পত্রী।
কলিকাতার কথা—প্রমথনাথ মল্লিক।
বাদশাহী আমল—বিনয় ঘোষ।
সুতানটি সমাচার—বিনয় ঘোষ।
কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ।
কলকাতা সমাজ দ্বন্দ্ব ও মিলন—প্রদীপ রায়।

কলিকাতার ইতিহাস—বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
অচেনা এই কলকাতা—রমা চৌধুরী।
শ্রীপান্থের কলকাতা—শ্রীপান্থ।
দেবদাসী—শ্রীপান্থ।
আজবনগরী—শ্রীপান্থ
শহর কলকাতার আদিপর্ব—সমুদ্রগুপ্ত
কলিকাতার ইতিহাস—সুবলচন্দ্র মিত্র।
নারী নগরী—কেতকী কুশারী ডাইসন।
কলকাতা দেখেছি—দীপক দে।
গত শতকের প্রেম—পূর্ণেন্দু পত্রী।
কলকাতার কালচার—বিনয় ঘোষ।
বাবুগৌরবের কলকাতা—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়
—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজধানী কলকাতায়—ভিক্ষুতথাগত।
রূপকথার কলকাতা—রূপচাঁদ পক্ষী।
বাবুবৃত্তান্ত—সমর সেন।
হিকি সাহেবের কলকাতা—বরুণ সেন।
কলকাতা কালচার—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়—জসীমউদ্দীন।
অচেনা শহর কলকাতা—অমিতাভ চৌধুরী।
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী—যোগেশচন্দ্র বাগল।
পত্রপত্রিকা—(১) গ্রুপথিয়েটার।
(২) সিনেমা।
(৩) বামাবোধিনী।
(৪) প্রবাসী।
এবং সমকালীন কিছু পত্র-পত্রিকা।